অবিরত চেনামুখ

অমলেন্দু চক্রবর্তী

আশা প্রকাশনী
74 মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা 700009

বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য

সমর ঘোষাল

রূপক দাস

কল্যাণ বক্সী

অলোক মুখোপাধ্যায়

কুমারশঙ্কর দত্ত

প্রদীপ মুখোপাধ্যায়

তরুণ বন্ধুদের—

যাদের উৎসাহে উদ্যোগে এই গ্রন্থের প্রকাশ

* গল্পগুলি ইতিপূর্বে সাহিত্যপত্র, পরিচয়, আন্তর্জাতিক, কালান্তর পত্রিকার বিভিন্ন শারদীয়-সংখ্যায় প্রকাশিত।

অবিরত চেনামুখ

অদ্ভুত আঁধারে

আস্তে আস্তে ট্রেনটা অন্ধকারের মধ্যে প্রবেশ করল। এক মিনিটেরও কম সময়ের জন্য একটু থেমে আরো গভীরতর অন্ধকারের দিকে যাত্রা করবে সে। উপায় নেই, হাতের ছোট সুটকেস আর দড়িবাঁধা সংক্ষিপ্ত বিছানাটা নিয়ে যুবকটিকে এখানেই নামতে হলো। এই পৃথিবীরই আকাশের নিচে, এবং ভারতবর্ষ, এমন-কি বাঙলা দেশের মানচিত্রেও অনুল্লেখ্য, জেলার মানচিত্রে একটি নগণ্য বিন্দুর মধ্যে করুণাভরে চিহ্নিত একটি স্টেশন। যুবকটি চারদিকে তাকাল এবং দেখল, এই বিষণ্ণ সন্ধ্যার জনহীন নিস্তব্ধ প্ল্যাটফর্মে অন্য কোনো সহযাত্রী নামেনি তার সঙ্গে। জীবনের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মতোই ফাঁকা দীর্ঘ প্ল্যাটফর্মে সে একা। শুধু দূরে, আরেক প্রান্তে মানুষেরই মতো একটি অস্তিত্ব, বোধ হয় রেলের কুলি ড্রাইভারকে নির্দেশ দিতে এসেছে অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি—গ্রামের লোক। সামনে অযত্নবর্ধিত কৃষ্ণচূড়ার শাখায় তখন ঘরে-ফেরা পাখিদের অস্থির চেঁচামেচি। চারদিকের দৃশ্যমান জগতে মৃদু বাতাসের ঝাপটা, ঝিঁঝির ডাক, ব্যাঙের চিৎকার এবং আরো কিছু শব্দ—পরিচিত, অপরিচিত। এই ভয়ংকর স্তব্ধতারও যে-একটা ধ্বনি আছে এবং তার প্রতিধ্বনিও যে এমনভাবে চারদিকের শূন্য হাহাকারকে আচ্ছন্ন করে রাখতে পারে, যুবকটি তার অভিজ্ঞতা দিয়ে এই প্রথম অনুভব করল।

ভয় হলো তার। একেই কি নিসর্গ বলে? চারদিকে খোলা মাঠ, খোলা আকাশ, মৌন দিগন্তের সীমাহীন স্তব্ধতায় সে যুগপৎ আতঙ্ক ও আনন্দ অনুভব করল। নেহাতই একটা ইন্দ্রিয়গত শিহরণে, পায়ের আঙুলে আচমকা একটা মৃদু স্পর্শে চমকে উঠল যুবকটি। না, সাপ নয়—কুকুর। রোগা কঙ্কালসার লোমহীন একটা কুৎসিত ঘেয়ো কুকুর। পা শুঁকতে এসে কুকুরটি কিছুই পেলো না। যুবকটি লক্ষ করল—তার চারপাশটা ঘুরে

নবাগত অতিথিকে একবার ভারিক্কিচালে পরখ করল এবং তারপর হঠাৎ বাঁ-দিকে আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। কিন্তু ওর কাঁধে লাল দগদগে ঘা-টার উপর চোখ পড়তেই কেমন যেন গা-ঘিনঘিন-করা ঘৃণায় শরীরটা পাক খেলো একবার। যুবকটি সিগারেট খুঁজল পকেটে। প্যাকেটে একটিমাত্র সিগারেট, প্রায় নিঃশেষিত দেশলাই। সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা সে ছুঁড়ে মারল রেল-লাইনের উপর। তাকাল ডানদিকে। 'ডিস্ট্যান্ট' সিগন্যালের ওপারে সন্ধ্যার অন্ধকারে অপসৃয়মান গাড়িটা তখন ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। অন্ধকারে সিগন্যালের বাতিগুলি, কি জানি কেন, ওই ভিখিরি কুকুরটার বিষাক্ত ক্ষতের মতোই কুৎসিত আর ভয়ংকর। অদ্ভুত লাগল তার। এই একটু আগেও সে কতগুলি অপরিচিত নরনারীর ভিড়ে মিশে ছিল। বিচিত্র সব মানুষ, হরেকরকম ভঙ্গি, নানা কথা। এত ভিড়ে, এত কথায় সে নিজেকে খুঁজে পায় নি কোথাও। ঠিক এখানে, এই নির্জনতায় সে যেমন একা। সেই মানুষগুলি আরো দূরের পথে চলে যাচ্ছে, হয়তো কোনো আলোকিত শহরে, কোনো নিরাপদ আশ্রয়ে। ঠোঁটে সিগারেট, একহাতে ছোট বিছানা, অন্যহাতে সুটকেসটা সামলে নিয়ে প্ল্যাটফর্ম থেকে নামতে নামতে যুবকটি সমস্ত ট্রেনটাকে জীবনের কোনো রেখাপাতহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলে মনে করল এবং সহযাত্রী মানুষগুলিকে শ্লেটে মুছে-ফেলা ভুল অঙ্কের মতোই নিষ্প্রয়োজনের স্মৃতি বলে বোধ হলো তার।

এমন-কি একটা ওভার-ব্রিজও নেই। উপদ্রবহীন রেললাইন নির্বিঘ্নে পেরিয়ে সে আরো কিছুটা এগিয়ে এলো। সামনের লাল রঙের স্টেশন-বাড়িটাকে কেন জানি ভীষণ করুণ বলে মনে হলো তার। বহুদিনের অব্যবহৃত দুর্গের মতো। একদিন রাজা ছিল, রানী ছিল, পাত্র-মিত্র, লোক-লস্কর, পাইক-বরকন্দাজ, নহবতখানা সব ছিল। এখন শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক বিস্ময় হয়ে কোনোমতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ভিতরে এসে যুবকটি একবার ভাবতে চেষ্টা করল—এরকম ভয়ংকর কলরবহীন নির্জন কোনো স্টেশন সে ইতিপূর্বে দেখেছে কিনা অথবা রেল-স্টেশন সম্বন্ধে এতদিন তার যে-ধারণা ছিল তার সঙ্গে এই প্রত্যক্ষ বাস্তবের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। চারদিকে অন্ধকার গাঢ় হয়ে জমছে। এবং এর মধ্যে সে কোনোদিকে কিছুই দেখতে পেলো না—এমন-কি দেয়ালের গায়ে কোনো রেলওয়ে পোস্টার পর্যন্ত নয়। শুধু নড়বড়ে একটা বেঞ্চিতে একজন মানুষ

এই ভরসন্ধ্যাতেই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। লোকটা যে স্টেশনেরই কুলি, বোঝা যায়, সিগন্যাল-লাইটটা সে এরই মধ্যে জ্বালিয়ে রেখেছে।

যুবকটি মানুষ খুঁজল। কেননা সে রাজধানীর মানুষ। অজস্র আলোর প্লাবনে অমাবস্যার অভিজ্ঞতা তার হয় নি কোনোদিন, মানুষের কোলাহলে নৈঃশব্দ্যকে সে ভয় করেছে আশৈশব। এতকাল সে তার যাবতীয় বুদ্ধি-চিন্তা-জ্ঞান দিয়ে মানুষেরই সন্ধান খুঁজেছে এবং জীবনের একটা অর্থ। যুবকটি একসঙ্গে তার অতীত, বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ চিন্তা করল। যে-ঘটনা-প্রবাহে আজ সে এই নির্জন একাকিত্বের মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে এবং যে-সামান্য একটি স্কুলমাস্টারির জন্য, তার সঙ্গে এই দীর্ঘ-লালিত অতীতের কোনো সম্পর্ক নেই। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে এতদিন যা-কিছু সে শিখেছে অথবা লাইব্রেরি থেকে সংগৃহীত বই থেকে যা কিছু পেয়েছে, সাহিত্য-রাজনীতি-দর্শন, যে-বোধ বা চেতনা তার রক্তকে বিশুদ্ধতা দিয়েছে এতদিন, তার সঙ্গে এই জগতটার কোনো যোগ নেই। কিন্তু আলোকিত কলকাতার ব্যভিচার তাকে পাগল করেছে, নিজেকে সে খুঁজেছে সেখানে, পথে পথে, রেস্তোরাঁয়, বন্ধুর বন্ধুত্বে, নারীর ভালোবাসায়। আর নিজের নিঃস্ব অস্তিত্বের শেষ কথাটুকু খুঁজে নিতেই সে যেন পালাতে চেয়েছে। বাঁচার দমটা ফুরোবার আগেই সে আরো একবার চেষ্টা করবে। জীবনের একটা অর্থ তাকে খুঁজে পেতেই হবে। যুবকটি অনায়াসে ভাবতে পারল কালকের বিকেল, সন্ধ্যা এবং রাত্রির প্রথম ভাগ। যথারীতি স্বভাবনিয়মে রাজধানীর কোনো আলো-জ্বলা রেস্তোরাঁয় আরো কিছু যুবকবন্ধুর সঙ্গে সে গল্প করেছে এবং স্বতন্ত্র হয়ে অন্য এক নীরবতায় একটি যুবতী নারীকে আদর করেছে, ভালোবাসার কথা বলেছে, দূর থেকে চিঠি লেখার প্রতিশ্রুতিও দিয়ে এসেছে। তারপর পাশাপাশি পথ হেঁটেছে রাজধানীর পথে, কথায় কথায় নানা ধরণের ছক কেটেছে জীবনের। বহু দূরের গ্রাম, স্কুলমাস্টারি, অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ, কিঞ্চিৎ নিরাপত্তা। এরপর যখন·· যাই··· আমরা সময়ের প্রতীক্ষা করব···কিন্তু···তবু···আমরা অপেক্ষা করব···যুবকটি তার যুবতীর দিকে তাকিয়ে মৌন অঙ্গীকার জানিয়েছিল মাত্র। কিন্তু একরাশ বিরক্তি এবং তিক্ততা তাকে আচ্ছন্ন করেছিল তবু। এত মানুষ ···ভিড়···কলরব···আলো, তবু মনে হয়েছিল, রাশি রাশি অন্ধকার তার চারদিকে। বড় একা, বড় নিঃসঙ্গ ছিল সে।

সুদূর শৈশবের কোনো স্মৃতি নয়, আজকের এই ভয়ংকর সন্ধ্যার কাছে গতকালের রাতটাকেই কেমন যেন অর্থহীন স্বপ্ন বলে বোধ হলো হঠাৎ। মনে হলো না, মাতৃভূমি বাঙলা দেশেরই মাটি-আকাশের পরিবেশে সে দাঁড়িয়ে আছে—যেন অনাত্মীয়, অপরিচিত কোনো জগৎ। নইলে সামনের বেঞ্চিতে বেহুঁস পড়ে-থাকা স্টেশনের কুলিকে ডেকে তুলে একটু কথা বলারও প্রেরণা জাগছে না কেন? কেন স্বদেশেই নিজেকে বিদেশী মনে হয়। একাধিক ভাষা-না-জানা বিপন্ন বিদেশী।

অথচ এই মুহূর্তে একটি মানুষকে তার অত্যন্ত প্রয়োজন। যাকে সে কিছু প্রশ্ন করবে। নিদেনপক্ষে বাসের খবর। চারদিকে তাকিয়ে যুবকটি এগিয়ে গেল সামনের টিকেট-কাউন্টারটার দিকে। দৃশ্যটা দেখে রীতিমতো ভয় হলো তার। বড় একটা ঘরে টেবিল, চেয়ার, টেলিফোনের যন্ত্রপাতি সবকিছু আগলে বসে আছে এক আদ্দিকালের বুড়ো। বয়স পঞ্চাশের উর্ধ্বে, অনাবৃত রোমশ বুকে পৈতেটা স্পষ্ট দেখা যায়, হাত-পাখাটা হেলে-পড়া বাঁ-হাতে পড়ি-পড়ি করে কোনমতে টিকে আছে, মাথাটা ঝুলছে খেজুরগাছের ডগায় শুকনো পাতার মতো। কালিঝুলি-মাখা বড় লণ্ঠনটার আলো ঐ পরিবেশ এবং এই মানুষটাকে আরো ভৌতিক, আরও বীভৎস করে তুলেছে। কতদিন? মনে হয়, বহুদিন- বহুকাল ধরে এই মানুষটা এই জনশূন্য নিঃসঙ্গ মাঠে ভাঙা দুর্গের অন্দরে বসে ঠিক এমনি করে ধুঁকছে।

যুবকটি পিছিয়ে এলো। তবু একজন মানুষকে তার প্রয়োজন। শুধু পথের নির্দেশ অথবা বাসের খবর জিগগেশ করবে বলে নয়, এই ভৌতিক জগতে একবার সেই দুর্লভ কণ্ঠস্বর শুনবে। আস্তে আস্তে স্টেশনের পিছনের দরজায় এসে যুবকটি খুশি হলো। কেন না দু-দিকের উঁচু পাটখেতের মধ্য দিয়ে সরু একটা আলপথ এবং সোজা সরলরেখা ওই পথের শেষে দূরে আলোর আভাস। দু-চারটে টিমটিমে লণ্ঠন। আলো মানে মানুষ, মানুষ মানে একটু সান্নিধ্য, একটু কথাবার্তা, বাসের খবর, তারও চেয়ে বড় কথা তার খিদে পেয়েছে, প্রচণ্ড খিদে, অন্তত এক কাপ চা, সিগারেট নিঃশেষিত, দেশলাই শেষ-কয়েকটি-কাঠিতে এসে ঠেকেছে, সুতরাং একটু আরাম। যুবকটি অসহায়ভাবে সামনের দিকে তাকাল—দীর্ঘ পাটখেত, একফালি সিঁথি-কাটা মেঠো পথ। এই পথ ধরে এগোতে হবে চিন্তা করেই একরাশ ভাবনা এসে স্নায়ুযন্ত্রটায় জট পাকাল। সাপ—গ্রামে নাকি সাপ থাকে।

ভয়ংকর বিষধর সাপ! এই অন্ধকারে ঐ পথ পেরিয়ে যেতে হবে! এবং সেই মুহূর্তেই আবিষ্কার করল যেখানে সে দাঁড়িয়ে আছে তারই চারপাশে আকন্দ, কালকাসুন্দি, শেয়ালকাঁটা আর বুনো-আগাছার জঙ্গল, দূরে ফণিমনসার পাথুরে শরীরগুলি খুনে ডাকাতের মতো অন্ধকারে গা ঢেকে দাঁড়িয়ে। যুবকটি ভয়ে পিছিয়ে এলো দু-হাত। আচমকা মাথাটা একটা ধাক্কা খেলো পিছনের দেয়ালে। হাতের সুটকেস বিছানা ফেলে মাথায় হাত বুলিয়ে এবং বেশ কিছুক্ষণ ঝিম্ মেরে দাঁড়িয়ে থেকে সামলাতে চেষ্টা করল।

এবং তারপর যুবকটি তার সমস্ত শক্তি-সাহস নিজের মধ্যে কেন্দ্রীভূত করে ঝাঁপিয়ে পড়ল অন্ধকারে। ভীরু সজারুর মতো পাটখেত মধ্যবর্তী অন্ধকারটুকু পেরোতে নিজেকে অসীম দুঃসাহসী মনে হচ্ছিল তার। এবং অপর পারে নিরাপদে পৌঁছে সমস্ত ব্যাপারটাকেই কেমন হাস্যকর মনে হলো। কত সামান্য একটা কাজ এবং তার জন্য কী ভীষণ তোড়জোড়, কত উৎকণ্ঠা, কত প্রস্তুতি।

এবার পায়ের তলায় পাকা সড়ক। চারদিকের ফাঁকা মাঠ এবং দু-দিকের জনহীন পথের ধারে কয়েকটি নিঃসঙ্গ চালাঘর। সবগুলিরই ঝাঁপ বন্ধ, তবে অন্তত একটির দিকে তাকিয়ে বোঝা যায় যে, সেটা দোকান এবং চায়ের দোকান এবং এখনো বন্ধ হয় নি। একজন অতিকায় মানুষ সামনের বিরাট উনুনটা খুঁচিয়ে ছাই ফেলছে এবং ভিতরে একরাশ অন্ধকারের মধ্যে কতগুলি মানুষের চাপা কণ্ঠস্বর। চারদিকের এই ভয়ংকর স্তব্ধতার মধ্যে এই কণ্ঠস্বরকে কেমন যেন ষড়যন্ত্রের গোপন গুহা বলে মনে হলো। খুব কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই, যে-মানুষটি উনুনের ছাই ফেলছিল, সে এমনভাবে তাকাল যেন পৃথিবীতে মানুষ দেখার অভিজ্ঞতা তার এই প্রথম।

'চা পাওয়া যাবে?'

'আজ্ঞে, না।'

'এক কাপ, দেখুন না চেষ্টা করে।'

'কী করি হবে? দেখচেন ত আঁচ ফেলে দেচি।' লোকটি আবার মাথা গুঁজে কাজ করতে লাগল। আগন্তুক সম্বন্ধে তার উৎসাহ শেষ।

যুবকটি লক্ষ করল ভিতরে আরো কিছু মানুষ তার প্রতি উৎকর্ণ এবং কয়েক জোড়া চোখের চাউনি তাকে চেটে নিচ্ছে। একটা লণ্ঠনকে ঘিরে

কতগুলি শক্ত সবল মানুষ তাস খেলছে। তাদের কালো কালো তৈলাক্ত তেজী শরীরগুলি অন্ধকারে এবং ক্ষীণ আলোয় জান্তব।

'সিগারেট আছে?'

'না।'

'দুটো-একটা দেখুন না—'

'বিড়ি আচে। লেবেন?'

যুবকটি এবার ভাগ্যে বিশ্বাসী হতে শুরু করল। কেন না, দুর্ভাগ্যের সঙ্গে এমন সংঘর্ষ বা সাক্ষাৎ তার জীবনে এই প্রথম।

'মহাশয়ের নিবাস?' প্রশ্ন এলো ঘরের ভিতর থেকে।

'কলকাতা।'

'কোথায় যাওয়া হবে?'

'কোটালগ্রাম।'

'সি তো অনেক দূর। প্রায় সাত কোরোশ।'

সাত ক্রোশ! যুবকটি চমকে উঠল। স্বাভাবিক এবং অবিচলিত ভঙ্গিতেই বলল—'তা হবে। বাস কখন আসবে বলতে পারেন?'

'বাস!' এবার ওদের বিস্ময়—'সি ত চলে গেচে অনেকক্ষণ। এলের পেসেঞ্জার লেবে বলে ডাইভারসাব ঝিমুল পড়ে পড়ে। আপুনাদের গাড়ি লেট গ বাবু। শেষে চলি গেল। ফের আসবে কাল সকালে।'

'কাল সকালে! মানে, আজ আর আসবে না?'

'না বাবু, পেসেঞ্জার লেই। রেতবিরেতে বাস চলে না পাড়াগাঁয়ে।'

যুবকটি এবার তার চারদিকের স্তব্ধতার দিকে তাকাল। ডানে-বাঁয়ে গর্তে গা-ঢাকা সাপের মতো অন্ধকারে লুকোনো পাকা সড়ক, মেঘলা আকাশ, আমকাঁঠালতালখেঁজুরের অস্পষ্ট অস্তিত্ব, ঝোড়ো বাতাসের পূর্বাভাস এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। যুবকটির ইচ্ছে হলো, ভাগ্যের সঙ্গে একবার সে জুয়া খেলে। ঠিক এই মুহূর্তে তার অন্য কোনো উপায় নেই। প্রায়ান্ধকার নির্জন প্রান্তরের মধ্যবর্তী পাকা সড়ক কোথায় তাকে নিয়ে যাবে কোন্ সুদূরে, কোন্ প্রান্তে, কোন্ অচেনা নগরে অথবা গ্রামে, সে জানে না। তবু ইচ্ছে হলো, সে হাঁটে। অথচ এ-পথেই তো তাকে যেতে হবে। কোনো-এক অখ্যাত গ্রামের অনাদৃত এক স্কুলের সামান্য মাস্টার হয়ে।

অবশ্য ফিরে যাওয়া যায়। যে-পথে এসেছে, সেই পথে। ঝোড়ো বাতাস

শুরু হয়ে গেছে, অন্ধকার আরো গাঢ়, ঘন হয়ে ঢেকে ফেলছে চারদিক, কালো জমাট বাঁধা মেঘ জমছে নক্ষত্রহীন আকাশে। ঝড়ের সংকেত, অন্তত এই মুহূর্তে তাকে আশ্রয় নিতে হবে কোথাও। ভয়াবহ সেই স্টেশন-বাড়িটাকে মনে পড়ল। যেখানে রেলের-বাতি জ্বেলে বেঘোরে ঘুমোচ্ছে রেলের কুলি। স্থবির হয়ে আছে সেই আদ্দিকালের বুড়ো। রাত গভীর হলে আরো ভয়াল হয়ে উঠবে সে পরিবেশ।

যুবকটি কিন্তু সেই নির্জন অন্ধকারে ফিরে যেতে পারল না। দাঁড়িয়ে রইল এবং চারিদিকের স্তব্ধতা যখন দ্বিগুণ হলো, অমাবস্যার রাত্রি যখন তার সমস্ত আয়োজন সম্পূর্ণ করে আরো গভীর হলো, দূরের দিগন্ত শরীর ছুঁয়ে দাঁড়াবার অনেক পরে সেই যুবক একটি অনন্ত রাত্রির কথা ভাবল। পরবর্তী সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত একটি অন্ধকার রাত্রির দীর্ঘ সময় তাকে এই গতিহীন পৃথিবীতে একা থাকতে হবে। যেখানে মানুষ নেই—যে-মানুষ আত্মীয় হয়, বন্ধু হয়, প্রিয় হয়। আর সিন্দুকের ভিতরের স্বর্ণালংকার যেভাবে তার অন্ধকারকে দেখে সেভাবেই সেই যুবক একরাশ অন্ধকারের সামনে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর বিলীন অস্তিত্বের কথা চিন্তা করে আবিষ্কার করল—এতদিন তার পরিচিত জগতের পথে পথে যে-শত্রুকে সে খুঁজেছে, এবার তাকে সে পেয়েছে। বৈধ জন্মের পরিচয়, শিক্ষাদীক্ষা এবং যাবতীয় মানবীয় উপকরণ নিয়ে আলোকিত কলকাতার রাজপথে ভিখিরির মতো সে ঘুরেছে এতকাল এবং বেঁচে-থাকার, সুখী হবার সমস্ত ইচ্ছাগুলিকে করুণভাবে এক অদৃশ্য শত্রুর হাতে নিহত হতে দেখেছে। মনে হলো, সেই আততায়ী এ-অন্ধকার, এই অন্ধকারের সঙ্গে তার লড়াই।

সুতরাং যুবকটি এবার তার সমস্ত শক্তি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্ধকারে রাস্তার উপর বসে পড়ে, ছোট টিনের সুটকেসটা খুলে, হাতড়ে হাতড়ে বের করে নিলো আত্মরক্ষার একমাত্র অস্ত্র—ছোট একটা টর্চ। তারপর হাঁটতে লাগল। অত্যন্ত ব্যতিক্রমহীন দুর্গম পদচারণা। যুবকটি বাঁচার তাগিদে এবার তার দ্বিতীয় অস্ত্র ব্যবহার করল—স্মৃতি থেকে কুড়িয়ে আনল কবিতা এবং তারস্বরে চেঁচাতে লাগল। বাতাসের তীব্র ঝাপটে, ব্যাঙের ডাকে এবং দু-দিকের গাছে গাছে অশান্ত দাপাদাপিতে, আকাশের হঠাৎ-বিদ্যুতে, মেঘের হুংকারে তার কণ্ঠস্বর হয়তো বেশিদূর এগোল না কিন্তু সে আরাম পেল, সাহস বাড়ল।

হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল। ঝড়ের বাতাসে বিপন্ন কোনো পাখি তীব্রস্বরে আর্তনাদ করে মাথার উপরে পাক খেয়ে কিছুক্ষণের মধ্যে আবার কোথায় চলে গেল। চিল, শকুন অথবা কোনো শক্তিমান পাখি, চারদিকের ভয়াবহ পরিবেশে সে আরো কিছু সন্ত্রাসের সৃষ্টি করল। ভয়, বিস্ময়, আতঙ্কের মিলিত অনুভূতিতে যুবকটি কিছুক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে আত্মস্থ হতে চাইল। আরো একটু অগ্রসর হতেই আবার একটা বিস্ময় আক্রমণ করল তাকে। অদূরেই টর্চের আলোটা আছড়ে পড়ল এক রত্নখচিত দেয়ালের গায়ে। হীরে-মুক্তোগুলি জ্বলছে প্রলোভনের হাতছানিতে। যুবকটি সাহস কুড়োল। যেহেতু এখন তার বাঁচার জন্য প্রাণপণ সংগ্রাম, সে-কারণেই কোনো বিপদে তার ভয় নেই, মুগ্ধতা নেই। সে এগিয়ে এলো আলোকে স্থির রেখে। গভীর কোনো রহস্যকে সে খুঁজে পাবে ভেবেছিল, কিন্তু খুব কাছে এসে আবিষ্কার করল—বিষণ্ণ নির্জন প্রান্তরে এক নিঃসঙ্গ কবর। চারটি থামের উপর গম্বুজ, নিচে শান-বাঁধানো শয্যা। আলো দিয়ে যুবকটি এবার চারদিক পরখ করল। আঁকা-বাঁকা অপটু হাতে ফারসি-আরবি শব্দবহুল বাঙলা ভাষায় পবিত্র কোরানের শপথ। মাতার স্মৃতিতে মাতৃভক্ত সন্তানের শ্রদ্ধাঞ্জলি। বাইরে থামে-গম্বুজে চিনেমাটির বাসন-ভাঙা টুকরোয় আলো ফেলে যুবকটি আবার লক্ষ করল হীরে-মুক্তোর ছটা।

সমস্ত কবরটির উপর যুবকটি হাত বুলোল। কেননা, হাত বুলোতে ভালো লাগল তার। আবিষ্কার করল, এককোণে কতগুলি গলিত মোমের স্মৃতি। ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত, ক্লান্ত শরীরমনে যুবকটি এবার তার সান্ত্বনা পেলো—এই কবর তার আশ্রয়।

তারপর বিছানা বাক্‌শোকে একপাশে সরিয়ে রেখে সেই অবসন্ন যুবক কবরে শয্যা নিলো। এবং শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল—পথ-চলায় যদি এত ক্লান্তি এবং কবরে যদি এত আরাম তবে আগে সে এর সন্ধান পায় নি কেন? এবং কবরে শুয়ে যুবকটি তার প্রণয়ীর মুখ চিন্তা করল। তার সঙ্গে কাল্পনিক কথোপকথন চলল কিছুক্ষণ। তারপর বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন, কলকাতার সেই বদ্ধগলিতে স্যাঁতসেঁতে ঘরের অসুখী সংসার, মার বুকে হাঁপানির টান, দাদা-বৌদির স্বার্থপরতা, ছোট ভাইপোটার চেঁচিয়ে নামতা-পড়া। একে একে অথবা একসঙ্গে সবগুলি ঘটনা স্নায়ুকেন্দ্রে পাক খেয়ে

গেল। এবং সেই যুবক কোথাও একটা কালপেঁচার ডাক শুনে, দমকা বাতাসের ঝাপটে অবিচলিত থেকে, অন্ধকারে ব্যাঙের ডাকে এবং বৃক্ষপতনের প্রচণ্ড শব্দে বিন্দুমাত্র ভীত না হয়ে অনায়াসে দার্শনিক স্তরে ভাবতে পারল— লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি কিলোওআট বিদ্যুৎশক্তি দিয়ে ভরে দিলেও এ-অন্ধকার যাবে না, কেন না কলকাতার আলোকিত পথে পথে যার বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম করেছে সে-ও এই অন্ধকার।

ঝড়ের ঝাপট তীব্র হলো আরো, ঘনঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে আকাশে। সেই সঙ্গে বজ্রের চিৎকার, বাতাসে আর্দ্রতা। হয়তো বৃষ্টি হচ্ছে কোথাও। সে-বৃষ্টি এবার আস্তে আস্তে ছুটে আসবে, আসবেই। যুবকটি উঠে বসল। আত্মরক্ষার জন্য তার আর অন্য কোনো কর্তব্য নেই। সুতরাং এবার সে প্রকৃতি দেখবে।

ইচ্ছে ছিল—এবার সে প্রেতের সঙ্গে কথা বলবে কিছুক্ষণ। একটি কবরকে ঘিরে অমাবস্যার নিশুতি রাত্রি এবং তার কেন্দ্রে একজন নিঃসঙ্গ মানব। মৃত্যুপুরী থেকে প্রেতাত্মারা আসবে। আসতে তাদের হবেই। সুতরাং সমস্ত দুর্যোগের মধ্যে সে চারদিকের ব্যাঙের ডাক, বাতাসের ঝাপটা দোল-খাওয়া বড় বড় গাছের প্রচণ্ড শব্দকে ছাপিয়ে গান ধরল। গান সে জানে না, এমন-কি ইতিপূর্বে কোনোদিন চেষ্টাও করে নি। অথচ আজ, এই মুহূর্তে ক্ষুধায় তৃষ্ণায় ক্লিষ্ট হয়েও পাগলের মতো চেঁচাতে লাগল। কেননা সে সিদ্ধান্ত নিয়েছে, তাকে বাঁচতে হবে এবং যে-কোনো উপায়ে।

ঠিক তখনই এদিক থেকে ওদিক পর্যন্ত একটা লকলকে বিদ্যুতের চাবুক পড়ল আকাশের গায়ে। মুহূর্তের ভগ্নাংশ মাত্র। দুঃসহ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে ফেটে পড়ল আকাশ। দম-বন্ধ-করা ভয়ে যুবকটি কবরটা আঁকড়ে ধরল। মুখ থুবড়ে পড়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর গর্জনের শেষ রেশটুকু একটু একটু মিলিয়ে এলে মাথা তুলল। কিছুক্ষণের জন্য তার সন্দেহই ঘুচল না—চারদিকের পৃথিবীটা ঠিক আছে কিনা। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে জীবিত অনুভব করে যুবকটি অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। হাসিটা এত কৃত্রিম যে প্রচুর চেষ্টা করেও সেটাকে সে প্রাণখোলা উদাত্ত হাসিতে পরিণত করতে ব্যর্থ হলো। তবু ভালো লাগে পাগলের মতো চিৎকার করতে এবং সেজন্যই যেন নেশাগ্রস্তের মতো চিৎকার করতে লাগল। কিন্তু কবরটাকে জড়িয়ে রইল আরো শক্ত করে। কেননা, একটু হালকাভাবে পেলেই

এই ঝড়ের বাতাস তাকে কোথায় ছিটকে ফেলবে কালো অন্ধকারে।

যুবকটি চিৎকার করে ডাকল—'খ…গে…এ…এ…ন…

খগেন তার ছোট ভাই। ডাকল—'মা…আ…আ…

ডাকল—'দীপেন, ভোলা…আ…আ…আ…

বিশেষ বন্ধুদের নাম। গলা ছিঁড়ে এবার সে আর্তকণ্ঠে হাঁকল—'বনা…নী, আ…মি তো…মায় বি…ইয়ে ক…র…ব…ও…ও…ও'

এরপর বৃষ্টি নামল। আকাশ ভেঙে, চারদিকে শব্দময় জগৎকে একেবারে স্তব্ধ করে দিয়ে অকস্মাৎ অন্ধকারে আচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ প্রান্তরকে আক্রমণ করল মুষলধারা অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। সেই সঙ্গে রইল ঝড়, ঝড়ের দাপট, আর বজ্র-বিদ্যুৎ আর অন্ধকার। ক্ষমাহীন প্রতিকূলতার সামনে পুরোপুরি আত্মসমর্পিত সেই যুবক একেবারে নিষ্ক্রিয় থেকে মনে মনে শুধু এক দুই তিন চার গুনতে লাগল। রুদ্ধশ্বাসে মৃত্যু আর সর্বনাশের প্রহর গোনার মুহূর্তে অন্য কোনো চিন্তার আশ্রয় সে পেল না। প্রেম-জীবন-সুখ বা ভবিষ্যৎ—কোনো কিছুরই আর কোনো বিশেষ অর্থ বা তাৎপর্য নেই। শুধু এই নিষ্ঠুর বর্তমান, নির্মম অস্তিত্ব এবং এই প্রতিরোধহীন শত্রুর আক্রমণের কথা ভেবে, অনিবার্য ধ্বংসের মুখোমুখি সে শুধু তার প্রতিটি হৃৎস্পন্দনকে গুনে গুনে নিজের প্রয়োজনেই নিজের সান্ত্বনা খুঁজল—আছি, আমি আছি। আমি আছি।

বৃষ্টির চাপ এত প্রবল এত তীব্র যে মাথার উপরের গম্বুজটুকুর কোনো মূল্যই নেই তখন। চারদিক থেকে ঝাপটা এসে আছড়ে পড়ছে শরীরে। অসহ্য শীতে কাঁপতে কাঁপতে সেই যুবক দুটো পা দু-দিকে ছড়িয়ে, বুকটাকে কবরের আড়ালে ঢেকে, মাথা নুয়ে পড়ে রইল। নইলে বাতাসের ঝাপটে বুকের হাড়-পাজরগুলি গুঁড়ো হয়ে যেতে পারে। ভয়। মুহুর্মুহু বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে, মুহূর্তের জন্য সামনে-পিছনে প্রকাণ্ড ফাঁকা মাঠটা চমকে চমকে উঠছে, তারপরই গর্জে উঠছে বাজ। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড উথাল-পাথাল করে, সমস্ত অন্ধকারকে দলে-মুচড়ে রাতটাকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে পৃথিবীটাকে চারদিক থেকে মার দিচ্ছে আকাশ। যুবকটির মনে হলো, এই মহাপ্রলয়ের মধ্যে সে এখন নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। বজ্রপাতে মানুষের মৃত্যু হয় সে শুনেছে। আর যদি ঠিক তেমনি একটা অঘটন ঘটে যায় এখানে, কেউ জানবে না। কাল সকালে কবরের উপর একটি মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখে পুলিশ

ডাকবে গ্রামের চাষীরা। ময়না তদন্ত হবে কোথায় কোন্ ডাক্তারের কাছে, তারপর পুলিশিসূত্রে যখন কলকাতায় সংবাদ পৌঁছোবে তখন এ-দেহটা গলে-পচে কুৎসিত দুর্গন্ধময় হয়ে উঠেছে। নিজের জীবনের এমনি মর্মান্তিক দৃশ্য কল্পনা করে সে কিছুমাত্র বিচলিত হলো না। বরং মনে পড়ল তার সেই কবিবন্ধুকে। মাত্র বছর দেড়েক আগে অকারণে অগ্নিদগ্ধ হয়ে পুড়ে মরেছেন যিনি। সামান্য অসাবধানতায় এবং এত অনায়াসে যদি একটি যৌবন এমনভাবে দগ্ধ হতে পারে তবে এই দুর্যোগের রাত, এই সাড়ম্বর আয়োজিত কালরাত্রি তো অনেক মহৎ মৃত্যু। যুবকটি কবরে মাথা লুকিয়ে, নিজের মৃত্যুর কথা ভেবে আবার সেই মজার খেলা শুরু করল। বুক ছিঁড়ে চিৎকার করে ডাকল—প্রশা…ন্ ‥ত…অ…অ…

আর ঠিক তখনই প্রচণ্ড একটা আগুনের হলকায় চোখ পুড়ে গেল এবং তারও চেয়ে ভয়ংকর, যেন কয়েক শ মেগাটন বোমার বিস্ফোরণে যুবকটির কান বধির হয়ে এলো। কিছুক্ষণের জন্য শব্দময় জগৎ স্থির, নিঃশব্দ। ভয়ে, শঙ্কায়, ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, ক্লান্তিতে অবসন্ন সেই যুবক মুখ থুবড়ে পড়ে থেকে কাঁপতে কাঁপতে শুধু রুদ্ধনিশ্বাসে মৃত্যুক্ষণটুকুর প্রতীক্ষা করতে লাগল। এই সর্বনাশ, এই অবধারিত মৃত্যুর হাত থেকে তার মুক্তি নেই। তারও চেয়ে বড় দুঃখ, নিশ্চিত ধ্বংসের বিরুদ্ধে জীবনের জন্য সে যে লড়বে এমন শক্তিও এখন নিঃশেষ।

তারপর আস্তে আস্তে শ্রুতি ফিরে এলে সে আবার একটানা বৃষ্টির শব্দ শুনতে পেল এবং সেই সঙ্গে একটা তীব্র স্রোতোধারার কল্‌কল্ শব্দ। নিশ্চয়ই আশেপাশে কোনো উঁচু জায়গায় কোথাও জল জমেছে এতক্ষণ। এবার গড়িয়ে পড়ছে। হাওয়ার ঝাপটও কমেছে কিছুটা। যুবকটি আস্তে আস্তে মাথা তুলল। জামা-গেঞ্জি, পরনের ধুতি সবকিছু ছপ্‌ছপ্ করছে, ঠাণ্ডায় জমে যাচ্ছে শরীর। এখানেই শেষ নয়। বৃষ্টি ঝরছে, ঝরবে এবং যদি আজ রাতেই মৃত্যু না হয় তবে সারারাত জেগে থেকে অসহায়ভাবে ভিজতে হবে আরো।

কবর থেকে উঠে সে কোনোরকমে সোজা হয়ে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে থাকার শক্তি নেই। টলতে টলতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, আবার উঠতে চেষ্টা করে আরো একবার হোঁচট খেতে হলো। ঝিঁঝিঁ ধরেছে পায়ে। এবার সে হামাগুড়ি দিয়ে হাতড়ে হাতড়ে খুঁজে নিল যে-চারটি থামের উপর কবরের

তাজটা দাঁড়িয়ে আছে তারই একটা থাম। শিশুর মতো ধরে ধরে উঠে দাঁড়াল এবং ঠাণ্ডায় জমে গিয়ে অবিশ্রান্ত বৃষ্টির কাছে নিজেকে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে, কাঁপতে কাঁপতে চারদিকের জমাট অন্ধকার, ক্ষণিক বিদ্যুতে ঝলকানো জগৎ, বজ্রধ্বনি, বৃষ্টির শব্দ, বড় বড় গাছের ডালে আর্তনাদের ভাষা শুনতে লাগল। এখন সে পরিষ্কার বুঝতে পারছে, লড়াই করবার শক্তিটা সে আস্তে আস্তে হারিয়ে ফেলছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না, বসে থাকা আরো কঠিন। বৃদ্ধের মতো মৃত্যুর কাছে সে অসহায়। এবং এই অবস্থায় তার আরো একবার কলকাতার কথা মনে পড়ল। সেখানে থাকলে সে হয়তো এখন নিরাপদে ঘুমোত। জীবনের প্রয়োজনেই তার একটা চাকরির দরকার এবং সেই সামান্য আর নগণ্য চাকরির মোহে আজ সে এই জনহীন মহাপ্রলয়ের নিশুতি অন্ধকারে একা, অসহায়ভাবে শুধু বেঁচে থাকার সংগ্রাম করছে। মিথ্যা আমার প্রতিশ্রুতি বনানী—আমি নেই। মা! মিথ্যে তুমি দুঃখ পাও, দুঃখকে লালন করো। তোমার অলক্ষ্যে, আমাদের নিজেদেরই অজান্তে আমরা এমনি কোন অন্ধকারে যে-কোনো মুহূর্তে ধ্বসে যেতে পারি। আমিও বাঁচতে চাই, বাঁচতে চেয়েছি প্রশান্ত। প্রশান্...

যুবকটি আঁতকে উঠল। স্পষ্ট অনুভব করল, সামনে কে একজন দাঁড়িয়ে।

'কে, কে আপনি?'

সাড়া নেই।

'কে?'

নৈঃশব্দ্য।

গলা শুকিয়ে এসেছে। গলা বাড়িয়ে কাতলা মাছের মতো বৃষ্টির জলে জিব ভেজাতে চাইল। কোনোমতে টেনে টেনে উচ্চারণ করল—'কে...এ?'

শুধু বৃষ্টির শব্দ। যুবকটি মাথা নাড়া দিয়ে ভালো করে দেখতে চাইল। একটা বিদ্যুতের ঝলকে সে দেখল—কেউ নেই। আবার বিদ্যুৎ, আবার বজ্রধ্বনি। পর পর আরো অনেকগুলি বিদ্যুতের ঝলকেও কোনো অস্তিত্বকে খুঁজে পেল না সে। কিন্তু অন্ধকারের প্রতিটি মুহূর্তে এই অশরীরী স্পষ্ট। আমি কি দুর্বল হয়ে পড়ছি? ভয় পাচ্ছি! ভয়ংকরকে ভয়? ভেজা শরীরে একটা থামকে জড়িয়ে ধরে সে শীতে কাঁপছে। তবু হাসি পেল। মাথাটা ঝাঁকুনি দিয়ে, মুখের-চোখের-কপালের জল দু-হাতে কেঁচে নিয়ে আত্মবিশ্বাসে আরো কঠিন হতে চাইল।

কিন্তু পরমুহূর্তেই অনুভব করল, নিজের উপর সে তার বিশ্বাস হারাতে শুরু করেছে। মসৃণ থামের গা বেয়ে শরীরটা গড়িয়ে পড়ছে, কিছুতেই সে আর অবলম্বনকে ধরে রাখতে পারছে না, মাথাটা ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে, সর্বাঙ্গ অবশ। পায়ের তলায় বরফের মতো শীতল স্পর্শ, ছপ্‌ছপ্‌ করছে জল, জল জমছে চারদিকে, জল উঠে আসছে কবরের উঁচু পার অবদি। এই জলকেই এখন তার ভয়। আকণ্ঠ ডুবে থাকলে সে এখন মরে যাবে। তার যৌবনের সমস্ত উত্তাপ, রক্তের উষ্ণতা শীতল হয়ে আস্তে আস্তে জড়ত্বে পরিণত হবে এবং অকারণেই তার বাঁচার দমটা নিঃশেষে নিভে যাবে ইচ্ছার বিরুদ্ধে। সবকিছু উপলব্ধি করে, সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে সে তার আশ্রয়কে জড়িয়ে রাখতে চাইল। নিজের দুর্বলতা, নিজের অসামর্থ্যের বিরুদ্ধে আপ্রাণ সংগ্রাম করে ঝড়বাতাসঅন্ধকারবৃষ্টি সবকিছুকে তুচ্ছ, অতি তুচ্ছ মনে করে ধীরে ধীরে একটু একটু করে সেই যুবক লুটিয়ে পড়ল। অবধারিত পতনের মুখে সে অসহায়।

তারপর পরিচ্ছন্ন নির্মল আকাশ। শত্রু-বিমান চলে যাবার পর পরিখা থেকে উত্থিত সৈনিকের মতো যুবকটি মাথা তুলল। মনে হলো যেন দুঃস্বপ্ন দেখছিল এতক্ষণ। কিন্তু স্বপ্ন নয়, সবই স্পর্শময় বাস্তব। কোমর পর্যন্ত থৈ-থৈ করছে জল, সমস্ত নিম্নাঙ্গ পক্ষাঘাতে অনুভূতিহীন। পাশে ঢল বেয়ে জলস্রোত গড়িয়ে পড়ছে মাঠের দিকে—তার শব্দ, ব্যাঙের ডাকে ভরে আছে চারদিক—তার বিরক্তিকর একঘেয়েমি। আবার সে আস্তে আস্তে উঠতে চেষ্টা করল এবং অনেক কষ্টে দাঁড়াল। নিচের পকেট দুটো থেকে রুমাল আর কাগজপত্র কবরের উপর রেখে এবং বুক-পকেট থেকে টাকা-কলম তুলে দাঁতে চেপে জামাটা খুলল, এমন-কি গেঞ্জিটাও। নিংড়োতে গিয়ে দেখল, জল ঝরছে অজস্র কিন্তু শরীরে এমন শক্তিটুকুও অবশিষ্ট নেই যে এ-কাজটুকু সে অনায়াসে করে। জামা-গেঞ্জির পর এবার সে সম্পূর্ণ নগ্ন হলো; হাঁপাতে হাঁপাতে এবং অনেকবার বিশ্রাম নিয়ে সে ধুতি-আণ্ডারওআর পর্যন্ত নিংড়োল। তারপর কবরের একটা থাম থেকে অন্য থাম পর্যন্ত ধুতিটাকে শক্ত করে বেঁধে এবং জামা-গেঞ্জিকে কবরের উপর ছড়িয়ে রেখে অন্ধকারে নিজের উলঙ্গমূর্তিকে লুকোল। এতক্ষণ যা সে খেয়াল করে নি বা হুঁস হয় নি, হঠাৎ-ই আবিষ্কার করল—তার চশমাটা হারিয়ে গেছে কিংবা জলের মধ্যেই কোথাও পড়ে আছে, খুঁজলে

পাওয়া যাবে, কিংবা ধ্বসে গেছে অথবা ভেঙে গুঁড়িয়ে গেছে। কিংবা আমার বাকশো, আমার বিছানা, আমার জুতো। যুবকটি উবু হয়ে চারদিকে খুঁজতে লাগল এবং অবশেষে কিছুই যখন পাওয়া গেল না, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে এবং সেগুলির প্রতি সম্পূর্ণ নির্মোহ থেকে ভাবতে লাগল—এখন কী তার কর্তব্য। কিছুই না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সিদ্ধান্ত নিয়ে সে চুপ করে বসে রইল। এখন শুধু প্রতীক্ষা। এ-ভয়ংকর রাত ফুরোলে যদি কখনো ভোর হয়।

একটা প্রলয়ংকরী ঝড়ের শেষে এখন মৃদুমন্দ বাতাস। অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে ভেজা শরীরে শিরশির করে বিঁধছে। তবু এত বড় সর্বনাশা শক্তিকে দু-হাতে ঠেলে রাখার জন্য সে প্রাণপণ লড়েছে, সে-কথা ভেবেই যুবকটি আর সব ভুলল। এই ঠাণ্ডা বাতাস, ক্ষুধা-ক্লান্তি, অবসাদ, এমন-কি এই কবর এবং অন্ধকারকেও।

রাত কত হলো? যুবকটি চারদিকে তাকাল। কিন্তু এই বিপুল অন্ধকারে কোনোরকম অনুমানও অসম্ভব। আবার সেই নির্জন একাকিত্বে ফিরে এসে সে বিপন্ন বোধ করল। এতক্ষণ কেউ ছিল না কিন্তু একটা ঝড় ছিল, প্রচণ্ড ঝড়, একটা মহাপ্রলয়। এমন শক্তিমানের সঙ্গে লড়তে লড়তে নিজের ভগ্নস্বাস্থ্য, নিজের দীনতা, দুর্বলতা সব ভুলে ছিলাম। মানুষ একা হলে, নিঃসঙ্গ হলে কি তার শক্তি বাড়ে? যুবকটি বিস্মিত হয়—নইলে যে-অন্ধকার তার সমস্ত শক্তি নিয়ে আমাকে আক্রমণ করেছিল তার কাছে আমি পরাভব মানি নি। যুদ্ধ করে অবশেষে বিজয়ীর মতো বসে আছি এখানে, এই নিরাপদ আশ্রয়ে। আর অমাবস্যার নিশুতি রাত্রির অন্ধকার মানুষের হাতে গুলিবিদ্ধ সিংহের মতো শুয়ে আছে একা, এই কবরের সঙ্গী হয়ে। অবাক হলো সে—এতই যদি শক্তি আমার তবে কেন এমন করে লড়তে পারি নি অলৌকিক কলকাতার রাজপথে, পথে ফুটপাতে লোকালয়ের আনাচে-কানাচে।

যুবকটি হঠাৎ চমকে উঠল। কান পাতল। এই মধ্যরাত্রির নির্জন প্রান্তরে অবিশ্বাস্য, কিন্তু ভালো করে লক্ষ করল—সত্য। কণ্ঠস্বর, মানুষের কণ্ঠস্বর। উল্লাস! আর্তনাদ! অথবা কান্না! ঠিক বোঝা গেল না তবে সন্দেহ নেই কতগুলি মানুষেরই সমবেত চিৎকার। ওরা আসছে। ওদের উচ্চকিত এবং সমবেত ধ্বনি তখনো বাতাসে কাঁপছে! এরা কারা? গ্রামের

চাষি? তবে এত রাতে কেন? ডাকাত? ডাকাতরা নিশাচর। কিন্তু এই তৃণশূন্য মাঠে কিসের লোভ তাদের?

যুবকটির লোভ বাড়ল এবার। মানুষ-দেখার লোভ। তাড়াতাড়ি হাতে উপরে টাঙানো ধুতিটা সে খুলে নিলো এবং নিজের লজ্জা ঢাকল। অন্ধকারে হাতড়ে খুঁজে নিলো জামা-গেঞ্জি। গায়ে দিলো না, কাঁধে ফেলল। হাত বাড়িয়েই খুঁজে পেলো টাকা কলম কাগজপত্র। কবর ছেড়ে মানুষের রাস্তায় যাবার আগে শেষবারের মতো যে তার বাকশো-বিছানার কথা মনে পড়ল না তা নয়, বিশেষত যে সুটকেসের মধ্যে সভ্যসমাজে বেঁচে থাকার কবচ-মাদুলি ডিগ্রি-সার্টিফিকেটগুলি রয়েছে। কিন্তু সেগুলির জন্য কিছুমাত্র মমতাবোধ না করে নির্মোহ ঔদাসীন্যে অন্ধকার পথে পা বাড়িয়ে আহাঁটু কাদার মধ্যে ডুবে গেল সে। প্রায় গোড়ালির চেয়েও বেশি অংশ ডুবে গেছে কাদায়, আর বিপরীত বেগে উপরের ঢল থেকে গড়িয়ে পড়ছে জলস্রোত। দুদিকে হাত ছড়িয়ে, ভারসাম্য বজায় রেখে অত্যন্ত সন্তর্পণে প্রতিটি পদক্ষেপ ফেলে সে এগোতে লাগল সামনের দিকে। সামনেই আগাছার ঝোপ-ঝাড় ধুতিতে জড়াল। সাপের ভয়, বিষধর সাপ। কিন্তু কোনো বাধাই বাধা নয় তখন। সামনেই রাজপথ এবং রাজপথে মানুষের শোভাযাত্রা, মানুষের কণ্ঠস্বর। ভয়ংকর এই অন্ধকারের বাধাকে অতিক্রম করছে আরো কিছু মানুষ।

রাজপথে উঠে এসে সমস্ত বিভীষিকার ঊর্ধ্বে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেয়ে সে আরাম পেলো। দেখল, বিস্তীর্ণ প্রান্তরে সীমাহীন অন্ধকারকে বিদ্রূপ করে দূরের পথে উল্লাসে কাঁপছে কতগুলি আলো। প্রায় ডজনখানেক লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে আসছে মানুষগুলি। যুবকটি ওদের দিকে ছুটতে চাইল। কিন্তু বড় বড় পা ফেলতেই ক্ষুধায়-ক্লান্ত অবসন্ন শরীরটা পাক খেয়ে উঠল ভিতরে ভিতরে। কোনোরকমে সামলে নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল প্রতীক্ষায়। এ-পথেই তো যাবে ওরা।

ওরা এলো। যুবকটি অবাক হলো দেখে—আবার মৃত্যু। শবযাত্রী—দিনের আলোয় যারা লাঙল-কাঁধে ফসল ফলাতে যায়, অন্ধকার পথে তারাই শব বহন করে চলেছে শ্মশানের দিকে। যারা শব বইছে না, শুধু যাত্রী, তাদের একহাতে লাঠি, অন্য হাতে লণ্ঠন। নিষ্প্রভ আলোগুলি এই জমাট-কালো অন্ধকারে ভীরু বিড়ালের মতো নিরীহ।

'হরি, হরি বোল, হরি বোল…'

খুব কাছে এসে আবার ওরা চৌকিদারি হাঁক দিলো। সে-ডাকে মৃত্যুর প্রতি শ্রদ্ধা নেই, ঈশ্বরের উদ্দেশে নিবেদন নেই, নেহাতই একটা প্রথাগত উন্মাদ উল্লাস।

তারপর ওরা অতর্কিতে থমকে দাঁড়াল। শুধু দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। যুবকটি লক্ষ করল, ওরা পরস্পরের দিকে তাকাচ্ছে, চাপা গলায় কথা বলছে। বুঝি-বহনকারীদের একজনের হাতে টর্চ ছিল, হঠাৎ এক ঝলক তীব্র আলো আছড়ে পড়ল যুবকটির উপর। ঝাঁঝালো আলোয় যুবকটির চোখ ঝলসে যায়।

'কে গ তুমি !'

এই অদ্ভুত জান্তব পরিবেশে ভয় নয়, দুঃখ নয়, বিস্ময় নয়, কেমন মজা লাগল যুবকটির। বেশ কৌতুককর। ওরা ভয় পেয়েছে। ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপছে। ভয়! আমাকে ভয়! ওরা ভূতে বিশ্বাস করে। আমাকে ভূত ভেবেছে নির্ঘাৎ। যুবকটি অট্টহাস্যে ফেটে পড়ল। আর সেই হাসি প্রেতাত্মার কান্নার মতো দিগন্তে বিস্তারিত হলো। ক্ষুধায়, তৃষ্ণায়, কাতরতায় সমস্ত শরীরে একটা ঝিমুনি এলো। কিন্তু হাসির রেশ কমে এলে যখন সে হাঁপাতে হাঁপাতে আত্মস্থ হবার চেষ্টা করছে তখনই আঁৎকে উঠল দেখে—সামনে জীবন্ত-মৃত্যু। একজন শক্ত, জোয়ান, বিশালদেহী মানুষ নিজের কাঁধের ভারটা অন্য এক সহযাত্রীর কাঁধে সমর্পণ করে একটি লাঠি আর একটি লণ্ঠন নিয়ে এগিয়ে আসছে।

যুবকটি পালাবার চেষ্টা করল। কিন্তু অতর্কিতেই একটা শক্ত থাবা এসে পড়ল ঘাড়ের উপর।

'কে তুমি ?'

কিছুটা আতঙ্কে এবং শারীরিক দুর্বলতায় কিছু-একটা বলতে চেষ্টা করে যুবকটি উচ্চারণ করতে পারল না। ঠোঁট কাঁপল শুধু। আত্মরক্ষার জন্য শুধু করুণভাবে তাকাল।

'বল্‌শ্‌…শ্‌…শালা কে ? চোর ? ঘর কোথা ? কোন গেরাম ?'

'বল্ কে ? ডাকাত ?'

'ভূত ?'

'ছেড়ে দে মদনা। ছেড়ে দে…'

'দূ...শ্...শালা ভূতের নিকুচি করেছি।'

মুহূর্তের জন্য যুবকটি তার সমস্ত চেতনা হারাল। তারপর স্নায়ুকেন্দ্রে আবার নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে পেয়ে দেখল—মানুষগুলি যেখানে তাকে ছুঁড়ে ফেলে গেছে সেটা শক্ত রাজপথ। শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা, হয়তো রক্তপাতও ঘটেছে কোথাও কিন্তু অন্ধকারে দৃশ্যমান নয়। আবার সে বিপুল অন্ধকারে নিমজ্জিত। চলে যাচ্ছে ওরা, সরে যাচ্ছে দূরে। ওদের হাতের লণ্ঠনগুলি অন্ধকারে প্রলোভনের মতো জ্বলছে।

যুবকটি উঠে দাঁড়াল। ক্ষতবিক্ষত ভগ্ন শরীরে আবার তাকে হাঁটতে হবে এবং এই অন্ধকারে। কী জানি কেন, মনে হলো, শবের আধারে সে যেন বনানীকে দেখতে পেয়েছে, আবার মনে হলো মা-র মুখ, একবার মনে হলো সে মুখ তার নিজের। দূর নিশানার বিলীয়মান আলোর বিন্দুগুলিকে অনুসরণ করতে করতে সে যেন একই সঙ্গে অনেক প্রিয়জনের মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ করল। এত মৃত্যু কেন চারদিকে? শুধু এই শেষ-সর্বনাশের ভাবনাই যেন আচ্ছন্ন করে রেখেছে তার স্নায়ুকে। মৃত্যু! এই রাত্রি, এই পথ, এই অন্ধকারের চেয়েও কি সে ভয়ংকর? অন্তত আমার এই বেঁচে-থাকার চেয়ে? যুবকটি অতর্কিতে পা ফেলে হুমড়ি খেয়ে টলে পড়তে পড়তেও কোনো-রকমে সামলে নিলো নিজেকে।

'যদি গভীর কোনো অন্ধকারে তোমাকে পেতাম বনানী, আরো নিবিড় করে আরো ঘনিষ্ঠ করে তোমায় অনুভব করতাম।'

'কী তোমরা বলো তো, খুব কাব্যি করে বললে বেশ অশ্লীল আর কুৎসিত কথাকে খোলাখুলি বলা যায়। না?'

কাব্য নয় বনানী, আকাঙ্ক্ষা, লোভ। ঠাণ্ডা বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে যুবকটি আরো একবার নিজেকে উপলব্ধি করল। কোমরের দিকটা অবশ, অনুভূতিহীন। প্রতিটি পদক্ষেপেই মনে হচ্ছে সে যেন দুঃসহভাবে টানছে নিজেকে। এবং সেই দুঃসহ যন্ত্রণার মধ্যেই বারবার মনে পড়ছে বনানীকে। ইচ্ছে করছে, এই খোলা আকাশে, এই খোলা মাঠে, এই স্তব্ধতায় বনানীর নাম ধরে চিৎকার করে ডাকে। গলা ছিঁড়ে উন্মাদের মতো। কিন্তু শরীরের প্রতিবাদে কণ্ঠনালী পর্যন্ত এগিয়ে এসেও উচ্চারণ আটকে যাচ্ছে শুকনো গলায়। একটা বিপুল অন্ধকারে আমরা হাঁটছি বনানী। লক্ষ্যহীন, হয়তো লক্ষ্যভ্রষ্ট। যুদ্ধক্ষেত্রকে লণ্ডভণ্ড করে

ছত্রভঙ্গ হয়ে যে-যার মতো বিপথে ঘুরছি, ঘুরে ঘুরে ক্লান্ত হয়ে, সব গ্লানি, সব ক্লেদ, মিথ্যাচার, পৌরুষহীনতার লজ্জাকে মুছে ফেলতে তোমাকে, তোমাদের ব্যভিচারে টেনে এনে মজা পেতে চাই।

সমস্ত অস্তিত্বকে নাড়া দিয়ে এবার তার তৃতীয় বিস্ময় উপস্থিত হলো সামনে। আগুন! ভালো করে লক্ষ করল। সত্যি, কারা যেন আগুন জ্বেলেছে দূরে। এত দূরে যে তার অনভ্যস্ত অনুমানেও প্রায় আধ মাইলের কম নয়। এই আকাশ আর প্রান্তরের বিরাট প্রেক্ষাপটে প্রদীপশিখার মতো উজ্জ্বল। যুবকটি খুশি হলো। কেন না, অন্ধকারে পথ-চলার জন্য সে একটা নিশানা পেয়েছে। হঠাৎ নিশানা পেয়ে এবং আরো এতটা পথ তাকে হাঁটতে হবে কল্পনা করে, তার ক্লান্ত বিধ্বস্ত শরীরে আরও বেশি অবসাদ নামল। অন্তত মনে মনেও ভাবতে পারল না যে, আরও এতটা পথ সে হাঁটতে পারবে। সুতরাং মাথার উপরে বিস্তৃত আকাশ আর চারদিকে অন্ধকারের প্রান্তর রেখে সে রাস্তার উপরেই ভক্ত প্রহ্লাদ সেজে বসে পড়ল। ব্যথায়-বেদনায় সমস্ত শরীরটা ভেঙে ভেঙে পড়ছে, হাঁটু দুটো টলছে। মাংস-পেশীতে অসহ্য খিঁচুনি, মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে যন্ত্রণায়। জ্বর এসেছে বলে বোধ হলো তার। যেন একটা আগুনের হলকা বয়ে যাচ্ছে ভিতরে ভিতরে। ঠিক এই মুহূর্তে মানুষ কী চায় বনানী? যুবকটি মাথার উপরে তারাভরা আকাশের শূন্যতার দিকে তাকাল—স্নেহ, আদর, শুশ্রূষা! আর এই বান্ধবহীন অন্ধকারের জগতে, শয়তানের কালোছায়ার তলায় মরে যাচ্ছি আমি, মরে যাচ্ছি। দু-চোখ ভেঙে ঘুম নামছে। ঘুমোতে পারব না, জানি। ভিতরের শুকনো হাড়গুলি পর্যন্ত ঠাণ্ডা বাতাসের কাঁটা বিঁধছে, রক্তে উত্তাপ নেই, সমস্ত শরীরে অসহ্য যন্ত্রণা। সামনের দিকে দু-পা ছড়িয়ে, টেবিলে রাখা ফটোস্ট্যাণ্ডের মতো হাত দুটো পিছনে রেখে মাথাটা ঢেলে দিলো উলটো করে এবং হাঁপাতে লাগল। নাকে-মুখে ঘনঘন নিশ্বাস। প্রতিটি নিশ্বাসে মুহূর্ত।

অকস্মাৎ কী যেন মনে হলো তার। সমস্ত শরীরে একটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে যুবকটি সোজা হয়ে বসল। বিশাল আকাশ আর প্রান্তরের প্রেক্ষাপটে প্রদীপশিখা। যেমন করেই হোক পৌঁছোতেই হবে সেখানে। একটু দূরেই হঠাৎ কতগুলি শেয়ালের ডাক লক্ষ করল—সন্ধ্যা থেকে এত গভীর রাত পর্যন্ত সে শেয়ালের ডাক শোনে নি। এই শেয়ালগুলি এখন

ছুটে আসতে পারে এবং অকারণেই তাড়া করতে পারে অথবা এই অন্ধকারে কোনো গর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে পারে কোনো সাপ, যা একান্তই সম্ভব। কী অর্থ নিজেকে এভাবে আরো বিপন্ন করার? তার চেয়ে বরং এখনো যতটুক পারা যায়, যতটুকু সামর্থ্য আছে চেষ্টা করা ভালো। সে অনেক কষ্টে টলতে টলতে উঠে দাঁড়াল। হাঁটতে গিয়ে স্পষ্ট উপলব্ধি করল ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে সে, প্রতিটি পদক্ষেপেই মনে হচ্ছে—'আমি এগোচ্ছি, আমি আছি।' বাঁ-পায়ে ভর রেখে ডান-পা ফেলতে সময় নিতে হয়, বুকে হাঁপর টেনে দম নিতে কষ্ট। তবু দু-পাশের শেয়ালের হল্লা আর ব্যাঙের বেসুরো একঘেয়ে কোরাসকে কেমন যেন এ-অন্ধকারে স্তব্ধতার সাক্ষী বলে বোধ হলো তার, আর ওই আগুনকে জীবনের নিশানা। হঠাৎ যেন কোথায় উধাও হয়ে গেছে এত দমকা বাতাস। দুদিকের গাছপালা সব স্থির, অচঞ্চল। আকাশের নক্ষত্রগুলিকে কেন জানি, বড় বেশি আপন বলে মনে হলো হঠাৎ। অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে সে যেন অনেক অনেক পথ অতিক্রম করে অনেক অভিজ্ঞতার শেষে এখানে ক্লান্ত, অথর্ব, বৃদ্ধ। নিঃসঙ্গ এবং একক। বনানী! তার একটিমাত্র স্মৃতি এবং একমাত্র অতীত।

অন্ধকারে এগোতে এগোতে যুবকটি আরো বারকয়েক বিশ্রাম নিলো। দুর্বহ শরীরের ভারটা যেন আর টানতে পারছে না। প্রচুর খিদে পেয়েছে, তৃষ্ণায় কণ্ঠনালী পর্যন্ত শুকিয়ে আসছে। একটি স্বচ্ছ কাঁচের গ্লাসে একগ্লাস জলের দৃশ্যই তখন সবচেয়ে আকাঙ্ক্ষিত সামগ্রী তার কাছে। কিন্তু মাথা কুটে মরলেও এখানে এক ফোঁটা জল পাবে না কোথাও, সে জানে। সুতরাং মনে হলো, অনর্থকই এক জোড়া ভেজা জামা-গেঞ্জিকে কাঁধে বয়ে বেড়াচ্ছে সে। সেগুলি মুখের কাছে তুলতেই আত্মতিরস্কারে চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে করল তার। বোকার মত আগে থেকেই নিংড়ে নিয়ে আমশি করে রেখেছে। নইলে এগুলিই হয়তো তাকে বাঁচাত এখন। আবার সে রাস্তার উপর বসে পড়ল এবং ধুতির যে-অংশটা সবচেয়ে বেশি ভেজা মনে হলো সেটুকু দলা পাকিয়ে নিংড়োতে চেষ্টা করল ঠোঁটের গোড়ায়। জল ঝরল না। শক্তি নেই। সে তার পরনের ধুতি চুষতে লাগল অথবা চিবোতে লাগল।

দূরের প্রদীপশিখা দাবানল হয়ে জ্বলছে তখন। হোমের আগুনের মতো। আর কি এগোনো সম্ভব? মনে হচ্ছে, আর বেশিক্ষণ এভাবে

থাকলে সে এখনই টলে পড়বে রাস্তার উপর। নিজের হাতে নিজের শরীরের উত্তাপ অনুভব করা যায় না। কিন্তু হাত-পায়ের ব্যথা আর মাথার অসহ্য যন্ত্রণায় সে স্পষ্ট বুঝতে পারছে, ভীষণ জ্বর এসেছে তার। খাদ্য আর জলের চেয়েও বুঝি তখন আরো বেশি প্রয়োজন—আগুন। একটু উত্তাপ। নইলে এই ঠাণ্ডা বাতাসে সে আর পারছে না। হাত-পাগুলি সিঁধিয়ে যাচ্ছে, কুঁকড়ে যাচ্ছে শরীরটা। সে মরে যাবে, নির্ঘাৎ মৃত্যু। এবং সে কথা ভেবেই যুবকটি আস্তে আস্তে আবার উঠে দাঁড়াল। তবু চেষ্টা করে যেতে হবে। শেষ চেষ্টা।

দু-হাত বুকের কাছে চেপে, চোখ-মুখ বিশ্রীভাবে খিঁচিয়ে, দাঁত কাঁপাতে কাঁপাতে সে এগোতে লাগল। অত্যন্ত হিসেবে পা-ফেলা। প্রতিটি মুহূর্ত তখন তার অত্যন্ত প্রয়োজন, প্রতিটি পদক্ষেপ জীবনের জন্য। অন্ধকারে পথ চেনা দায়। হঠাৎ গিয়ে ঝোপেজঙ্গলে পা পড়ছে, আবার সামলে নিতে হচ্ছে, অসংস্কৃত পিচের রাস্তায় কখনো জল-ভর্তি গর্তে পা ডুবে যাচ্ছে, হোঁচট খাচ্ছে, ভাঙা শরীরকে ধকল সইতে হচ্ছে। রাস্তার খোয়াগুলি পায়ের তলায় বিঁধে বিঁধে ঝাঁঝরা করে দিলো। তবু যুবকটি এগোতে লাগল। সে তখন সব কষ্টযন্ত্রণার ঊর্ধ্বে। সামনে তার জীবনের নিশানা—আগুন। যে-আগুন হোমের আগুন হয়ে জ্বলছে।

রাত্রির আরো একটা প্রহর কাটিয়ে, আস্তে আস্তে, একটু একটু করে কৃপণের মতো সময় খরচ করে ক্লান্তি-অবসাদ আর সহনশীলতার শেষ স্তরে, শেষ সীমায় পৌঁছে যেখানে সে হুমড়ি খেয়ে পড়ল, দূরের আগুন সেখানে খুব কাছে হঠাৎ শ্মশানের চিতা হয়ে জ্বলছে। অদ্ভুত জান্তব উল্লাসে সে আগুন মাটি থেকে জন্ম নিয়ে আকাশের ঊর্ধ্বে থরে থরে কাঁপছে, নাচছে, চারদিকের ভয়ংকর কালো আর বীভৎস অন্ধকারের পশ্চাৎপটে সে-আগুনের রঙ আরো তীব্র, সে-আগুনের লালচে আভা আরো ভীষণ, আরো ভয়ংকর। কালো ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাক খেয়ে খেয়ে ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। সে যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে। কেন না, তার নাকে এখন গন্ধ ভেসে আসছে। হাঁপাতে হাঁপাতে যুবকটি একটু বিশুদ্ধ বাতাস নিতে চাইল। কিন্তু বাতাস এখানে স্তব্ধ, মড়কের দেশের ছবির মতো স্থবির গাছপালা। আকাশের তারাগুলি ঊর্ধ্ব-লোকের নীরব দর্শকমাত্র। মৃতপ্রায় সেই যুবক গভীর আকুতি নিয়ে

আকাশের দিকে তাকাল। তাকাল মাটির দিকে। আগুনকে ঘিরে উৎসবে মেতেছে কিছু মানুষ। লালচে আভায় মানুষগুলি জান্তব। সে যেন প্রাগৈতিহাসিক অন্ধকারে মানুষের আবিষ্কার প্রথম আগুন, আর সেই অগ্নিকে কেন্দ্র করে আদিমানুষের বিস্ময় আর আদিম উল্লাসকে প্রত্যক্ষ করছে। যে-আগুনে প্রিয়জনের দেহ ভস্ম হয়ে যাচ্ছে সে-আগুনেই বিড়ি ধরাচ্ছে ওরা, তাড়ির নেশায় লোকগুলি অপ্রকৃতিস্থ, ওদের জিবের জড়তা, আধো আধো উচ্চারণ সবই অস্পষ্ট শোনা যায়। ওদের হাসি, খিস্তি, শহুরে কালচার থেকে প্রাপ্ত ফিল্মি গান। একটা মানুষ অনাসক্তভাবে এবং নির্বিকার নির্মোহ হয়ে চিতার উপর লাঠি মারছে আর হাসছে আর হঠাৎ-হঠাৎ বলে উঠছে—'শ্‌-শ্‌ শা…অা…লা।'

নিজের শরীরের অসহ্য যন্ত্রণা সত্ত্বেও রহস্যময় সমগ্র দৃশ্যটির দিকে তাকিয়ে যুবকটি যুগপৎ বিস্ময় ও কৌতুক বোধ করল। জীবনকে নিয়ে কী নির্মম ঠাট্টা, নিষ্ঠুর তামাশা। যে-জীবন মানুষের।

এবং, তারপর সেই যুবক একটি নিরাপদ আশ্রয় খুঁজে অন্ধকারে নিজেকে লুকোল। যেখান থেকে কোনো মানুষ তাকে দেখতে পাবে না, এমন-কি ঘরে-ফেরার পথে ওই মানুষগুলির হাতের লণ্ঠনও তাকে শনাক্ত করবে না কখনও। অথচ সে-আশ্রয় বিপজ্জনক ঝোপ-ঝাড়। মাথার উপরে ডালাপালা-ছড়ানো শক্ত একটা গাছ। বৃষ্টিশেষে বাতাসের ঝাপটায় পাতাগুলি কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঝিরঝির জল ঝরে ঝরে পড়ছে ঠিক বৃষ্টির মতো। শীতার্ত, লাঞ্ছিত, পীড়িত শরীরের শিরা-উপশিরা পর্যন্ত নাড়া দিয়ে তুলছে। মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে, চোখ জ্বলছে, জ্বর বাড়ছে, ঠাণ্ডা বরফ হয়ে জমে যাচ্ছে শরীর। কিন্তু উপায় নেই। যুবকটি তার সব কর্তব্যের শেষ বলে মনে করল এই আশ্রয়। কী যেন একটা লাফ দিয়ে উঠল শরীরে। বুঝল—ব্যাঙ। কিন্তু নড়ল না, ধাক্কা দিয়ে ফেলেও দিলো না, এমন-কি বিন্দুমাত্র ঘৃণাবোধও আর নেই। চুপচাপ বসে রইল। নির্বিকার, ভাবলেশহীন। ঘুম পাচ্ছে। চোখ ভেঙে পড়ছে। সাপ আর শেয়ালের করুণায় নির্ভর করে সে এখানেই ঢলে পড়তে পারে এবং সে-রকম একটা সিদ্ধান্তই সে গ্রহণ করল। কিন্তু একটু পাশ ফিরতেই সমস্ত পিঠ জুড়ে কাঁটা ফুটছে চামড়ায়। শেয়ালকাঁটা, বাবলাগাছের চারা, কাঁটানটে—অন্ধকারে দেখা যায় না কিছু। গোটা পিঠটা পুড়ে যাচ্ছে, অসহ্য

দাহ। কিন্তু সে হাত বুলোল না পিঠে। শক্ত করে চোখে চোখ বুজল, দাঁতে দাঁত চাপল। ঝিম্ মেরে দম বন্ধ করে স্থির হয়ে বসে রইল শুধু। তীব্র যন্ত্রণা থেকে শরীরে উত্তাপ বাড়ছে, ঘাম ঝরছে। এবার শান্তি, এবার আরাম। মাথাটা দু-হাতে শক্ত করে চেপে ধরে নাকেমুখে ঘনঘন নিশ্বাস নিতে নিতে সে বারকয়েক কপালগালথুতনির ঘাম মুছল।

ওদিকে ঈশ্বরের নাম। সমবেত হরিধ্বনি। ওরা ফিরে যাচ্ছে। যুবকটি চমকে তাকাল। সারি-বাধা লণ্ঠনগুলি আবার এগিয়ে আসছে রাস্তার দিকে এবং শোভাযাত্রা করে লাফাতে লাফাতে সেগুলি আবার অন্ধকারে মিশে যাবে। যুবকটি এবার তার মৃত্যুর গুহা থেকে বেরিয়ে এলো। আস্তে আস্তে, পায়ে পায়ে, সন্তর্পণে, লোভী শেয়ালের মতো। ক্ষতবিক্ষত বিধ্বস্ত শরীরের সব ক্লান্তি, অবসাদ, অসুস্থতাকে জোর করে দাঁতের গোড়ায় চেপে ধরে সে এগোতে লাগল। আরো ঘন গভীর অন্ধকার চারদিক থেকে ঢেকে দিচ্ছে শ্মশানের স্তব্ধতা। রাতকানার মতো পা ঠুকে ঠুকে অদৃশ্য ঝোপঝাড়ের মধ্যবর্তী সরু পথটুকু অনুসরণ করে সেই যুবক থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে টলতে টলতে নিস্তব্ধ শ্মশানের মাটিতে প্রেতের মতো প্রবেশ করল। খুব কাছেই কতগুলি শেয়াল চিৎকার করে ডাকছে। পায়ের তলায় কী যেন ঠেকল একটা—মাথার খুলি। বাতাসে পোড়া চামড়ার গন্ধ। যুবকটির লোভের-চোখ জ্বলজ্বল করে উঠল। দ্রুত এগিয়ে এলো সে। দগদগে ঘায়ের মতো জ্বলছে চিতার কাঠ। দু-হাত বাড়িয়ে সে আলিঙ্গন করল শ্মশানের আগুন। সে-আগুনের উত্তাপ তাকে স্পর্শ করল। সেই উত্তাপে নিজের শরীর সেঁকতে সেঁকতে তার চোখ বুজে এলো আরামে, স্বস্তিতে, উষ্ণতায়। শরীরের প্রতিবিন্দু রক্তের অস্তিত্বে সে বারবার অনুভব করল—'আমি আছি, আমি আছি, আমি আছি।'

অবিরত চেনামুখ

একে একে সকলেই একেবারে সদর দরজার দোরগোড়ায় রাস্তার ফুটপাতে এসে দাঁড়াল—মা, বাবা, ভাই, বোন—সাতজন। কেউ কথা বলছে না, সাহস নেই, শুধু অপেক্ষা করছে, নিজেদের মধ্যেই কেউ একজন হঠাৎ কথা বলে স্তব্ধতা ভাঙবে, তারপর সকলেই পরস্পরের দিকে চোখ তুলে তাকাবে। বুক-চাপা দীর্ঘশ্বাসটা কণ্ঠনালীর গোড়ায় যেখানে দলা পাকিয়ে বুকের ভিতর যন্ত্রণা ছড়াচ্ছে, হাতের মুঠোয় সেই গলাটা চেপে ধরে ভয়ে আতঙ্কে সবাই চারদিকে এলোমেলো তাকাতে লাগল। কেমন নিঝ্‌ঝুম হয়ে আস্তে আস্তে এলিয়ে পড়ছে গলিটা। চারপাশে এক সঙ্গে রেডিও বাজছিল কতগুলি, একই সঙ্গে 'জয়-হিন্দ' ঘোষণা জানিয়ে সব বোবা বনে গেল। রাত এগারটা, এখনও দোতলা-তিনতলায় কয়েকটা আলো, টুপ টুপ করে সেগুলিও নিভে যাবে। প্রায় নির্জন গলিটা তারপরও মরা-মানুষের মতো পড়ে থাকবে সারারাত, কর্পোরেশনের তিনটে লাইটপোস্ট সারারাত জেগে থেকে মরা-গলিটাকে পাহারা দেবে, রাত বাড়লে কুকুরগুলি একে একে ছুটে আসবে, হাইড্রেন্টের আশে-পাশে জঞ্জালের মধ্যে খাদ্য খুঁজবে, একজনের আহার কেড়ে নিতে আর সবাই চিৎকার করবে। এবং মাঝে মাঝে মরা-গলিটার স্তব্ধতা ভেঙে মধ্যরাত্রিকে আরও বীভৎস আরও ভৌতিক করে ওরা জানান দেবে পৃথিবীটা এখনও নিঃশেষে প্রাণী-শূন্য নয়। এবং হয়তো তখনও, রাত গড়িয়ে গড়িয়ে যদি ভোরও হয়, তবু বুকের যন্ত্রণাগুলিকে সবাই মিলে চেপে থেকে, সারারাত জেগে, ওই ল্যাম্পপোস্টগুলির মতো ঠায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওরা এই গলিটার শব আগলে থাকবে। যখন ঘরে ঘরে সব আলো নিভে যাবে, সব বাড়ির সদর দরজায় যখন খিল আঁটা, ঠিক তখনও হয়তো উনচল্লিশের-বি বাড়ির দরজায় মানুষগুলি কথা না-বলে জটলা বেঁধে অপেক্ষা করবে। যদি মেয়েটা সত্যি না আসে।

অদূরে তিনতলা বাড়িটার দোতলায় জোরালো সাদা বাতি নিভে গিয়ে নীল আলো জ্বলল, ঊর্ধ্বে নীল-আলোর দুটি চতুষ্কোণ। সবাই তাকাল। মুহূর্তে চমকে উঠেই মা অতর্কিতে ডুকরে কেঁদে উঠলেন। সকলের আগে বাইরে এসে, চৌকাঠে বসে, দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে ছিলেন মা। পথের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। ছুটে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরল তিনবোন, বসে পড়ল মাকে ঘিরে—'মা, তুমি কেঁদো না মা। মা শোন…মাগো…'

'দাদা থানা থেকে ফিরবে এক্ষুনি। একটা খবর নিশ্চয়ই পাবো—'

'ওঠো মা, ঘরে চলো—'

মেজোবোন মিনুর শাড়ির আঁচল গড়াচ্ছিল রাস্তায়, বিহারী মুচিটা যেখানে সকাল-সন্ধ্যা বসে জুতো সেলাই করে। ভাই মন্টু এসে মেজদির আঁচলটা কাঁধে তুলে দিলো।

বৃদ্ধ বাবা হাঁপানি রোগী, কান্নার গোঙানি শুনে, এবং কী ভেবে অকস্মাৎ ধুঁকতে ধুঁকতে প্রায় অন্ধের মতো রাস্তা ধরে এগোতে লাগলেন। সন্তানেরা ছুটে এলো—'আপনি অসুস্থ, আপনি যাবেন না বাবা।'

কিন্তু উদাস বৃদ্ধ কী ভাবছেন ঊর্ধ্বে তাকিয়ে, কান্নাদুঃখকাকুতিমিনতি সব স্পর্শের বাইরে, সম্মোহিতের মতো এগোলেন সামনের দিকে। খালি গায়ে নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণের উপবীত, একটু পরে পরেই আকাশের দিকে করজোর তুলে ঈশ্বরকে প্রণাম। কী বিশাল রাক্ষুসে শহর কলকাতা! খালি-পায়ে, ছানি-পড়া-চোখে চশমা ছাড়া কোথায় আর যাবেন! কতটুকু? হাঁটতে হাঁটতে মানুষ শুধু একটি সরলরেখা ধরেই এগোতে পারে। কিন্তু কতদিকে কতভাবে হারিয়ে যেতে পারে মানুষ। কে কোথায় খুঁজবে কাকে! এই রাতে, অন্ধকারে, কলকাতা শহরে! একেবারে-ছোট-ছেলে মন্টু, স্কুলে পড়ে, বাবার পাশে পাশে রইল।

এবং এদিকে সদর দরজায় আর সব ভাইবোনেরা স্থির অপলক তাকিয়ে থাকে। মা পথে বসে আঁচলে মুখ লুকিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছেন, বাবা নিঃশব্দে এগিয়ে যাচ্ছেন অন্ধকারে, দাদা থানায়। ইংরেজি 'টি'-এর মতো গলিটা যেখানে ডানে-বাঁয়ে-ছড়ানো আরেকটা মাঝারি গলির মুখে গিয়ে মিশেছে, সেখানে পান-বিড়ির দোকানটার সামনে এখনও জনাকয়েক মানুষ, ইতস্তত কয়েকটা রিকশ, ট্যাকসি। নাইট-শোর শেষে শালীদের নিয়ে মফঃস্বলের জামাইবাবু ফিরছে, অথবা নব-দম্পতি। দূর থেকে কতগুলি

অস্পষ্ট মানুষের ছায়া-ছায়া শরীর। এখন মধ্যরাত্রি, অথচ ঘরে-ফেরার সময় এখনও ফুরোয়নি মানুষের। ভোরবেলা খাঁচা খুলে দিলে পোষা-পায়রাগুলি ফর্‌ফর্‌ করে বেরিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে যায়, সারাদিন ধরে, সন্ধ্যা পেরিয়ে রাত অবধি গোটা কলকাতার আনাচে-কানাচে কিলবিল করে কিন্তু কলকাতা তার সব খুপরির দরজা সেঁটে দেবার পরও সব পাখি ফেরে না। কত রাত! কত রাত পর্যন্ত মানুষ হাঁটে রাস্তায়? ওরা যে যার মতো অনড় পুতুল হয়ে রাস্তার ফুটপাতে দাঁড়িয়ে থাকে—যদি এখনও হঠাৎ এক ঝলকে একটা শাড়ির আঁচল আচম্‌কা বাঁক ফেরে গলির মুখে।

'রাত কটা বাজে রে এখন?'

মা-র ক্লান্ত কণ্ঠস্বর। সবাই তাকায়।

'ঝুনু…'

'এই সওয়া এগারটা, সাড়ে এগারটা হবে।'

'না মা, রেডিওর সময়-সঙ্কেত হয়ে গেছে সেই কখন—' পায়জামা হাঁটুর উপর তুলে রাস্তার উপরই বসে ছিল পল্টন। উঠে দাঁড়ায়—'বারোটা বেজে গেছে।'

মায়ের পিছন থেকে মিনু ঠোঁটে তর্জনী তোলে—'না মা, এখনও এত ভেঙে পড়ার মতো কিছু হয় নি। ও-বাড়ির শোভা-ওরা নাইট-শোর সিনেমায় গেছে, এখনও ফেরেনি।'

এবং ঠিক তখনই চারদিকে, নিঃঝুম বাড়িগুলি থেকে গির্জার ঘন্টার মতো সমস্বরে ঘড়িগুলি বেজে উঠল, বাজতে লাগল ঢং ঢং ঢং…এক… দুই…তিন… চার…প্রতিটি ধ্বনির তরঙ্গে কতগুলি মানুষের পাঁজরায়,কাঁসার পাতে হাতুড়ির ঠোক্‌করের মতো…পাঁচ…ছয়…সাত…আট…বাজতেই থাকে এবং মানুষগুলি সময় গোনে না, শক্ত হয়ে স্থির নিস্পন্দ দাঁড়িয়ে থেকে শুধু শেষ ঘন্টাটার প্রতীক্ষায় রইল। এবং নিয়মমাফিক শোক প্রকাশের জন্য দু-মিনিট নীরবতা পালনের মতো নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে বিচ্ছিন্নভাবে একা-একা অথবা সমবেত-ভাবে আবিষ্কার করল, রাতদুপুরের নৈঃশব্দ্যের মধ্যে একটা সামান্য শব্দেও ভূতেরা খেলা করে, বুকের ভিতরটায় ভয়ের পেণ্ডুলাম দোল খায়। ঘরের অন্ধকারে ছেলেমেয়েকে পাশে নিয়ে শুয়ে, অবশ হাতের হাতপাখাটা যদি কারও গায়ে লেগে শব্দ হয় হঠাৎ, মেঝেতে তিনবার পাখা ঠুকে মা শব্দের-ভয় তাড়ান, ঘুমের মধ্যে টিকটিকির ডাকেও তর্জনী আর-বুড়ো আঙুলে তিনসত্যি

দেন। নিস্তব্ধ অন্ধকারে শব্দকে এত ভয়! অথচ ঝিমোন গলিটার উপর দাঁড়িয়ে অবোধ ছেলেমেয়েকে নিয়ে অসহায় মা, শুধু পরস্পরের চোখে চোখ রেখে, পরস্পরকে বিশ্বাস করে, ঘড়ির কাঁটায় সময়ের গর্জন শুনেও এখন নীরব। অপলক তাকিয়ে থাকেন উধ্বে', অন্ধকারে গাঢ় নীল আলোর দুটি চতুষ্কোণের দিকে। দক্ষিণ খোলা জানলায় এখন ওদের প্রচুর বাতাস। মিনু ঝুনু রানু আর পল্টন মা-র অপলক চোখের চেয়ে-থাকার দিকে তাকিয়ে থাকে।

'দিদি বলেছিলেন আমাকে গানের স্কুলে ভর্তি করে দেবেন—' সবচেয়ে ছোটবোন আট বছরের রানু ঘুম-জড়ানো গলায় বলল—'দিদি আসবে না মা?'

রাত দুপুরে ঘড়ির ঘণ্টার মতোই অতর্কিতে কয়েকটি ধ্বনি, শব্দ, কথা। সবাই চমকে তাকাল। তারপর একজন আরেকজনের দিকে। ক্ষুব্ধ অভিমানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে মাদাদাদিদিদের দিকে তাকাল রানু। কেউ তাকে আদর করে ডেকে নিচ্ছে না, সাড়া দিচ্ছে না কেউ। এবং সকলেই মাথা নুয়ে নিজেদের বুকের কান্নাকে দাঁতের কামড়ে ঠোঁটে চেপে স্থির হয়ে আছে। আচমকা হাত বাড়িয়ে মেয়েকে বুকের কাছে টেনে নিলেন মা। বললেন, কান্নায় ভিজছে গলা—'ঘুম পেয়েছে ওর। ওকে একটু শুইয়ে দিয়ে আয় মিনু।' এবং কান্নাকে বুকে চেপে রাখার অমানুষিক যন্ত্রণায় যখন শরীর কাঁপছে, সকলের অলক্ষ্যে বালিশে মুখ গুঁজে শুধু একটু কাঁদবার লোভে ছুটে এসে, প্রায় ছোঁ মেরেই ওকে টেনে নিয়ে গেল মিনু।

আর আধো অন্ধকারে, আবছা আলোয়, দরজায় স্থিরচিত্রের মতো স্থবির হয়ে রইল তিনজন। দূরে রাস্তার মোড়ে পান-সিগারেটের দোকানটাও বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আর মানুষ নেই পথে, এপাশে ওপাশে ছায়াচ্ছন্ন. বাড়িগুলিতে শুধু নিরাপদ ঘুম, ঘুম, কী আশ্চর্য শান্তি ওদের জন্য। কয়েকটা ঘেয়ো-কুকুর খুব কাছাকাছি এসে দাঁড়িয়েছিল, একটা কুকুর হাইড্রেন্টের পাশে আবর্জনার মধ্যে কী শুঁকছে, একটা কুকুর উঠে এসে ঝুনুর গা ঘেঁসে দাঁড়াল। ঘেন্নায় অথবা ভয়ে ঝুনু একলাফে মা-র কাছে ছুটে এলো। একটা ঢিল খুঁজে পল্টন হাতে তুলে নিতেই মা বাধা দিলেন—'থাক'। ঢিল ছুঁড়লেই ওরা চিৎকার করবে। একসঙ্গে এতগুলি কুকুর, ওদের হল্লায় সাড়া দিয়ে দূরে মোড়ের দিকে কুকুরগুলি ডেকে উঠবে, তারপর দূর থেকে, দূরে, চারদিক

থেকে রাতদুপুরের নিশুতি ভেঙে সারা শহর জুড়ে কুকুরেরা চিৎকার করবে। এখন এই রুদ্ধশ্বাস ভয় ভয় নীরবতায় যে কোন শব্দেই বুক কাঁপে। রাত গভীর হলে এ শহর কুকুরদের, সারা রাত ধরে শুধু ওরা, শুধু ওরাই পথে পথে, মোড়ে মোড়ে ঘুরে ঘুরে বেড়ায়। এবং ভিন্ন ভিন্ন ভাবে ওরা তিনজন—চৌকাঠে পা এলিয়ে আঁচলে চোখ ঢেকে নিঝ্‌ঝুম মা, মায়ের কাছাকাছি একেবারে রাস্তার ধুলোয় হাঁটু ভেঙে বসে ঝুনু, এবং একেবারে রাস্তার মাঝখানে ষোল বছরের কিশোর পল্টন পায়জামাটা হাত দিয়ে হাঁটুর উপর টেনে গোটা কলকাতায় পাল-পাল লোভা কুকুরের ছুটোছুটির কথা ভাবে। আর মনে হয়, দু-পাশের শ-এ শ-এ কুকুর ঘেউ ঘেউ করে শহরের ঘুম্ কাড়ছে। ওদের দু-পাশে সরিয়ে মৃত নগরীর বড়ো বড়ো রাজ-পথের ঠিক মাঝখানে, ট্রাম-রাস্তার উপর দিয়ে, হাঁটুর দিকে শাড়ির কুঁচি ডান হাতে মুঠো করে ধরে, শায়াশুদ্ধ গোড়ালির কাপড় একটু তুলে, ব্যাগটাকে বাঁ-হাতের কনুই-এ ঝুলিয়ে, বাঁ-হাতটা বুকে চেপে, একা, জনহীন নিঝুম রাত্রির বুক-ছম-ছম ভয় মাড়িয়ে দিদি, চিনু,…চিন্ময়ী…দিদি ঘরে ফেরার পথে। সকাল নটায় ভাত খেয়ে আপিসে বেরিয়েছেন, সারাদিন ধরে কত্তো-কাজ করেছেন দিদি, এখন ক্লান্ত। দূরের টিউবওয়েল থেকে আমরা সবাই মিলে বালতি বালতি জল এনে দেব দিদিকে, স্নানের জল, কী ভীষণ ঠাণ্ডা…দিদির শরীর জুড়োবে। যেন কিসের নেশায় একটু একটু করে, দূরের রাস্তার আলোটাকে নিশানা করে এগিয়ে যাচ্ছে পল্টন। ঝুনু আর মা তাকিয়ে থাকে, বাধা দেয়না। কুকুরগুলি সোরগোল তুলে তেড়ে যায়, পল্টন আমল দেয় না, পায়ে পায়ে হাঁটে। দূরে কর্পোরেশনের আলোটাকে ঠিক সোজাসুজি মাথার উপর রেখে নিজের ছায়াটাকে সারাশরীরে জড়িয়ে স্থির হয়ে দাঁড়ায়। কুকুরগুলি গোল হয়ে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে, নিজের ছায়াটাকে আবার সামনের মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে এগোতে থাকে পল্টন। দুটো আলোর মধ্যবর্তী একটুকু অন্ধকার, অন্ধকারটুকু পেরোলেই ছায়াটা পিছনে আছাড় খায়। এক আলো থেকে অন্য আলোয় যাবার পথে নিজেরই ছায়াটাকে আছড়াতে আছড়াতে পল্টন একেবারে মোড়ের দিকে বাঁক ফিরে অদৃশ্য হয়ে গেল। সঙ্গে কুকুরগুলি হাঁটে, এই অন্ধকার-রাতের শহর এখন ওদের, এখন অনধিকারে মানুষের পথ-চলা।

'মা, পল্টনও কোথায় চলে গেল।' ঝুনু ভয়ে মা-কে জড়িয়ে ধরে।

'যাক—'

'মা',—ফিসফিস করে ঝুনু—'ঘরে কেউ আর রইল না মা, কোন পুরুষ মানুষ।

'ঘরের তিরিশ বছরের আইবুড়ো মেয়েটা রাতদুকুর তক্ বাড়ি ফিরছেনা, আর পুরুষমানুষগুলি বিছানায় পড়ে পড়ে ঘুমোবে! যা…আ…ক ..'

'কিন্তু মা, পল্টন…এতটুকুন বাচ্চা ছেলে, এত রাতে…'

'যাক, যাক, সব যাক…' অতর্কিতে নড়েচড়ে হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে উঠলেন মা। একটা দীর্ঘশ্বাস, যেন অনেকক্ষণ ধরে বুকের মধ্যে আটকে ছিল, বেরিয়ে এলো। এবং সঙ্গে সঙ্গেই দেয়ালে হেলান-দেওয়া শরীরটা বাঁ-দিকে ঝুঁকিয়ে মেঝেতে বাঁ-হাতের ভর রেখে, হঠাৎ ডুকরে উঠলেন। তারপরই রোগা শুকনো শরীরটা চৌকাঠের উপর লুটিয়ে পড়ল ধুলোয়—'চিনু, চিনু রে, এতগুলো পেটের জোগান দিতে গে কোন শেয়াল-শকুনে খেলো রে তোকে…'

ঝুনু অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাকে। মিনু ছুটে আসে। দু-বোন পরস্পরের দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে চোখ সরিয়ে নেয়। পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে লুটোচ্ছেন মা। মা-র পা দুটো চৌকাঠ পেরিয়ে রাস্তায়, শরীরটা মাথাটা ঘরের দিকে। ওরা ঝুঁকে পড়ে মা-কে ডাকল। কান্না থেমে গেছে। মা-র ঠোঁট ফাঁক করে দাঁতে আঙুল ঠেলল মিনু, হাতের মুঠো পরখ করল। দু-বোন মা-কে আরও একটু ভিতরের দিকে টেনে-হিঁচড়ে নিয়ে এলো। জল আনল, হাতপাখা।

'মেজদি!' ঝুনুর গলায় কান্না—'আমার ভয় করছে।'

মিনু সাড়া দিলো না। জলের ঝাপ্‌টা দিতে লাগল মা-র চোখে। জলে জলে ভিজিয়ে দিলো মা-কে। মা-র কাঁচা-পাকা চুলের সিঁথিতে সিঁদুর, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা লেপ্‌টে যাচ্ছে জলে। চোয়াল-ভাঙা শুকনো মা-র কঙ্কাল মুখটায় স্বাস্থ্যবতী দিদির আদল।

'দরজাটা বন্ধ করে দেব মেজদি?'

'আরও জোরে হাওয়া কর।'

ঝুনুর হাত নড়ে না। কাঁপে। এতরাতে, রাত কত এখন কে জানে, একটা…দেড়টা…দুটো…বাইরের রাস্তাটায় এখন কী ভীষণ ভয়। আরও গুটিসুটি মেরে আঁচলে মুখ চেপে বসে থাকে ঝুনু। কেমন কান্না পাচ্ছে,

পেটে মোচড় লাগছে। দরজাটার দিকে তাকিয়ে থাকে। ভেজানো দরজাটায় যদি এক্ষুনি কেউ ধাক্কা দেয়! দড়াম করে দরজা খুলে যদি কেউ ঢুকে পড়ে!...বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে। আর যদি, আর দিদিই...দিদিই ঢুকে পড়ে হঠাৎ! দিদি! শিউরে ওঠে বুকটা! এতক্ষণ কোথায় ছিলি দিদি... কি ভীষণ সুন্দর দেখাচ্ছে তোকে...দিদি...তুই... মা-কে দেখে দিদি থমকে দাঁড়াবে...আমরা সবাই মিলে ভয়ে শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছি তোর জন্যে...দিদি...হঠাৎ, একেবারে অতর্কিতে হাত থেকে পাখাটা খসে পড়ে, হাঁটু ভেঙে উপুড় হয়ে মাথাটা মেঝেতে ঠুকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে ঝুনু। কাঁদতে থাকে। এবং মিনু অসহায়ভাবে চারদিকে তাকিয়ে, ভেজানো দরজা, দরজার উপরে বাড়িওয়ালার গণেশমূর্তি, সরু প্যাসেজের দু-পাশে স্যাতসেঁতে দেয়াল, উপরে কড়িবরগা, রাশি রাশি ঝুল, ঝোলানো হলদে বালবের ম্যাটমেটে আলো আর সামনের ধুলোয় লুটানো মায়ের শরীর, এক পলকে বড়ো খারাপ ছবি মনে হয়, যেন ঘর থেকে মা-কে বাইরে আনা হয়েছে, নিস্পন্দ শরীর চিৎ হয়ে পড়ে আছে, ঝুনু ডুকরে ডুকরে কাঁদছে, ওর খোলা এলোচুল মুখের পাশে ঝুলে পড়েছে, পিঠটা থরথর করে কাঁপছে, সব দেখে নিজেকে বড়ো অসহায়, বড়ো বিপন্ন মনে হলো। এতবড়ো বিপদের মুখে এখন সে একা, একা দাঁড়িয়ে এই মরা-মানুষের ঘর সামলাতে হবে। নিজেদের খেয়ালে, ভীরুতায়, কাজে বা অকাজে কে কোথায় ছড়িয়ে পড়েছে। ঠিক দিদি, দিদির মতো। ছোট ছোট ভাইবোন আর মা-বাবাকে নিয়ে এতো বড়ো সংসারটাকে দিদি যেমন ঝড়ের মুখে একা রুখে যাচ্ছে। আপিশ, টুইশানির শেষে সন্ধ্যায় ঘরে ফিরে দিদি যখন তিরিক্ষি হয়ে থাকে, বড়ো অপরাধী মনে হয় নিজেদের। দিদিকে খুশি করতে মা বাবাকে সারাক্ষণ ভাত-গেলার খোঁটা দেন আর পেনশানের সামান্য টাকা-কটায় বাড়িভাড়া চুকিয়ে সারামাস মাথা নুয়ে সময় কাটান বাবা। আপিশ থেকে ঘরে ফিরলে বড়োমেয়ের ছাড়া-শাড়িব্লাউজ ভাঁজ করে গোছাতে গিয়ে অকারণে ধমক খান। অনেক রাতে ক্লান্ত হয়ে, সারারাত ঘুমোতে না পেরে, শুধু ছটফট করে, ঘুমন্ত ভেবে পাশ থেকে ছোটবোনের হাতটা বুকে টেনে নিয়ে...ছোটজামা খুলেই শুতে হয়, ব্লাউজের টিপ্‌বোতাম সেফটিপিন্ খুলে যায়...বড়ো উত্তাপ বড়ো জ্বালা তোর দিদি, সকালে চোখে চোখ রাখতে লজ্জা। আর একটা বছর দিদি, একটু সবুর কর, বি-এ-টা

পাশ করে নিই, তোকে মুক্তি দেব, এর মধ্যে দাদা যদি একটা চাকরি খুঁজে নিতে পারে। মিনু নিজেও এবার নিজের উপর অধিকার হারায়, ভিতর থেকে একটা কান্নার চাপ চাপিয়ে উঠতে চাইছে। দুর্বৃত্তরা নারী-মাংসের ব্যবসা লোটে…হাওড়া স্টেশনে বাক্সশোর ভিতর টুকরো টুকরো যুবতীর দেহ…পুকুরের জলে ভাসমান রমণীর শব…রগরগে দু-চোখের পাশে শিরায় শিরায় টান ধরে, খবরের কাগজে রোমহর্ষক সব কাহিনী মা-গো। মিনু মায়ের মজা বুকটায় কাপড় টেনে দেয়, ভেজাচুলে হাত বুলিয়ে আদর করে। হাত শিথিল হয়ে আসে। এক ঝটকায় মাথা তোলে ঝুনু, কান্নায় কান্নায় কী বাভৎস ওর মুখ, ভয়ে সিঁধিয়ে গেছে ভিতরে। দু-বোন চোখে চোখে তাকায়, নিঃশব্দে কান পাতে, এখন নিশ্বাসেরও শব্দ শোনা যায়। দরজাটার ওপাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে! দু-বোন রুদ্ধনিশ্বাসে তাকিয়ে থাকে। মধ্যরাত্রির ঘুমন্ত শহরের থমথমে স্তব্ধতা কাঁপিয়ে ফেরি-ওয়ালার মতো দূরে কারা হরিধ্বনি হাঁকে। শিউরে ওঠে মিনু, সারা শরীরে ঘাম জমে শিরশির শিরশির করে গায়ে কাঁটা দেয়।

'মেজদি—'প্রায় শোনা-যায়-না ঝুনুর চাপা গলা।

'তুই ঘরে যা—'

'তুই!'

'মা-কে ধরে আছি, তুই যা, রানু একা শুয়ে আছে, ভয় পাবে।'

ঝুনু সত্যি চলে যায়। ছোটবোনকে স্বার্থপর মনে হয় না আর। কেমন যেন হয়ে যাচ্ছে সবাই, বুকের মধ্যে যন্ত্রণা নিয়ে কেউ কিছু সইতে চাইছে না আর, এড়িয়ে যাচ্ছে, পালিয়ে বাঁচছে। তোর পরেই আমি দিদি, তোর মতোই আমি একা, একা আমি কী করব! মাটিতে চিৎ হয়ে পড়ে-থাকা মা-কে জড়িয়ে হু হু করে কাঁদতে ইচ্ছে করছে। সারা শরীরে প্রচণ্ড মোচড় দিয়ে ঠেলে উঠছেন মা, নাকেমুখে প্রেসার-কুকারের ঠেলে-ওঠা বাষ্পের মতো দীর্ঘশ্বাস, মুখে গ্যাঁজলা উঠছে। মিনু আবার জলের ঝাপটা দেয়। মা-র ঠোঁট খুলে আঙুল দিয়ে দাঁত দেখে, হাতের মুঠো খুলে হাত বুলোয়। ভেজানো দরজাটা কাঁপছে, তাকায়, তাকিয়ে থাকে। বাতাস! সান্ত্বনা খোঁজে। সাহস! আবার হরিধ্বনি, রাত কাঁপিয়ে কারা যায়। খই ছড়ানো পথে মানুষের গন্ধের পিছু পিছু কুকুরগুলি চিৎকার করে ছুটছে। ভয়ে সিঁধিয়ে গিয়ে উপুড় হয়ে মা-কে জড়িয়ে ধরে মিনু। হরি হরি বোল…

নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, মায়ের মজা-বুকে মুখ লুকোয় মিনু—হরি বোল...কোথায় একটা টিকটিকি ডেকে ওঠে, মাকে আরও জোরে আঁকড়ে ধরে—তিন-সত্যি দিও না মাগো। মা...এখনও বিশ্বাস রাখো, তুমিই বলেছিলে বরিশালের গ্রামে ঘরের দোচালায় বসে মাঝরাত্তিরে কালপেঁচা ডেকেছিল, অমঙ্গল, ঠাকুরমা মারা গেলেন। কলকাতায় কালপেঁচা নেই, লক্ষ্মীপেঁচাও না। এখানে তবু ভয়! ভয়ে বুক কাঁপে সারাক্ষণ। শুধু অমঙ্গল—

মিনু মাথা তোলে, উৎকর্ণ হয়, দাঁতে ঠোঁট চেপে শক্ত হয়ে কান পেতে থাকে। ও-দিকে রাস্তার মোড়ে যেন একটা গাড়ি-থামার শব্দ! ঠিক শুনলাম তো! কেমন সংশয়। ট্যাক্সি! মোটর! দিদি! বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়। বাইরে ছুটে গিয়ে দেখার সাহস নেই, মায়ের শরীর আগলে বসে থাকতেও ভয়। চোখ বুজে, দম বন্ধ করে প্রতীক্ষা শুধু। ওই মোড় থেকে বাড়ির দরজা। কতটুকু! কতক্ষণ! কয়েকটা ভারি জুতার শব্দ, এ-দিকেই আসছে! বুকটা ছ্যাৎ করে ওঠে! মিনু ঝটকা মেরে উঠে দাঁড়ায়। বুকের কাপড়ে টান লাগে, মা শুয়ে আছেন আঁচলের উপর। হ্যাঁচকা টানে শাড়িতে বুক ঢাকে। এখনও চোখ খোলো মা, কারা আসছে, আমি তোমার আরেক কুমারী মেয়ে! মা গো...ইচ্ছা করে মাকে একা রেখে ঝুনুর মতোই পালিয়ে বাঁচে। শান-বাঁধানো রাস্তা কাঁপিয়ে জুতোর শব্দ আসছে, এ-রাতে এ-বাড়ি ছাড়া আর কোথাও কোনো ঘটনা নেই। গলা শুকিয়ে আসে, তেষ্টা, দু হাতের মুঠো মুখে তুলে-আঙুল কামড়ে চিৎকার করতে ইচ্ছা করছে। গোটা পাড়ার-লোক জাগিয়ে দিয়ে নিজে বাঁচুক। মিনু চোখ বুজে অনেকক্ষণ ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থেকে শুধু সময় গোনে এবং যেন অবধারিতভাবেই দরজার কড়াটা খুব আলতোভাবে বেজে ওঠে এক সময়। এত মৃদু, তবু তীব্রভাবে কানে এসে বিঁধছে। কয়েক হাত দূরে অথচ এগিয়ে গিয়ে সাপের ঝুপরির ডালা খুলতে ভয়।

'কে?—নিজের কানেই ফ্যাসফেসে গলার স্বরটা কেমন অদ্ভুত শোনায়, যেন কণ্ঠনালীতে আটকে আছে কি।

আবার কড়া নড়ে—'কে আছেন দরজা খুলুন।'

মিনু স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকে। বুকে সাহস জোগায়।

'দরজা খুলুন, আমরা থানা থেকে আসছি।'

থানা! পায়ের পাতা থেকে তরতর একটা শিহরণ সারা শরীরে খেলে

যায়। থানা কেন? একলাফে ছুটতে গিয়ে হোচট খায়, মূৰ্ছিত মায়ের কোমরে লাথি লাগে। প্রণামের জন্য হাত বাড়িয়েও থমকে যায়, ঘুমন্ত মানুষকে প্রণাম করতে নেই। ভেজানো দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখে নেয়, বাইরে সত্যি দু-জন পুলিশ অফিসার। দরজাটা ঈষৎ ফাঁক করে নিজেকে পিছন-পিঠ রেখে অসম্বৃত মাকে ঢাকে—'আপনারা! আপনারা কেন?'

'এটা উনচল্লিশের বি, মিস চিন্ময়ী সেনগুপ্তের বাড়ি!'

'হ্যাঁ, দিদি কোথায়?'

'তার বাবার নাম শ্রীঋষিকেশ সেনগুপ্ত?'

'হ্যাঁ—'

'তাঁকে ডাকুন, কথা আছে।'

'তিনি বাইরে গেছেন, দিদিকে খুঁজতে।'

'কোথায়?'

'জানিনা।' মিনু হাঁপাতে থাকে।

'বাড়িতে আর কোন ব্যাটাছেলে!'

'দাদা থানায়।'

'জানি, সেখান থেকে তাকে আমরাই পাঠিয়েছি!'

'কোথায়?'

'সে কথা থাক,—' ওরা নিজেদের মধ্যে কিসের ইঙ্গিত জানাল—'আপনার দাদা রাত দশটায় ডায়েরি করার পর থেকে এখন পর্যন্ত আপনার দিদিকে ট্রেস আউট করতে পারি নি। সম্ভবও নয়।'

'সম্ভব নয়!'

'এতো রাতে এতো বড় শহরে সত্তর লক্ষ মানুষের মধ্যে যদি একটা মেয়েছেলে হারিয়ে যায়. বেঁচে থাকলে তিনি নিজেই ফিরবেন। নইলে…'

'বলুন-

'নইলে তাঁর মৃতদেহ খুঁজে পেয়ে তদন্ত শুরু করব…'অফিসার বগলের ব্যাটনটা হাতে তুলে নিয়ে নিস্পৃহ-ভঙ্গিতেই বলতে লাগলেন—'শুনুন যা বলতে এসেছি। খোঁজখবর নিয়ে এখন পর্যন্ত যা জেনেছি, হাসপাতাল বা পুলিশ-মোর্গে আইডেন্টিফায়েড অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ রিপোর্টের মধ্যে ও-নামে কেউ নেই, কিডন্যাপ্‌ড আর ইল্‌লিসিট কানেকশানের জন্য আজ

ভদ্রঘরের যে-কজন মেয়েছেলের নাম রেকর্ডেড হয়েছে, লালবাজার থেকে খবর এসেছে তাতেও আপনার দিদির নাম নেই। তবে এইমাত্র হেড-কোয়ার্টার্স থেকে টেলিফোনে একটা নতুন কেসের খবর পেয়েছি, তার জন্যেই কিছু ইনফরমেশন চাই।'

নতুন কেস্! এক ঝামটায় বেরিয়ে আসে মিনু—'বলুন…'

ওদের একজন বুকপকেট থেকে ছোট একটা নোটবুক বের করলেন। রাস্তার ম্লান আলোয় কিছু লিখবেন বলে কলমও খুললেন— 'আচ্ছা, মিস সেনগুপ্ত, আপনার দিদি আজ কী পরে অফিসে গেছেন। শাড়ির রং ব্লাউজ অ্যাণ্ড আদার ডিটেল্‌স্…'

মিনু ভাবতে চেষ্টা করে। কপালে উপচে-পড়া এলোমেলো চুলগুলি দুহাতে ঘসে দুপাশে কানের দিকে টেনে নেয়। কিছুই মনে নেই, রোজকার মতো এত সামান্য ঘটনা। দিদির শাড়িগুলি ভাবে মনে মনে। তাছাড়া দিদিব শাড়ি বলতে কী-ই বা বোঝায়? তিনবোনই তো তিনবোনের শাড়ি-ব্লাউজ-শায়া পরে আপিশে কলেজে যায়, আসে।

'কী হলো…'অফিসার হাসলেন—'মনে পড়ছে না তো!'

'না, ঠিক…আচ্ছা, দাঁড়ান, ছোটবোন আছে, ওকে জিগ্‌গেস করলে…'

'লিভ্ ইট্, ওয়েল মিস সেনগুপ্ত, আপনার দাদা তার ডায়েরির স্টেট্‌মেণ্টে ভদ্রমহিলার কোন আইডেণ্টিফাইং-মার্ক বলতে পারেন নি। কিন্তু আপনি কী জানেন ঠিক এখানে, এই জায়গাটায়…'অফিসার তার নিজের ডানদিকের উরু দেখালেন—'কোনো বড় রকমের আঁচিল আছে কী?'

'ঠিক জানি না তো, বাবা বলতে পারবেন, মা…'মিনু মৃতবৎ-মায়ের কথা ভাবল। দরজার ফাঁকটুকু একেবারে পুরোপুরি বন্ধ করে রাস্তায় এসে দাঁড়াল—'মা সেই তখন থেকে সেন্‌স্‌লেস্…'

'চিন্ময়ী দেবীর সব প্রাইভেট খবর, এক্‌স্‌ক্লুসিভ্‌লি পার্সোনাল অ্যাফেয়ার্স আপনাদের মধ্যে কে সবচেয়ে বেশি জানে।'

'দিদির পরে দাদা, তারপরে আমি। দিদি চাপা মেয়ে, তবু যেটুকু বলেন আমাকেই বলেন।'

'আজ অফিসের ছুটির পর ক্যানিং-ডায়মণ্ডহারবার লাইনে কোথাও কী যাবার কথা ছিল?'

'কই, জানি না তো'!

'পরেশ বসু বলে কাউকে জানেন ?'

'না আ আ…অ্'

'কোন ভদ্রলোকের সঙ্গে আপনার দিদির কোন প্রাইভেট অ্যাফেয়ার্স…'

'কই, শুনিনি তো কখনও।'

'কিছুই তো জানেন না দেখছি…' অফিসাররা হাসলেন। নোটবুকটা নিষ্প্রয়োজন বলে পকেটে গুঁজলেন।

মিনু ওদের লম্বাচওড়া বিরাট শরীর, চওড়া বেল্ট, কাঁধের ইন্‌শিগনিয়া কোমরের পিস্তল, মাথার টুপি, সর্বাঙ্গে চোখ বুলোয়। প্রায় স্বপ্নের মধ্যে বলে ওঠে—'একজন ছিলেন…'

'কে ?'

'কিন্তু সে তো অনেক আগে। দিদি তখন কলেজের ছাত্রী—'

'কী নাম ?'

'সোমনাথ চ্যাটার্জী।'

'কোথায় তিনি ?'

'কী এক ছাত্র-আন্দোলনের সময়ে আপনাদের…মানে পুলিশের গুলিতে মারা গেছেন। দিদি লুকিয়ে কেঁদেছিলেন। দিদি বলেন, তাঁর জন্যেই আজও এ-ভাবে লড়তে পারছেন।'

অফিসাররা যেন আকরণেই ভারি-জুতোর গোড়ালি ঠুকলেন রাস্তায়। থমথমে চারদিকে প্রতিধ্বনি উঠল। পরমুহূর্তেই মুখোমুখি তাকালেন—'আপনার দাদা মর্গে গেছেন।'

'মর্গে। কেন ?'

'আন-আইডেন্টিফায়েড ডেড্‌বডির মধ্যে যদি কারও মুখ…' অফিসার একটা ঝাঁকুনি দিয়ে প্রসঙ্গান্তরে ফিরলেন—'এইমাত্র হেডকোয়ার্টার্স থেকে টেলিফোনে খবর পেলাম…'

দেয়ালে শরীর এলিয়ে ঝিম্ মেরে দাঁড়িয়ে থাকে মিনু।

'ক্যানিং-এর একটা লোকাল ট্রেনে সন্ধ্যে আটটা নাগাদ হঠাৎ সোনারপুরের কাছে রানিং ট্রেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিলেন একজন মহিলা। এখন শম্ভুনাথ পণ্ডিত হস্‌পিটালে। এমার্জেন্সি ওয়ার্ড, বেড নম্বর ফিফটি ফোর। প্রফিউজড ব্লিডিং, কন্‌ডিশান সিরিয়াস। ভদ্রমহিলার সঙ্গে একটা কালো লেডিজ-ব্যাগ ছিল, কোণে ছোট্ট স্টিলের

ব্যালেরিনা—'

আর্তনাদ করে নিজের চুড়িশুদ্ধ্ হাত কামড়ে ধরে মিনু।

'ডোন্ট্ গেট্ নার্ভাস্। ওরকম কয়েক হাজার ব্যাগ প্রতিদিন বিক্রি হয় কলকাতায়। সবুজ-পাড় সাদা তাঁতের-শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ, হাতে দু-গাছা সোনার চুড়ি, ছোট একটা ফুল-আঁকা রুমাল, এককোণে ইংরেজিতে 'সি' লেখা ..... ।

কান্নার হিক্কায় থরথর থরথর শরীর কাঁপে। দুহাতে মুখ ঢেকে ঝুঁকে পড়ে মিনু।

'আর একটা চিঠি ছিল; নিজের নাম ঠিকানা কিছুই নেই। পরেশ বসুকে লেখা—হু ডেজার্টেড হার অ্যাণ্ড সি ওঅজ প্রেগনেন্ট, অব কোর্স ইন্ ভেরি আর্লি-স্টেজ নাউ...'

শরীরে-মনে প্রায় সর্বস্বান্ত মিনু হঠাৎ শক্ত হয়ে ওঠে। মাথা তুলে তাকায়। অফিসাররা নিজেদের কর্তব্য শেষ করে চলে যাচ্ছে। ওরা দূরে গিয়ে সিগারেট ধরাল। পিছনের দিকে একবারও ফিরে না তাকিয়ে সামনের দিকে এগোতে লাগল। এ-পাশ ও-পাশ গোটা রাস্তা জুড়ে ওদের বিশাল ছায়াদুটো নির্জন রাস্তায় তোলপাড় করছে। গলির মোড়ে কালো গাড়িটা কী বীভৎস। আঁচলে মুখ ঢেকে মিনু তাকিয়ে থাকে। গির্জার ঘন্টার মতো চারদিকে কোথায় যেন সমস্বরে ঘড়িগুলি বেজে ওঠে—রাত দুটো। এতরাতে গেরস্তঘরের মেয়ে ফিরে না এলে মর্গে ঘুমোয়, নয়তো হাসপাতালে অক্সিজেন টানে, নয় তো ..আর ভাবতে পারে না মিনু। এত বড়ো কলকাতা শহরে, লাখো লাখো মানুষের মধ্যে কোথায় যেন অন্ধকারে খুনীরা লুকিয়ে আছে। দিদি, শেষে তুই, তুই-ও বাঁচার নেশা ছাড়তে পারলি না! আমি যে তোকে সত্যি ভালবাসতাম! তোর জন্যে কতোরাত আড়ালে কেঁদেছি। শেষে তুই! চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসছে সব। নিঝ্ঝুম রাস্তা, রাস্তার আলো, থমথমে বাড়িগুলি। গোটা কলকাতা শহরটাই এখন অন্ধকারের তলায় অসাড় পড়ে আছে, আর রাস্তার আলোগুলি খুনীর চোখের মতো জ্বলছে। এরই মধ্যে জীবিত অথবা মৃত, দিদি কোথাও আছে। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল! বেড নম্বর! মনে করতে চেষ্টা করল মিনু ফিফটি ফোর। এমার্জেন্সি ওয়ার্ড। হঠাৎ যেন চোখের সামনে জ্যান্ত একটা মুখ। দিদি তুই! কিছুতেই ঠিক বিশ্বাস হয় না, যেন আরও অনেক বেশি

সুন্দর, অনেক বেশি নিষ্পাপ মনে হয় দিদিকে। অসম্ভব! এই এত বড়ো কলকাতা শহরে সত্তর লক্ষ মানুষের মধ্যে তোর মতো, আমার মতো, হাজার হাজার মেয়েই তো আমরা সবাই একরকম দিদি। কয়েক লক্ষ কালো ব্যাগ আছে বাংলাদেশের মেয়েদের হাতে, লক্ষ লক্ষ ব্যাগের কোণে স্টিলের ব্যালেরিনা, সবুজ-পাড়-শাড়ি, সবুজ ব্লাউজ, লক্ষ লক্ষ মেয়ের নামের আদ্যক্ষর ইংরেজিতে 'সি' দিয়ে শুরু, তাদের মধ্যে হাজার হাজার মেয়ে রুমালে ফুল এঁকেছে নাম লিখেছে তোর মতো··· হাজার হাজার মেয়ের শরীরে সঙ্গোপনে লুকোন জন্মের দাগ, ঠিক তোর মতো। আবার সংশয় জাগে, দ্বিধা—বিশ্বাস হারাতে কষ্ট হয়। হাসপাতালের ধবধবে বিছানায় এ কার মুখ? না, দিদি নয়, হতেই পারে না। অমনভাবে দেউলে হবার আগে দিদি—না, কী-ই বা করতে পারত ও! কেমন যেন খটকা লাগে, দিদির চেহারাটা সামনে ভাসে। কিছুদিন ধরে বড়ো বেশি সুন্দর হয়ে উঠছিল, বড়ো বেশি গম্ভীর, মুখেচোখে কিসের একটা ভয় সারাক্ষণ! আপিশের খাটুনি, র‍্যাশানালাইজেশন! অটোমেশনের খাঁড়া! জোট বাঁধছে য়ুনিঅন, আসন্ন ধর্মঘট, মিছিল মিটিং অভিযান! মিথ্যে কথা, সব মিথ্যে কথা! দিদি তুই! ছিঃ,ছিঃ, ছিঃ,—

মিনু হঠাৎ নড়ে ওঠে। গলির মোড়ে আবার কিছু মানুষের শব্দ, এক দল মানুষ। আঁচল দিয়ে চোখমুখ রগড়ে নিয়ে আরও নিবিষ্ট চোখে দেখে—বাবা, দাদা, পল্টন, পল্টনের-কাঁধে-মন্টু। মন্টু নিশ্চয়ই ঘুমিয়ে পড়েছিল। বুকে সাহস বাড়ে, শক্ত হতে চেষ্টা করে এবার। ঘরের মানুষগুলি ফিরেছে। দিদিকে বাদ দিয়েই এখন সংসার। ভাবতে কেমন যেন ধক করে ওঠে বুকটা। এত অনায়াসে বাদ দিয়ে দেওয়া যায় একটা মানুষকে! অথচ যাকে বাদ দিলে, আজ পুরো সংসারটাই যেখানে বাতিল। রাতদুপুরে মাত্র কয়েকজন জীবন্ত, জেগে-থাকা-মানুষ জনহীন রাস্তার নীরবতা ভেঙে অত্যন্ত আস্তে আস্তে পা গুণে গুণে, মাথা নুইয়ে এগিয়ে আসছে। শ্মশানযাত্রীর ঘরে-ফেরার মতো, ঘরের কাছে এসে মৃত-আত্মার শোকে বিহ্বল। লোহা আর আগুন রাখতে হয় দরজার গোড়ায়। একে একে সবগুলি ছায়া এসে মিনুর শরীর অন্ধকারে ঢাকল। মিনু দরজায় পিঠ ঠেসে স্থির সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। ওরাও নির্বাক থমকে দাঁড়াল। সকলেই একবার করে ভালোভাবে দেখল সবাইকে। তারপর আবার চুপ করে

রইল। মন্টুকে ঘরে শুইয়ে দেবার জন্য দরজা ঠেলে ভিতরে ঢুকতেই চিৎকার করে উঠল পল্টন—'মা...আ...আ...'

হুমড়ি খেলো সবাই। তাকাল মিনুর দিকে। এবং স্বগতোক্তির মতোই প্রতিটি শব্দের নিখুঁত উচ্চারণ করে গেল মিনু—'ফিট হয়ে পড়ে আছেন রাত একটা থেকে, একা যতটুকু পেরেছি করেছি...' কেউ অবাক হলো না। পল্টন পাশ কাটিয়ে চলে গেল। নিতাই অস্থিরভাবে অন্যমনস্ক পায়চারি করতে লাগল দু-চার পা। বাবা স্থবির। সহসা বয়স্ক হয়ে উঠেছে দাদা, যেন সারা শহর তন্নতন্ন করে খুঁজে ফিরেছে চোখে-মুখে বিভীষিকা।

'দাদা—'

নিতাই থমকে দাঁড়াল।

'মর্গে গিয়েছিলি?'

নিতাই ছুটে আসে— তুই জানলি কী করে?'

'পেলি দিদিকে?'

'না।'

'কী দেখলি?'

'ওঃ...ফ্... ' উত্তেজনায় কেঁপে যায় নিতাই। দু-হাতে চুলের মুঠি ধরে চিৎকার করে ওঠে—'সে একটা নরক, নরক, উঃ মাইরি, কী বলব তোকে...'

'ও ভাবে চেঁচাস নে দাদা। পাড়ার-লোক জেগে উঠলে কেচ্ছা রটবে।'

'কেচ্ছা এখন রটবে না।

'ভালোয় ভালোয় ভোর হলে কাল সকালে, বলব, দিদি মামাবাড়ি গেছে ছুটি নিয়ে। বেড়াতে।'

'তারপর।'

'বলব, সেখান থেকেই বিয়ে হয়ে গেছে। বর ইঞ্জিনিয়ার, ফারাক্কা কি মাইথনে থাকে...'

'তারপর!'

'তারপর আর এ-পাড়ায় আমাদের দায় নেই। বাড়ি তো আমাদের ছাড়তেই হবে। এরপর আরও শস্তা কোন ঘর, একঘরে সবাই, বস্তি বা অন্য কোথাও, বাবার ও-কটা পেনশনের টাকা, তুই যদি চাকরি না পাস পড়া ছেড়ে আমাকেও নামতে হবে। সেখানে আমরা দিদিকে ভুলে যাব।

দিদি বলে আমাদের কেউ ছিলই না কোনোদিন। তারপর একদিন রাত্তিরে আমিও বেমালুম হাওয়া হয়ে যাব। তোরা নতুন ঘরে যাবি..'

তিনজনই আবার চুপ করে যায়। তিনজনের উপর দিয়ে দ্রুত এবং নিঃশব্দে সময় প্রবাহিত হয়। একইভাবে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে হঠাৎ মিনু ডাকে—'বাবা'।

বৃদ্ধ ঋষিকেশ ফিরে তাকান।

'এখানে, ঠিক এরকম কোথাও দিদির কোন আঁচিল আছে?' মিনু নিজের উরুতেই সেই সম্ভাব্য স্থান নির্দিষ্ট করে—'মনে আছে আপনার?'

বৃদ্ধ বিস্মিত হন। বিস্ময়ে তাকায় নিতাই—'কী সব বলছিস্ তুই?'

'বলুন না মনে আছে আপনার?' মিনু স্বাভাবিক—'দাদা যদি মর্গে দিদির মুখ দেখে আসতে পারত অথবা এখনও যদি আমার প্রশ্নের উত্তরটা পাওয়া যেত, আমরা ঘরে ফিরতে পারতাম।'

নিতাই আবার ক্ষেপে ওঠে—'কী, তুই পাগল হলি নাকি, কী বলছিস সব?'

দেয়াল হাতড়ে হাতড়ে ঠোক্কর খেয়ে মা-ও দরজার পাশে এসে দাঁড়ালেন। রাস্তার আবছা আলোয় কী কুৎসিত দেখাচ্ছে মাকে। ক্লান্ত রুগ্ন চোয়াল-ভাঙ্গা মুখটায় যেন দীর্ঘ রোগভোগের কাতরতা। সবাই তাকায়, কেউ কুশল প্রশ্ন করে না। শাড়ির ভেজা-আঁচল টানতে টানতে শুধু দীর্ঘ বিলম্বিত উচ্চারণে মা প্রশ্ন করেন—'চিনু এএএলো না। ওর কোন খোঁজ পেলি না নেতাই?'

যেন সাড়া দেবার দায় নেই কারও। চারজনের মাঝখানের শূন্যতায় সংসারের বড়োমেয়ের, একমাত্র রোজগেরে মেয়ের স্মৃতির শবটাকে ঘিরে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকে আর মধ্যরাত্রির নীরবতা চারদিক থেকে ওদের ঘিরে রাখে।

'মা...' মিনু মা-র দিকে তাকায়—'তোমার মনে আছে, এখানে, এই কোমরের কাছে দিদির কোন আঁচিল আছে?'

'আঁচিল! চিনুর!' মা যেন স্মৃতি হাতড়ে খুঁজছেন কিছু। উদাসভাবে অন্ধকারের ঊর্ধ্বে আলোর চতুষ্কোণের দিকে তাকালেন—'ঠিক মনে পড়ছে না।'

'বাবা—'

'সে আজ অনেকদিনের কথা মা, কী করে বলব।'

'বাঃ, বেশ তো…' সকলের মধ্যে অন্তত এই প্রথম একজন, মিনু, অনেক কষ্টে হাসতে চেষ্টা করল—'তোমাদের কোলে বড়ো হয়েছি আমরা। আর আমাদের বড়ো-হয়ে-ওঠা, আমাদের শৈশবকে তোমরাও মনে রাখো নি? তোমাদের সন্তান বলে আমাদের শনাক্ত করতে তোমরাও পারবে না?'

আবার সেই আশ্চর্য নীরবতার মধ্যে চারজন ডুবে যায়। এবং হাসপাতালের সাদা বিছানায় চিৎ হয়ে পড়ে-থাকা একটি নারীর কথা কল্পনা করে মিনু, যেখানে একটি শিশু অন্ধকার খামচে খামচে জন্মের মধ্যেই তিলেতিলে মরে যাচ্ছে এবং আরও একজন লজ্জায়, ঘৃণায়, অন্তর্দাহে শুধু জীবনের মোহে মায়ের-মুখ লুকোয়। বলব না রে দিদি, শুধু নিজের মধ্যে লুকিয়ে রেখে তোকে ভদ্রভাবে বাঁচিয়ে রাখব। আনআয় ডেন্টিফায়েড ডেড-বডি বলে মর্গে, অন্ধকারের নরকে পচে গলে শেষ হয়ে যা তুই, বডি আনক্লেইমড। আর সকলের মধ্যে সতী হয়ে লক্ষ্মীমেয়ে হয়ে চিরকাল বেঁচে থাক…

'তোর বাপকে ঘরে যেতে বল্ নেতাই। হেঁপো রোগী, ঠাণ্ডায় দাঁড়িয়ে থাকলে টান বাড়বে…' মা-র জড়ানো কণ্ঠস্বর—'মিনু…'

'হু—'

'ঘরে চল্ মা…'

ওদিকে গলির আড়ালে একটানা ঘস্ঘস্ শব্দ। নিতাই উঠে দাঁড়ায়—'আমরাই আর কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকব? কর্পোরেশনের ঝাড়ুদাররা বেরিয়ে পড়েছে। রাত ফুরিয়ে এসেছে।'

বাবাকে তার অনিচ্ছাসত্ত্বেও জোর করে টেনে নিয়ে এলো নিতাই। ভিতরে ঢুকতে হোঁচট খেলেন বৃদ্ধ। মা-কে ধরে অন্দরের দিকে ঠেলতেই মা ডুকরে কেঁদে উঠলেন। নিতাই মিনুর দিকে তাকাল। নিঃশব্দে রাস্তা থেকে উপরে উঠে এলো মিনু। কলকাতাটা এবার সত্যি সত্যি ঘরের বাইরে চলে যাচ্ছে। এবং ভিতরে ঢুকে কপাটদুটো সশব্দে টেনে দিয়ে খিলটা ধরে নিতাই থমকে দাঁড়াল—'দরজাটা?'

সবাই চমকে উঠে পরস্পরের দিকে তাকাল, তাকাল দরজাটার দিকে। কেউ কোন নির্দেশ দিতে পারছে না। এবং নিতাই-এর খিল তোলার শব্দটা আচমকা তিনজনেরই বুকে ধরাস করে বেজে উঠতেই আরও

জোরে চিৎকার করে উঠলেন মা।

ভিড়ের ট্রেনে থার্ড-ক্লাস কামরার মতো ট্রাঙ্ক-বাক্শো তক্তপোশ জামাকাপড় ঠাসাঠাসি একচিলতে ঘর। মেঝেতে বিছানা পাতা হলে দুটো মানুষের বেশি দাঁড়াবার ঠাঁই নেই। ঝুনু, পল্টন, মন্টু, রানু এলো-পাথারি ঘুমিয়ে পড়েছে মাটিতে, এখানে ওদের নিয়ে মা ঘুমোন। উপরে তক্তপোশে দিদির সঙ্গে মিনু। এবং তক্তপোশের শূন্যশয্যার দিকে তাকিয়ে মিনু কোন পুরুষমানুষ নয়, দিদির কথা ভেবে বুকের নিশ্বাস টানল। দাদা মেঝের বিছানায় হাঁটু ভেঙে, হাঁটুর উপর দু-হাতের আড়াআড়ি ভাঁজ রেখে মাথা গুঁজে বসল চুপচাপ। বাবা নিঃশব্দে তক্তপোশের উপর বসে বালিশে হাত বুলোতে লাগলেন এবং কাঠের পুরনো আলমারিতে ঠেস দিয়ে দেয়ালের দিকে তাকিয়ে রইলেন মা। বহু বছরের পুরানো ক্যালেণ্ডারের অসংখ্য রঙিন ছবি, এক দেয়াল থেকে অন্য দেয়ালে টানা দড়িতে স্তূপীকৃত শাড়ি ধুতি প্যান্ট জামার বোঝা, আলমারির উপর মন্টুর ঘুড়ি-লাটাই, ঠাকুরদা-ঠাকুরমার বিবর্ণ ফটো, মা-বাবার পুরনো বিয়ের ছবি, খাঁজ-কাটা দেয়ালের তাকে মা-র ঠাকুরদেবতা, দেয়ালে কালো কাপড়ে লাল-পদ্ম, সাদা-সুতোয় উপরে নিচে মা-র যৌবনের সূচিশিল্প—'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।' তার পাশে দিদির কনভোকেশনের ফটো। মিনু তাকিয়ে থাকে। এর চেয়েও দিদি অনেক সুন্দরী।

'মেয়েটা তাহলে সত্যি এলো না।' বাবা উদাসভাবে মুখোমুখি দেয়ালের দিকে তাকালেন—'এখন আমরা কী করব ?'

'এই সংসার!' মা যেন অদূরে তার আরাধ্য দেবতার কাছে স্থিরদৃষ্টিতে কোন সান্ত্বনা খুঁজছেন।

'আমাদের কী হবে।' একরাশ চুল ঝাঁকিয়ে মাথা তুললেন দাদা।

'আমরা ভেসে যাব, কিন্তু আমাদের চেয়ে আরও ভেসে গেলেন দিদি। তোমরা ওর কথা কোনোদিন ভাবলে না...' মিনু হঠাৎ ঝাঁঝিয়ে ওঠে। অসম্ভব তেঁতো। গলাটা চিড় খায়—'তোমাদের বড়োমেয়ে তোমাদেরই চোখের ওপর বড়ো হয়ে উঠল, তোমরাই বড়ো করে তুললে। আর...'

বৃদ্ধ ঋষিকেশ অসহায়ভাবে তাকালেন। মার কণ্ঠস্বরে দীর্ঘশ্বাসের টান—'আমারও কী সাধ যায় না তোদের ঘর-সংসার গড়ে দিয়ে তোদের হাসিমুখ দেখি। কিন্তু...'

'তোমাদের ওই কিন্তু, গাদা গাদা কিন্তুর চাপে আমরা যে শেষ হয়ে গেলাম মা…'

'না, তুই দেখিস…' মা থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে আলমারিটা আঁকড়ে ধরলেন—'ঠাকুর যদি ওকে সুস্থশরীরে ফিরিয়ে এনে দেন, এবার ওর জন্যে, কথা দিচ্ছি, দেখিস, দেখিস তোরা…'

'না, মিথ্যে কথা, কিছুই করবে না…' মিনু চিৎকার করে ওঠে—'রেশন থেকে বাজার থেকে মন্টু না-বলে কুড়ি কি পঁচিশ পয়সা নিলে তুমি ধমকে বলো, চাইলে কী দিতাম না, তাই বলে চুরি করলি কেন ? না মা, চাইলে তুমি দাও না, দিয়েছ কখনও ? একটা সিকি বাঁচাতে ছেলেকে চোর বানাও…' ক্রোধে আর উত্তেজনায় ফুঁসছে মিনু—'ধরো, কাল সকালেই যদি খবরের কাগজে ছবি দিয়ে বড়ো বড়ো হরফে তোমার মেয়ের গপ্পো ছাপা হয়, নষ্ট মেয়েছেলের কেচ্ছা, ট্রেনের তলায় কী বাসের তলায় ইজ্জত বাঁচাতে মরেছে চিন্ময়ী সেনগুপ্ত নাম্নী জনৈকা তরুণী…'

'মিনু মেরে ফেলব, মেরেই ফেলব তোকে…' তেড়ে ফুঁসে জানোয়ারের মতো এক ঝটকায় লাফিয়ে ওঠে নিতাই।

'শোক, না ? দিদির জন্যে আজ একেবারে শোক উথলে উঠছে তোদের। না…'মিনুও ঠিক পাল্লা দিয়ে রুখে দাঁড়াল—'মর্গের অন্ধকারে হঠাৎ মরামানুষ ঘেঁটে এসে আজ খুব ভাবুক হয়ে গেছিস, না দাদা ! আর দিনের পর দিন এই ঘরটায়, এই মর্গ আর নরকটার মধ্যে কুরে কুরে এতগুলি মরামানুষ যে পচে গলে শেষ হয়ে যাচ্ছে, সে দিকে কোন হুঁস ছিল না তোর ? দিনের পর দিন হিন্দী ফিল্ম, হিন্দী ফিল্মের শিস, আর এই সব অসভ্য পোষাকআশাক পরে পাড়ার মোড়ে, রেস্টুরেন্টে বন্ধুদের সঙ্গে মস্তানি, দিদি বিরক্ত হয়েছে, যাচ্ছেতাই বলেছে, সেদিন মেয়েটার জন্যে এত দরদ তোদের কোথায় ছিল রে দাদা, আর, আর…' মিনু একনাগাড়ে চিৎকার করে হাঁপাতে থাকে, কণ্ঠস্বর হঠাৎ যেন খাদে নেমে আসে—'তোদেরই-বা কী বলব বল্। আমি, হ্যাঁ আমিও তো দিদিকে শুষে নিয়েছি তোদের মতো। আমরা সবাই, সবাই যেন কেমন স্বার্থপর হয়ে উঠছি, কেউ কাউকে ভালোবাসে না, বাসি না,—দোকানী আর খদ্দেরের মতো, তাই না মা ? কেমন যেন হয়ে যাচ্ছি সব। বাবা, কিছু বলুন, চুপ করে রইলেন যে। দাদা, কী হলো ? চুপসে গেলি যে হঠাৎ, বল্…'

আচমকা চমকে উঠল সবাই। মধ্যরাত্রির নিঝুম নৈঃশব্দ্যে দরজায় কড়া নড়ে উঠল হঠাৎ। এবং ঘরের মানুষগুলি সেই অতর্কিত শব্দের আক্রমণে ভয়ে, বিস্ময়ে আর উৎকণ্ঠায় নিজেদের মধ্যে সিঁধিয়ে স্থিরচিত্রের মতো পাথর হয়ে যায়। প্রত্যেকেই তাকিয়ে থাকে শব্দটার দিকে। একটা বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলে খুব চাপা-গলায় বলে উঠল নিতাই—'পুলিশ, নির্ঘাৎ পুলিশের লোক।'

মিনু মা-র ফ্যাকাসে ভয়ার্ত মুখের দিকে তাকাল—'হাসপাতালের লোক, দেখো। ঠিক হাসপাতালের লোক। মৃতদেহ শনাক্ত করতে যেতে হবে আমাদের।'

ওদিকে মাঝরাতের আর্জেন্ট-টেলিগ্রামের পিয়নের মতো গোটা পাড়ার মানুষকে জানান দিয়ে কড়াটা আবার বেজে উঠল। অত্যন্ত কর্কশ, জোরে। একলাফে ছিটকে বেরিয়ে গেল নিতাই। আস্তে আস্তে অত্যন্ত সন্ত্রস্ত উৎকণ্ঠায় পিছু পিছু এগিয়ে গেলেন মা, বাবা আর মিনু। দরজার ছিট্-কিনিটা বড়ো শক্ত, খুলতে গায়ের জোর লাগে। উদগ্রীব চোখে নিতাইর দাঁতখিঁচুনির ভঙ্গিটার দিকে চেয়ে থেকে, ভয়ে-ভাবনায় কুঁকড়ে-আসা হৃদপিণ্ডগুলি ডালা খুললেই যে ছোবলটা ধাক্কা মারবে তারই জন্য দম আটকে প্রতীক্ষা করে শুধু।

এবং দরজাটা দরাম করে খুলতেই একসঙ্গে চারটে মানুষ, যেন একটা অসম্ভব দৃশ্যের ধাক্কায় একবার বুক-চাপা আর্তনাদ করে উঠেই আবার হতবাক বিস্ময়ে সেই দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে থেকে ভিতরের তোলপাড় আবেগগুলিকে সংহত করতে ব্যর্থ হয়ে, শুধু যে-যার জায়গায় স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভেজানো দরজায় পিঠ দিয়ে চিন্ময়ী সকলের দিকে তাকাল—'এ কী তোরা··· তোমরা ঘুমোওনি এখনও। আমি জানতাম, তোমরা ভাববে, সারারাত জেগে থাকবে। কিন্তু কী করব, বলো, আমি—আমিও যে বিচ্ছিরিভাবে আটকে গেলাম। ও কী, তোমরা ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন? নিতাই, নিতাই কী হলো তোর—'

নিতাই দিদির দিকে তাকিয়ে মর্গের অন্ধকার দেখে, নরকের দুর্গন্ধ।

'মা, কী হলো মা, কথা বলছ না কেন, মা···আ···'

ভেজা-আঁচল দাঁতে চেপে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে থাকেন মা। চোয়াল দুটো থরথর করে কাঁপছে। যেন এতদিন বাদে খুঁজে পেলেন, বয়স নামছে

মেয়ের শরীরে।

'বাবা—' চিন্ময়ী অস্থির হয়ে উঠে।

অচঞ্চল দাঁড়িয়ে থাকেন বৃদ্ধ হৃষিকেশ—ঈশ্বরের অপার করুণা, সামনের অন্ধকার থেকে মুক্তি পেলেন যেন।

'দোহাই তোদের, তোরা কথা বল মিনু।'

মিনু স্থিরনিবদ্ধ চোখে দিদির সবুজ-পাড়-শাড়ি সবুজ-ব্লাউজ, হাতের কালো ব্যাগ দেখে।

'কী হলো! আমি কি পাগল হয়ে যাব? তোরা কথা বল্ মিনু, নিতাই, মা, দোহাই তোমাদের…' চিন্ময়ী ঠিক সকলের মাঝখানে এসে দাঁড়ায়। নির্বাক মূর্তিগুলি নিরীক্ষণ করে কেমন বিহ্বল হয়ে পড়ে…'আমি কী খুব ভুল করলাম ফিরে এসে? তোমরা ওভাবে তাকিয়ে আছো কেন মা। সন্দেহ করছ? বলো, স্পষ্ট বলো…'

চিন্ময়ী ছুটে ঘরে আসে। মেঝেতে লুটোন বিছানায় ঘুমন্ত ভাইবোনের দিকে শান্তভাবে তাকিয়ে থেকে হাতের ব্যাগটা তক্তপোশের দিকে ছুঁড়ে মারে। পিছনে সবাই এসে দরজায় দাঁড়িয়েছে। মিনু এগিয়ে গিয়ে কালো ব্যাগের কোণে ছোট ব্যালেরিনা খুঁজে পায়, ব্যাগের ভিতরে কয়েকটা ভাঁজ করা টাকা, কিছু খুচরো পয়সা, একটা রুমাল—ফুল-আঁকা, কোণে ইংরেজি অক্ষরে 'সি'। মিনু বিস্ময়ে দিদির দিকে তাকায়।

চিন্ময়ী মা-র দিকে ঘুরে দাঁড়াল—'কী হলো মা, তোমরা কৈফিয়ৎ চাইছ না? আমাকে ধমকাতে পারছ না মা? তোমাদের মেয়ে, তিরিশ উনত্রিশ বছরের একটা মেয়ে রাত ভোর করে সাড়ে তিনটেয় একা একা বাড়ি ফিরল আর তোমরা তাকে শাসন করতে পারছ না? বাবা আপনি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখছেন শুধু, আমাকে বলতে পারছেন না কিছু…' কতোগুলি নির্জীব জড় শক্তিকে নাড়া দিতে গিয়ে নিজেই ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ে চিন্ময়ী। হাঁপিয়ে ওঠে—বিশ্বাস করো মা, বিশ্বাস করো, নিজের মেয়েকে সন্দেহ করো না। সুমিতা ব্যানার্জি আমার বন্ধু মা, একই সঙ্গে কাজ করি, একই সেকশানে পাশাপাশি টেবিলে,…চিন্ময়ীর একবার মনে হলো, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে নিজেই নিজের কৈফিয়ৎ দেয়—মেয়েটা ভীষণ রোগা মা। অ্যানিমিয়ায় হলদে হয়ে গেছে, লো-প্রেসার। হঠাৎ ছুটির পর সেনস্‌লেস হয়ে পড়ে যায়। ওর স্বামী এসে নার্সিং হোমে নিয়ে যান। ওদের আর কেউ নেই

এখানে। সারারাত জেগে ওর পাশে বসে কাটাতে হলো। ওর স্বামী বিভূতিবাবু ট্যাক্শি করে নিজে পৌঁছে দিয়ে গেলেন। সামনে বোবা মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে থেকে এক সময় কী রকম অস্থির হয়ে ওঠে চিন্ময়ী। রাতদুপুরের এই অদ্ভুত আশ্চর্য ঘরটায় নিজের গলার স্বরেই কেমন চমকে উঠতে হয়। নিজেকে বোকা বোকা লাগে। আস্তে আস্তে বদলে যেতে থাকে চিন্ময়ী, কঠিন হয়ে ওঠে। মার কোটরে লুকনো কুতকুতে চোখের দিকে তাকিয়ে থাকে। ইচ্ছে করে ঝাঁপিয়ে বলে—তা হলে সত্যি কথাই বলব তোমাদের। আপিসে চাকরি করতে হলে তোমার মতো সতী থাকা যায় না মা। হ্যাঁ আমি গিয়েছিলাম, আমাদের সেকশানের পার্সোনেল অফিসার মিঃ বাসুর সঙ্গে আমি ফ্রি-স্কুল স্ট্রিটের একটা বাড়িতে এতক্ষণ কাটিয়েছি। প্রায়ই যাই, যেতে হয়। নইলে চাকরি থাকবে না, তোমরা খাবে কী? আজই একটু বাড়াবাড়ি হয়ে গেল। মিঃ বাসু নিজে গাড়ি করে মোড় অবদি পৌঁছে দিয়ে গেলেন···কিন্তু অসহ্য! মানুষ কথা না বললে স্তব্ধতা যে এত ভয়ঙ্কর হয়ে উঠতে পারে, কোনোদিন ভাবেনি। ইচ্ছে করে চারদিকে এলোপাথারি বালিশ তোষক বিছানা ট্রাঙ্ক বাক্শো জামা কাপড় ফটো ক্যালেণ্ডার যেখানে যা আছে, সব কিছু ভেঙেচুরে দুমড়ে উল্টে-পাল্টে লণ্ডভণ্ড করে দেয়। তবু মানুষগুলি একবার অন্তত হৈ-চৈ করে উঠুক। নিতাই-মিনুর দিকে মুখ ফেরাল চিন্ময়ী। ওরাও হাঁ হয়ে আছে। তোরা, তোরাও অবিশ্বাস করছিস্। অল্প বয়স তোদের, অন্তত তোরাও এটুকু ভাবতে পারিস, বেঁচে থাকার জন্যে সারাদিনের কাজের পরেও মানুষকে কতভাবে লড়তে হয়। ইউনিয়নের মেমোরেণ্ডামের উত্তর দেবার শেষদিন ছিল আজ। ওরা ডেসপারেট। কোন কথাই বলতে চায় না। মিঃ পি. বাসু ইতর লোকটা, সেক্রেটারিকে বলে বসল—ডার্টি রেড সোয়াইন। আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে ঘেরাও শুরু হয়ে গেল। ওদের প্রকাশ্যে ক্ষমা চাইতে হবে। এখনও সবাই বসে আছে, সারারাত থাকবে। কর্তারা কেউ বেরোতে পারছে না। শেষে ইউনিয়নের নেতারা আমাদের, মেয়েদের পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করলেন। সুবিনয়বাবু, পার্চেজ-সেকশানের বুড়ো ক্লার্ক, বড়ো ভালো মানুষ, আমাকে ট্যাক্সি করে মোড়ে পৌঁছে দিয়ে গেলেন···চারদিকের কতগুলি বোবা স্থিরমূর্তির ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে, ধাক্কায় ধাক্কায় নাড়াতে না পেরে, চিন্ময়ী ওর শেষ চেষ্টায় ওর সবচেয়ে

কাছের-মানুষ মিনুর দিকে এগোল, নিজের ছায়ায় এই শক্ত দেয়ালগুলি অন্তত কাঁপুক। মিনু দু-হাত বাড়িয়ে দিদিকে ভালোবাসায় জড়াল—'তুই পরেশ বসু বলে কাউকে চিনিস দিদি।'

চিন্ময়ী চমকে ওঠে—'তুই ওকে চিনলি কী করে? একটা ইতর…'

'জানি খুব নোংরা—তোকে কখনও কিছু বলেনি লোকটা?'

'আমাকে! না…'চিন্ময়ী হাসল—'মেয়েদের প্রতি মানুষটা অসাধারণ ভদ্রলোক। হলে হবে কী, একটা অভদ্র, ইতর। ইউনিয়নের মেমোরেণ্ডামে ওর বিরুদ্ধে পাঁচ-পাঁচটা অভিযোগ। কিন্তু তুই! তুই অতোসব জানলি কী করে? তোকে ওর কথা বলেছি কখনও?'

'না…' এক ঝামটায় মাথা ঝাঁকিয়ে সামনের দিকের অবাধ্য চুলগুলি পিছনে টেনে নিয়ে মিনু দিদিকে টানল—'দিদি শোন…'

একেবারে কলতলার অন্ধকারে টেনে এনে দিদিকে আরও নিবিড় করে বাঁধল মিনু। সেই আঁচিলের প্রশ্নটা আর করল না। যেন ধরেই নিয়েছে—আছে, থাকতেই হবে। দিদি নয় অথচ দিদিরই মতো হুবহু এক, যেন কার্বন-কপি আরেকটি মেয়ে ঘরে ফেরেনি, ফিরবেও না কোনদিন—অজ্ঞাত যুবতীদেহ, মর্গ, নরক, নরকের অন্ধকার…দিদির কাঁধে থুতনি রেখে, কানের কাছে মুখ এনে ফিস্‌ফিস্ ফিস্‌ফিস্ করে মিনু যেন দুঃস্বপ্নের প্রলাপ বকতে লাগল—'বিশ্বাস করবি না দিদি, একেবারে তোর মতো, তোর সঙ্গে সব মেলে, অবিকল তুই, আরেকটি মেয়ে ধুঁকে ধুঁকে মরছে রে। সে অনেক কথা, তোকে পরে বলব। একই সঙ্গে বাঁচতে চেয়ে তুই ফিরে এলি, ভাগ্যি আমাদের। কিন্তু ও আর ফিরবে না রে, ওর ঘরে সারারাত অপেক্ষা করবে সবাই। আর যখন ভোর হবে তখন ও হয়তো মর্গে যাবে, ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকারে…'

বিমূঢ় চিন্ময়ী সেই রাতের সবচেয়ে বড়ো রহস্যটাকে সবিস্ময়ে বুঝতে চেষ্টা করে। আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছাড়াতে চায়—'কী কী তুই বলছিস্ এসব…'

এবং সেই রাতে, নিজের দুর্বলতায় তখনই প্রথম কান্নায় ভেঙে পড়ল মিনু। পঞ্চবটীর গণ্ডি ডিঙিয়ে একদিন ওকেও পা ফেলতে হবে।

প্রথম প্রকাশ

অক্টোবর 1969

অধিরথ সূতপুত্র

মিঃ আবদুল আহাদ, বি. এ.
হাটখোলা রোড,
টিকাটুলি
ঢাকা—৫,
পূর্ব পাকিস্তান।

কলকাতা শহরের এসপ্লানেড অঞ্চলের কার্জন পার্কে ভরাট দ্বিপ্রহরে কোন এক গাছের ছায়ায় বসে সে এই শব্দগুলি পরিষ্কার হরফে লিখল একটি খামের উপর। একসঙ্গে অনেক কথা এবং অনেক দৃশ্য ভেসে উঠল চোখে—বুড়িগঙ্গার জল, সদরঘাটের কামান, জগন্নাথ কলেজ, জামালের চায়ের দোকান, নাজ্‌মা, নাজ্‌মার মা···কিন্তু কোন ভাবাবেগ নয়, সে তার পকেট থেকে ভাঁজ-করা চিঠিটা বের করল। গভীর মমতায় এতক্ষণ সে এটা লিখেছে। আরও একবার পড়ে দেখা প্রয়োজন বোধ করল, উত্তেজনায় এমন কিছু লিখল কিনা যাতে ওরা ভুল বোঝে, অথবা আঘাত পায় অথবা অন্য কোন ক্ষতি হয়। ···সত্য বলিতেছি আমার সমস্ত বিশ্বাস ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। আমি যেই স্থানে বসিয়া এই চিঠি লিখিতেছি তাহার ঠিক পিছনেই রাজভবন, তাহার পাশে ময়দান, যাহাকে গড়ের-মাঠ বলে। দূরে ফোর্ট উইলিয়ামের চূড়া দেখা যাইতেছে। তুই কল্পনাও করিতে পারিবি না, কলিকাতা কি বিরাট শহর আর এই গড়ের-মাঠের দৃশ্য কি মনোরম। আমি অবাক হইয়া ভাবি, ময়দানে এত কচি সবুজ ঘাস এত ফুল এত গাছ এত বাতাস থাকিতে কলিকাতা শহর এমন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিল কেন? দূরে অক্টোরলোনি মনুমেণ্ট দেখিতেছি, সামনেই এস্‌প্লানেড, ট্রামগুলি ছেলেদের স্প্রিং-দেওয়া রেলগাড়ির মতো ঘুরিতেছে, কাতারে কাতারে মানুষ ছুটিতেছে এবং তাহার অপর প্রান্তে বড়ো বড়ো আকাশ-উঁচু বাড়িগুলি যেন আমার অনধিকার প্রবেশ সহ্য করিতে না পারিয়া আমাকে গ্রাস করিবার জন্য উদ্যত হইয়া রহিয়াছে। অথচ এই

কলিকাতার সহিতই আমার লড়াই। আমি ভারতবর্ষের নাগরিক হইয়াছি। এইখানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বি-এ' ডিগ্রি ছাড়া আরও একটি নূতন সার্টিফিকেট জুটিয়াছে—'রিফিউজি'। ডিগ্রিতে যোগ্যতা প্রমাণিত না হইলেও, নূতন সার্টিফিকেটে বেশ করুণা ভিক্ষা করা যায়। তবু কোন ফল হইতেছে না। আজও কোন চাকরি পাই নাই। আমার কোন পরিচিত রথী-মহারথী নাই। কলোনির নোংরা আবহাওয়ায় সকলেই ধীরে ধীরে মরিয়া যাইতেছে। ছোটভাই মণ্টু সকালে রেলগাড়িতে দাঁতের-মাজন ফেরি করে, একদিন ট্রেন চাপা পড়িবে। বোন দুইটির লেখাপড়া হইল না। বিবাহের কথা কল্পনা করাও কঠিন, উহারা নষ্ট হইয়া যাইবে। সব দেখিয়া মায়ের অবস্থা যা দাঁড়াইয়াছে, মনে হয় তিনিও আর বেশিদিন বাঁচিবেন না। ইচ্ছা করে, আবার তোদের মধ্যে ফিরিয়া যাই। স্বগৃহে প্রত্যাবর্তনে এখন আবার পাসপোর্ট ভিসা প্রভৃতি লাগিবে, যাহা সংগ্রহ করা আমার পক্ষে প্রায় অসম্ভব। কতিপয় দুর্বৃত্ত আমার দাদাকে সুত্রাপুরের পুলের তলায় হত্যা করিয়াছে বলিয়া সেইদিন বিপন্ন বোধ করিয়াছিলাম এবং মায়ের তাড়নায় কুমারী বোন দুইটির কথা ভাবিয়া পলাইয়া আসিয়াছি। আসিবার সময় নাজ্‌মাকে আকুল হইয়া কাঁদিতে দেখিয়াছি। তাহাকে বলিস একজন হিন্দু যুবককে ভালবাসিয়া সে ভুল করিয়াছে। তাহাকে দিবার মতো কোন কিছু, এমন কি চিঠি লিখিবার মতো ভাষা বা শক্তিও আমার নাই। জানি, আবার ফিরিয়া গেলে নাজমার প্রেম পাইব কিন্তু মাতৃভূমির ভালবাসা পাইব না। এতবড় দুঃখকে বুকে চাপিয়া আমি এখন আমার বর্তমান স্বদেশ ভারতবর্ষের মাটিতে ধর্মযুদ্ধে নামিয়াছি। আমার দাদা মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার আততায়ীর চোখে চোখ রাখিতে পারিয়াছিলেন কিন্তু এইস্থানে আমি আমার শত্রুকে দেখিতে পাইতেছি না। অথচ তাহারা আমাকে মারিতেছে। বিরাট যুদ্ধক্ষেত্রে আমি এক অনাহূত অজ্ঞাতকুলশীল। সাহস, বিশ্বাস এবং মনের জোরে একাই লড়াই করিয়া চলিয়াছি। মনে হয়, কোন এক অদৃশ্য দেবতা আমার শত্রুকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছেন। অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ চলিতেছে, জানি না ফল হইবে কিনা…

এসপ্লানেডের বড়ো দেয়াল ঘড়িটায় চোখ পড়তেই সে হকচকিয়ে উঠে পড়ল। আড়াইটা বাজে, এখনই গিয়ে দাঁড়াতে হবে সেই বিরাট

বাড়িটার সামনে। চিঠিটা সে তখনই পোস্ট করল না, ভাঁজ করে পকেটে রাখল। ট্রামবাসমোটরের ভিড় এবং জনাকীর্ণ পথ অতিক্রম করে এগোতে এগোতে আজকের পুরো ঘটনাকেই কেমন যেন কৌতুক বলে বোধ হলো তার। অন্যান্য অনেক ঘটনারই পুনরাবৃত্তি। এ চাকরিও হবে না। তবু বৃন্দাবনখুড়োর মর্যাদারক্ষা। একজনকে একটা কেরানির চাকরি জুটিয়ে দিলে তার সব কলঙ্ক ঘুচবে—এই তার আশা। কলোনির 'সি' ব্লকের বৃন্দাবন ভট্টাচার্য। বিভিন্ন পুজো-পার্বনে ছুটির দিনে বাড়ি-বাড়ি পুরোহিতের কাজ করেন, প্রতিদিন সন্ধ্যায় অফিস-ফেরত খালি পায়ে খালি গায়ে ধুতির কোঁচা গলায় জড়িয়ে পিতলের সাজিতে গঙ্গাজলের ঘট বসিয়ে দোকানে দোকানে কল্যাণ-মন্ত্র উচ্চারণ করে বেড়ান। সবাই জানে, কলকাতার কোন এক অফিসের কেরানি বৃন্দাবন খুড়ো। কিন্তু সেদিন তাঁকে বিচিত্র বেশে আবিষ্কার করা গেল।

খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দেখে চাকরির সন্ধানে সে এসেছিল এখানে। তিনতলায় লিফ্‌টে ঢুকবার মুখেই বৃন্দাবনখুড়োর সঙ্গে একেবারে মুখোমুখি ধাক্কা।

'কি ব্যাপার, আপনি?

বৃন্দাবন খুড়ো কাঁপছেন লজ্জায় আর বিহ্বলতায়। পরনে খাকি ফুল-প্যান্ট, গায়ে মোটা সাদা চাপকান, বুকে লাল-সুতোয় নকশা কেটে কোম্পানির আদ্যক্ষর—'পি-এল-সি'।

অস্বস্তি কাটাতে সে নিজেই হেসে সহজ হয়েছিল—'তাতে কি খুড়ো, তবু তো চাকরি করছেন আপনি, নিজের রোজগার।'

তারপরই জেনেছিল, এই ক্রীতদাসের বেশ থাকে নিচে দরোয়ানের কাছে। ধুতি-সার্টে কলোনি থেকে আসেন, পোশাক বদলে অফিসে ফরমাশ খাটেন, বিকেলে আবার বাবু সেজে ঘরে ফেরেন। সবাই জানে, এমন কি নিজের ছেলেমেয়ের কাছেও তার সম্ভ্রান্ত পরিচয়, ভদ্র কেরানি।

সংসারে গুনে দেশালাই-এর কাঠি খরচ করো আমি জানি। তবু তোমার এত লজ্জা খুড়ো, পোশাকের জন্য এত সংকোচ? পথে হাঁটতে হাঁটতে হাসি পেল তার। কিন্তু এই বৃন্দাবন ভট্টাচার্য একটা মহৎ উপকারে লেগে গেলেন আজ। কলোনিতে সকালে-রাতে যখন তখন এসে দেখা করেছেন ঘরে এসে। আশ্বাসও দিয়েছেন—চাকরি একটা জুটিয়ে দেবেনই। চেষ্টা করেছেন। মরীয়া

হয়ে খেটেছেন। অফিসের কোন এক সদাশয় কেরানিবাবুকে ধরেছেন, কেরানিবাবু অনুরোধ করেছেন হেড-ক্লার্ককে, হেড-ক্লার্ক বড়োবাবুকে, বড়োবাবু খুশি হলেই বড়োসাহেব মঞ্জুর করবেন।

বৃন্দাবনখুড়োর নির্দেশেই হেড-ক্লার্ক ভদ্রলোককে প্রণাম করতে হলো। তিনি খুশি হয়ে কিঞ্চিত কুশল প্রশ্ন, দেশের খবর, কিছুটা জ্ঞান এবং উপদেশ দানের পর শর্ত রাখলেন—বৌবাজারেই তার বাড়ি। আপিস থেকে ফেরার সময় ওপথেই তো যেতে হবে শ্যালদা ইস্টিশন। সুতরাং বিকেলের দিকে তাঁর ছেলেমেয়েগুলোকে ঘন্টাদুয়েক দেখিয়ে শুনিয়ে গেলে তিনি চেষ্টার ক্রুটি করবেন না। অবিশ্যি চাকরি তো এখন হবেই ভবিষ্যতে প্রমোশন বা অন্যান্য সুখসুবিধার কথাটাও তিনিই ভাববেন।

বড়োবাবু তখন ডিকটেশন দিচ্ছিলেন স্টেনোকে। সুতরাং আরও ঘন্টাখানেক অপেক্ষা করতে হলো। ডাক পড়ল সাড়ে তিনটে নাগাদ।

'কি নাম।'

প্রায় ফুটবল-মাঠের মতো লম্বা একটা কাঁচঢাকা টেবিলের ওপারে নিখুঁত সাহেবি পোশাকে বসে ছিলেন বড়োবাবু। দামি সিগারেট থেকে একগাল পরিতৃপ্তির ধোঁয়া ওড়ালেন সামনের দিকে। দূর থেকে বড়োবাবুর মুখটা অনেকটা যেন মেঘের আড়ালে দেবরাজ ইন্দ্রের মতো।

'সনাতন ঘোষ।'

'দেশ কোথায়।'

'ঢাকা।'

'ঢাকা! ঢাকা কোথায়?'

'গেণ্ডারিয়া। গ্রামেও আছে, শাক্তা। বুড়িগঙ্গার ওপারে।'

'হুঁ, তুমি তো আমার দেশের লোক হে। আমাদেরও বাড়ি ঢাকা। উয়ারি চেনো?'

'হ্যাঁ, সেখানে আমার অনেক বন্ধু আছে।'

'উমাপতিবাবু তোমার কে হন?'

উমাপতিবাবু! সনাতন কিঞ্চিত বিচলিত।

'আজ্ঞে না, না...' পার্শ্ববর্তী হেড-ক্লার্ক ব্যস্ত হয়ে তাড়াতাড়ি নিজের দিকে টেনে নিলেন প্রসঙ্গটা—'না, ও আমার কেউ হয় না স্যার। আমাদের বেন্দাবনের সঙ্গে এক কলোনিতে থাকে। গরিব মানুষ, এত করে ধরেছে তাই...'

'কে বৃন্দাবন?'

'বেন্দাবন ভট্চায। আমাদের আর্দালি...'

'হোআট্...' হঠাৎ একটা বুনো শুয়োরের মতো গর্জে উঠলেন বড়োবাবু। ঝুঁকে পড়লেন টেবিলের উপর—'একটা পেটি আর্দালির রিকমেণ্ডেশনে একজন রেস্‌পনসিব্‌ল ক্লার্কের চাকরি হয় নাকি এখানে! কি ভেবেছেন আপনারা?'

তখন বৃন্দাবনখুড়োর চেয়ে আরও করুণভাবে কাঁপছেন হেড-ক্লার্ক—'আজ্ঞে না, ও ঠিক তা নয় স্যার। লেখাপড়া জানে, গ্র্যাজুয়েট...'

'ড্যাম্ ইয়োর গ্র্যাজুয়েটস্। কত এম-এ, এম-এস্-সি ফিরে যাচ্ছে এখান থেকে। খবর জানেন?'

খুব কাছেই ছিল দরজাটা। সনাতন পিছন ফিরল।

'ইউ, ইউ কাম হিয়ার...'

সনাতন তখন বাইরে। আঁতুড়ঘরের দরজায় ভীত উৎকণ্ঠ নির্বোধ স্বামীর মতো জবুথবু দাঁড়িয়ে ছিলেন বৃন্দাবন ভট্টাচার্য। বড়োবাবুর গর্জনটা বোধ হয় শিশুর প্রথম কান্না বলেই ভুল হলো তার, তড়িদস্ত হয়ে ছুটে এলেন—'কি রে, হলো?'

সনাতন হেসে ফেলল।

ওর মুখে হাসি দেখে বৃন্দাবনও চোয়ালভাঙ্গা মুখে পায়োরিয়ার দাঁত খুলে হাসলেন—'খবর ভালো তো।'

'ভালো মানে! সে এক মজার ব্যাপার, ভীষণ মজা। পরে কলোনিতে গিয়ে বেশ রসিয়ে রসিয়ে বলব।'

এরপর কোন্ দিকে না তাকিয়ে বিরাট হলঘরের আলো, মানুষ, কর্মকোলাহলকে দু হাতে সরিয়ে তীব্রবেগে বেরিয়ে এলো সনাতন। বৃন্দাবন ভট্টাচার্য অত মূর্খ নন, তিনি অনুমান করলেন। আরও দ্রুত গতিতে পিছু পিছু ছুটে এলেন। লিফটের জন্য অপেক্ষা না করে সিঁড়ি ভেঙেই নামছিল সনাতন, উপর থেকে ডাকলেন—'সনাতন, শোন শোন সনা...'

প্রায় একতলায় নেমে এসেছে সনাতন। মাথা উঁচিয়ে সাড়া দিলো—'তোমার ভয় নেই খুড়ো, ঘাবড়ো না। তুমি এত্ত বড় বিলাতি ফার্মের কেরানিবাবু। কেরানি...বা...বু...'

বাইরে তখন ঝাঁঝালো রোদ। গড়ানো পাথরের মতো চারতলা থেকে নেমে সনাতন ক্লাইভ-স্ট্রিটের তাতানো ফুটপাতে এসে দাঁড়াল। সামনেই রাস্তার ফেরিওয়ালা থেকে ডাব কিনে পান করছিলেন একজন বিদেশী মহিলা। সতৃষ্ণ তাকিয়ে থেকে সনাতন তার স্নিগ্ধতা, পরিতৃপ্তি নিজের মধ্যে অনুভব করে হাঁপাতে লাগল। তাকাল পিছনের বিশাল কপাটটার দিকে, কপাটের শীর্ষে সাততলা পাথুরে দৈত্য। তাকাল সামনের দিকে। চোখ ঝলসানো রোদে ঝলমল করছে আলোকিত কলকাতার প্রাসাদ অট্টালিকা। পৃথিবীর আহ্নিক আর বার্ষিক গতিকে সচল রাখার জন্য কি বিপুল কর্মকাণ্ড চলছে এর ভিতরে ভিতরে, বাইরে মানুষগুলি ছুটছে—বাসে মোটরে পদব্রজে। যেন এইমাত্র খবর এসেছে—মানবসভ্যতা ধুঁকতে ধুঁকতে শেষ স্তরে এসে পৌঁছেছে। সবাই ব্যস্ত, সবাই হন্যি হয়ে ছুটছে, দেখা যাক...এই শেষ চেষ্টা...তাকে বাঁচানো যায় কিনা...

চারদিকের প্রচণ্ড গতির মধ্যে সনাতন স্থবির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। হঠাৎ যেন নিজেকে এই বিপুল কর্মচাঞ্চল্যের মধ্যে ভীষণ একা, ভীষণ নিঃসঙ্গ, নেহাতই অপ্রয়োজনীয় বলে বোধ হলো তার। বরং শিক্ষাদীক্ষাবুদ্ধিচেতনা, মানবজন্ম—সবই দুঃসহ ভার। কি করবে সে এই বোঝা নিয়ে? কলকাতা তাকে কিছু দেবে না, কলোনিটা নরক, পৃথিবীতে পালাবার পথ নেই। নাজ্‌মাকে মনে পড়ল। নাজ্‌মার স্মিতমুখ, নরম চোখ, লাল শাড়িতে নাজ্‌মা আগুনের মতো জ্বলত।

সনাতন হাঁটতে শুরু করল। সরকারি লালকুঠির কাছে এসে লালদীঘির জল দেখতে পেল—সবুজ গাছ, ওপারে টেলিফোন-ভবন, এদিকে জি-পি-ও'র ঘড়ির কাঁটায় সময়, চলতি বাসের জানলায় মেয়েদের মুখ। খিদে পেয়েছে তার। আজকাল খিদে পেলেই কেমন যেন পেটে একটা অসহ্য যন্ত্রণা হয়, ক্লান্তি আসে। তবু সে এগোতে লাগল। টলতে টলতে পা ফেলতে লাগল সামনের দিকে। এখানে ফুটপাতে বসবার স্থান নেই, লালদীঘিতে গাছ আছে, ঘাসের অভাব। যেতে হবে সেই ময়দান। সেখানে খোলা আকাশ, খোলা বাতাস। প্রাণ ভরে ঘুমোতে চেষ্টা করবে। নইলে সন্ধ্যায় আবার তো সেই কলোনির আলোবাতাসহীন গুমোট পরিবেশ, কতগুলি মরামানুষের মুখ, অর্ধাহার, অনিদ্রা, আত্মগ্লানি, বিবেকের চুলকুনি।

অনেক কষ্টে সনাতন নিজেকে টেনে নিয়ে এলো লালদীঘির আরেক

প্রান্তে। ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট আর মিশন রো-র সঙ্গমে। যেখান থেকে কলকাতাকে সবচেয়ে রূপসী, উর্বশী মনে হয় তার। থরে থরে কুবেরের সিন্দুক সাজানো দুপাশে, বিদেশীর চোখে তুলে ধরার মতো দৃশ্য। সেখানে দাঁড়িয়ে সনাতন আরও একবার তার যুদ্ধক্ষেত্রকে দেখল, শত্রুপক্ষের সৈন্য-সমাবেশ, তাদের শক্তি। প্রতিটি ইমারত অট্টালিকাই যেন লৌহবর্ম, শিরস্ত্রাণে আচ্ছাদিত সতর্ক সেনানী। তাদের সমবেত রক্তচক্ষুর সামনে তার একক প্রতিরোধ হাস্যকর, অর্থহীন। খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে এতকাল সে যত আবেদন ছেড়েছে, স্কুলের শিক্ষকতা ছাড়া পোষ্ট-বক্সের অধিকাংশই তো এ অঞ্চলের প্রাসাদসমুদ্রে। আরও একবার এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জে ঘুরে আসা যায়। কিন্তু লাভ! ' সনাতন স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে তার প্রতিপক্ষের শক্তিক্ষমতার একটা হিসেব যাচাই করতে চাইল। এবং বারবারই নিজেকে কেমন নিঃসঙ্গ একক সৈনিক বলে বোধ হলো তার, সীমাহীন বিরুদ্ধতার বিপরীতে অসহায়।

চারদিকের প্রচণ্ড হট্টগোলের মধ্যে সমস্ত শরীরটা টলছে, স্নায়ুতে অসহ্য যন্ত্রণা। একটা বড়োবাড়ির পাথুরে দেয়ালে হেলান দিয়ে সনাতন ঝিম্ মেরে দাঁড়িয়ে রইল। বাঁচার জন্য নিশ্বাস চাই। কিছুটা খাদ্য। তেষ্টার জন্য বিনিপয়সার জল।

নাজমা, তুমি ভুল করিয়াছ, সূর্য যেখানে অফুরন্ত আলো দান করিয়া মানুষকে জীবনীশক্তি বিতরণ করিতেছেন, সেই আলোকিত জগতে তুমি যাহাকে ভালোবাসিয়াছ, তোমার সেই নায়ক কুলপরিচয়হীন জারজ সন্তানের মতো ঘুরিয়া মরিতেছে··· সনাতন মনে মনে একটি সম্ভাব্য প্রেমপত্রের খসড়া তৈরি করে আরাম পেল—আমার পিতৃপুরুষগণ যে স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করিয়াছেন, সেই স্বাধীনতার পুণ্যভূমিতে আসিয়া ধন্য হইয়াছি। কিন্তু ভাবিতে পারি নাই, আজন্মকাল পরম বিশ্বাসে যাহাকে মাতা বলিয়া জানিয়াছি তিনিই আমার বিমাতা। অথচ নিজমাতার গৃহে আসিয়া দেখিলাম, আমার জন্য কোন আশ্রয় নির্ধারিত হয় নাই। অনাদর, অবহেলা, ঘৃণা এবং অনুকম্পা। প্রেম নাই, ভালোবাসা নাই, মনুষ্যত্ব নাই। কিন্তু মনুষ্যজন্ম যখন পাইয়াছি, তাহাকে ব্যর্থ হইতে দিতে চাই না। আত্মবিশ্বাসে নির্ভর করিব, এমন ভরসাও পাইতেছি না। একমাত্র তুমি এবং তোমার প্রেম ভিন্ন জীবনের প্রতি আমার আর কোন আকর্ষণ নাই। তুমি কি

আসিবে? সীমান্ত অতিক্রম করিয়া এই পারে? একজন মুসলমান রমণী পাকিস্তান হইতে উদ্বাস্তু হইয়া এই দেশে আসিয়াছে—ইহাতে পৃথিবীর মানুষের কাছে কিছু প্রমাণিত হইবে কিনা জানি না, তবে হলপ করিয়া বলিতে পারি স্থানীয় সংবাদপত্রগুলিতে প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলামব্যাপী তোমার তসবির ছাপা হইবে। তৎসহ দীর্ঘ কাহিনী। তুমি বিখ্যাত হইবে এবং আমিও বাঁচিব। জানিব জীবনটা মিথ্যা হইয়া যায় নাই।

কিন্তু পরমুহূর্তেই সনাতন তার স্বাভাবিকতায় ফিরে এলো। আমি কি পাগল হয়ে গেছি! নাজ্‌মা আসবে? কোন দুঃখে! এবং কেন? সে হাঁটতে শুরু করল। এখনও তাকে অনেকটা সময় কাটাতে হবে এই শহরে। তারপর সন্ধ্যাবেলা সে যাবে। ম্যাঙ্গো লেনের সেই ঝকঝকে বাড়িটার পাঁচতলায়।

কিন্তু মেঘ জমছে দক্ষিণের আকাশে। ময়দান কালো হয়ে উঠছে। একটা চাপা উত্তেজনার আভাসও যেন সে প্রত্যক্ষ করল দুপাশের পথচারী জনতার ব্যস্ততায়। ট্রামবাসট্যাক্সিমোটরগুলি দলা পাকিয়ে যাচ্ছে রাজভবনের মোড়ে। কেউ কেউ ভিড় এড়াতে গাড়ি ঘোরাতে ব্যস্ত। রাস্তা কি বন্ধ? কৌতূহলী মানুষের সঙ্গে সে-ও এগোতে চাইল। একঝাঁক পুলিশ কুচকাওয়াজ করে তালে তালে ভারি বুটের পা ফেলে এগিয়ে গেল। আরও পিছনে আরও এক ঝাঁক। সস্তা উপন্যাসের বিচক্ষণ পাঠকের মতো সে যেন এক পলকেই বুঝে ফেলল—পরবর্তী ঘটনাগুলি কি এবং কি হতে পারে? বিক্ষুব্ধ জনতা এসেছে রাজভবনের সিংহদ্বারে, রাজরক্ষী পথ দেবে না। স্লোগান, ধিক্কার, প্রতিবাদ, উত্তোলিত ঝাণ্ডা আর সহস্র মুষ্টি—কাঁদুনে গ্যাস, লাঠি-চার্জ, গ্রেপ্তার. প্রয়োজনবোধে গুলিচালনা।

কালো সিন্ধুকের মতো প্রকাণ্ড তিনটি গাড়ি। ওরা খাঁচায় পুরে নিয়ে যাবে। খুব কাছাকাছি এসে সনাতন থমকে দাঁড়াল। এরপর পা বাড়ানোর বিপদ অনেক। নির্বিচার ধর-পাকড়। দূর থেকে সে শুধু বিক্ষোভকারী জনতার একটা অংশকে দেখতে পেল এবং একটা প্রচণ্ড শব্দতরঙ্গ, একটানা চিৎকার। শহর উত্তাল। স্লোগানগুলি বোঝা যাচ্ছে না ঠিক, পোস্টারগুলির ভাষা থেকে জানা যায়—উদ্বাস্তু জনতা। খাদ্য পুনর্বাসনের দাবি।

ঢাকার সে রক্তাক্ত দিনগুলির কথা মনে পড়ল তার। সমস্ত দেশ জুড়ে

অশান্ত ঝঞ্ঝা, প্রচণ্ড উত্তেজনা, শ্বাসরোধী সন্ত্রাসের রাজত্বে রাতের অন্ধকারে দুঃসাহসে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার-আঁটা, দিনের আলোয় বুলেটের মুখে মিছিল, শোভাযাত্রা। ভাষা-আন্দোলনের নির্ভীক কর্মী এবার চোখ ফেরাল জনতা থেকে সরকারী বাস্তবতার দিকে। সামরিক কায়দায় সারি বেঁধে বেরিকেড তৈরি করেছে পুলিশ। অনেকটা যেন ডালহৌসি-চৌরঙ্গির গর্বিত অহঙ্কারী উঁচু উঁচু বাড়িগুলির মতো। তেমনি ভয়ঙ্কর, তেমনি স্পর্ধিত।

একটা অতর্কিত চাঞ্চল্যে উন্মত্ত হয়ে উঠল সমস্ত অঞ্চল। বিপুল একটা সাড়া পড়ল চারদিকে। উত্তেজনা হৈ-চৈ চিৎকার। কিছু মানুষ ছুটে পালাচ্ছে ইতস্তত, তিনটে প্রিস্নার-ভ্যান দ্রুত ছুটে গেল সামনের দিকে। আরও দু'টো ওয়ারলেস ভ্যান এসে সজোরে ব্রেক কষে থমকে দাঁড়াল।

'পালান, পালান, ওরা অ্যারেস্ট শুরু করেছে...'

'লাঠি-চার্জ করবে মনে হচ্ছে...'

টিয়ার-গ্যাসের সেল্ দেখেছেন হাতে...'

'শালারা..'

'আমাদের দাবি মানতে হবে। খাদ্য চাই বস্ত্র চাই আশ্রয় চাই চাই চাই চাই...'

একদা-ভাষা-আন্দোলনের-কর্মী এবার একটু পিছিয়ে এলো। উত্তেজনা শেষমাত্রায় উঠছে। তিনটে পুলিশ কি নির্মমভাবে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাচ্ছে মানুষটাকে। অমানুষিক। ওরা কি লাঠি চালাতে শুরু করেছে? এত আকাশ কাঁপানো উন্মত্ততা কেন! এত চিৎকার! বিস্ফোরণ? কাঁদুনে গ্যাস্? সনাতন এবার দৌড়োতে শুরু করল পিছনের দিকে। সেদিন জীবনের একটা মূল্য ছিল, বুলেটের মুখে মরতে চেয়েছিলাম, মরবার সময় ছিল আমার। আজ কীট আর পতঙ্গের মতো দীন, আজ বাঁচতে চাই।

নিরাপদ দূরত্বে থেকে মানুষগুলি ভিড় করে আছে ম্যাঙ্গো লেনের মুখে; রাজভবনের দিকে তাকিয়ে আছে সবাই। যেন বাড়িতে আগুন ছুঁয়ে দূরে দাঁড়িয়ে তামাশা দেখার মজা—কি হয়, কি হয়। সনাতন হাঁপাতে হাঁপাতে সেই ভিড়ে এসে মিশল।

'দেখেছেন মশাই, অ্যাদ্দুরেও চোখ জ্বলছে। টিয়ার গ্যাস।'

'আর মশাই টিয়ার গ্যাস। লাঠি মেরে পেঁদিয়ে লাট করে দিলো শালারা...

'ধন্যি বটে মানুষগুলোর জান।'

'আমরা তো দূরে দাঁড়িয়ে মজা দেখছি।'

'যা বলেছেন দাদা, আন্দোলন-ফান্দোলন করা ভালো, যদি পরের ছেলে করে।'

'কি বললেন!'

'না, কিছু না...'

ভিড়ের মধ্যেই কয়েকটি টুকরো টুকরো বিচ্ছিন্ন সংলাপ। সেখান থেকেও সরে এসে একেবারে পিছনে ম্যাঙ্গো লেনের ভিতর ঢুকল সনাতন। মানুষের জটলা সেখানে হালকা। বুক টেনে নিঃশ্বাস নেওয়া যায়। পেটের ব্যথাটা হঠাৎ-ই যেন কোথায় উধাও হয়ে গেছে, খিদের অনুভূতিটাও ভোঁতা। সে শুধু নিরাপদ দূরত্বে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগল। তার সামনে কলকাতা সত্যি একটা যুদ্ধক্ষেত্র এখন, উন্মত্ত। ক্রোধ আর বিক্ষুব্ধ আক্রোশের আঘাত, প্রতিআঘাত। এবং এই যুদ্ধে সে এক স্বার্থপর পলাতক। লজ্জিত হলো না, অপমানবোধেও পীড়িত নয়। শুধু ভাবতে পারল, আরও বড়ো লড়াই তার। মরামানুষের লড়াইটা মৃত্যুর সঙ্গে নয়, বাঁচার সঙ্গে।

'কটা বাজে বলতে পারেন?' সনাতন পার্শ্ববর্তী এক ভদ্রলোকের হাত-ঘড়ির দিকে নির্দেশ করল।

ভদ্রলোক বোধ হয় ভালো করে তাকালেনও না ঘড়ির দিকে—'পোনে সাতটা।'

পোনে সাত! সে কি! সাড়ে ছটা বেজে গেছে! সনাতন সন্দেহ ঘোচাতে আবার ভদ্রলোকের দিকে তাকাল। কিন্তু হৈ-হট্টগোলে তিনি তখন নেই। আরও একজনকে জিজ্ঞেস করে জানল—ছটা চল্লিশ। সময় হয়ে গেছে। একবার পিছন ফিরে তাকাল শেষবারের মতো। নিশ্চয়ই বড়ো রকমের একটা কিছু ঘটছে ওদিকে।

পিছনে পড়ে রইল মানুষ আর মানুষের জনতা, জনতার সংগ্রাম। যুদ্ধ-ক্ষেত্রের দিকে একবার অনাসক্ত দৃষ্টি রেখে, বিনা দ্বিধায়, নিঃসঙ্কোচে তাকাল সামনের দিকে। যে পথে সে পালাচ্ছে সে পথেও এই নির্মম কলকাতা।

সনাতন সেই পাঁচতলা হলুদ বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়াল। দরজায় আর্দালি-চাপরাশি-দারোয়ানদের একটা জটলা। সবাই সোৎসুক তাকিয়ে আছে সামনের দিকে। লিফ্‌ট বন্ধ। সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠল। ফুটপাত

থেকে তিনতলার ঊর্ধ্বে। ময়মনসিংহের শশধর মিত্তির উদ্বাস্তু হয়েই এসেছিলেন। 'এচ-বি-লোন', 'এল-পি-লোন' নিয়ে কলোনিতেই একটা দোচালা তুলেছিলেন, ক্যাশ ডোলেই এককালে সংসার চলত তার। কিন্তু চালাক মানুষ, বিষয় বুদ্ধিতে নিপুণ। কলকাতা এলেন, দুনিয়ার হালচাল দুদিনেই সমঝে নিলেন। কলকাতা বোকা থাকতে দেয় না কাউকেই। কোমর বেঁধে লেগে গেলেন কাজে। জায়গাজমি থেকে শুরু করে, লোহালক্কর পাট হয়ে ঘটকালি পর্যন্ত অসংখ্য দালালি। জমি কিনে বাড়ি করেছেন দমদমে, মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন সানাই বাজিয়ে। মাঝে মাঝে ট্যাক্সিও চড়েন, সনাতন দেখেছে। সেই শশধর মিত্তিরই কলোনিতে গিয়ে খবর দিয়েছেন—চাকরি তিনি দেবেন। তবে যে-কোন শর্তে রাজি হলেই এ চাকরি। নইলে যেয়ো না।

সনাতন এলো। প্রকাণ্ড দরজা আগলে বসে ছিল নেপালি দরোয়ান। বাধা দিলো—'কাঁহা যাইয়েগা আপ্‌। আপিস বন্ধ্‌ হো গিয়া।'

'কিন্তু আমার যে আসার কথা ছিল।'

'কিসকো মাঙ্গতে।'

'শশধরবাবু, শশধর মিত্র।'

দরোয়ান চলে গেল। কিন্তু একটু পরে ছুটে এলেন শশধর মিত্র স্বয়ং—'এসেছ! বাঁচা গেল। ভাবছিলাম...'

সনাতন হাসল—'একটা চাকরি আমার দরকার কাকাবাবু।'

'আরে, সে তো বটেই, বয়স তো হয়েছে। তা কি করবি বাবা, পাকিস্তান যদি না হতো তবে কি আমরা...'

মস্তো বড়ো অফিস, বিশাল তার পরিসর। মাথার উপরে পাখাগুলি সারাদিনের ক্লান্তিশেষে জিরোচ্ছে, হলঘরটাকে অন্ধকার থেকে বাঁচানোর জন্যই ইতস্তত কতিপয় টিউব বাতি জ্বলছে তখনও। সনাতন অনাসক্তের মতো এগোতে লাগল। সামনের রেলিংটা পেরিয়ে. একটা টেবিল ডানদিকে রেখে অন্যটা বাঁয়ে সরিয়ে এঁকেবেঁকে এগোতে এগোতে শশধর মিত্র আবার সেই সুইংডোরের পাশে এসে দাঁড়ালেন। দরজাটা একটু ঠেলে বললেন—'আয় বাবা, আয়...'

এ-জাতীয় পরিবেশ এবং বড়োবাবু, তার মুখস্থ এখন।

পরে পরিচয় হলো। সাদর আমন্ত্রণ পেল সনাতন। রীতিমতো

বিস্ময়কর এবং অপ্রত্যাশিত। ঘরে আরও পাঁচজন ছিল—প্রৌঢ়, প্রায়-প্রৌঢ় এবং যুবক। এদেরও কেউ কেউ নিশ্চয়ই চাকুরিপ্রার্থী এবং একই উদ্দেশ্যে এই নিভৃত ইন্টারভিউ। বাবুর্চি এলো ট্রে-হাতে। চা-প্যাটিসের প্লেট সাজানো হলো সকলের বুক ছুঁয়ে। আশ্চর্য রকমের সাদা ঝক্‌ঝকে কাপ আর প্লেটগুলি। দেহের যাবতীয় ক্লান্তি আর ক্ষুধার অনুভূতি যেন এক মুহূর্তে সনাতনের সমস্ত অস্তিত্বকে বিপুলভাবে নাড়া দিয়ে তুলল। সে মাথা তুলে তাকাল। য়ুরোপ-আমেরিকা থেকে নানাধরনের ইঞ্জিনিয়ারিং পার্টসের আমদানি করে এমন একটি ভারতবিখ্যাত ফার্মের স্বত্বাধিকারী গুজরাটি বণিক তার সামনে। ভয়ঙ্কর আর জান্তব মেদল শরীরে প্রসন্ন হাসি। মাথার উপরে গান্ধীজি, জওহরলাল। সনাতন দ্রুত চারদিকের আসবাবপত্র, মানুষ, দরজাজানালা, সেফের মাথায় সিদ্ধিদাতা গণেশমূর্তি থেকে নিজের সামনে চায়ের ধূসর বর্ণ পর্যন্ত সর্বত্রই চোখ বুলিয়ে নিলো। কুরুক্ষেত্র কলকাতার নিভৃতে এক আলাদা জগৎ এবং দুর্যোধনের গোপন শিবির। বিপুল শক্তির অধীশ্বর এক মহারথীর মুখোমুখি বসে সে যেন একটা গভীর চক্রান্তের আঘ্রাণ পেল। একটা গভীর রহস্যের পাকে পাকে সে জড়িয়ে পড়ছে, বুদ্ধিবিবেকবিচারশক্তিগুলি তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। আত্মরক্ষার অবকাশ থাকবে না আর।

টেলিফোনে কথা বলছিলেন বড়োসাহেব। রিসিভারটা নামিয়ে রেখে হঠাৎ বলে উঠলেন—'জেন্টলমেন, উই আর রিয়েলি হ্যাপি টু গেট ইউ অ্যাণ্ড...'

তারপর ইংরেজি শব্দ-কণ্টকিত আধা-হিন্দি, আধা-বাংলায় আসল বক্তব্য বর্ণনা করলেন। দেশের স্বাধীনতারক্ষার মহান দায়িত্ব আমাদের। স্বাধীনতার জন্য যারা প্রাণ দিয়েছেন তাঁরা শহীদ এবং দেশের শিল্প-বাণিজ্যকে রক্ষা করতে যাঁরা আত্মোৎসর্গে এগিয়ে আসবেন তাদের মর্যাদা শহীদদেরও উর্ধ্বে। কোম্পানি আজ একটু বিপন্ন। এ-ব্যাপারে আপনারা যদি একটু সাহায্য করেন তবে কোম্পানি আজীবন কৃতজ্ঞ থাকবে। ইনি মিঃ বোস, কোম্পানির স্টোর ডিপার্টমেন্টের একজন বিশ্বস্ত কর্মী এবং ইনি মিঃ বক্সি, সেল্‌স অ্যাকাউন্ট সেকশনে আজ সাত বছর ধরে কাজ করছেন। কিন্তু আপনি একজন বাইরের লোক। এঁদের সঙ্গে আপনার যোগাযোগ আছে। সরকারের সঙ্গে যে ব্যাপারে আমাদের মামলা চলছে তাতে আপনারা স্বীকার করবেন—

আপনারা তিনজন মিলে গত তিন বছরে কোম্পানির লক্ষাধিক টাকা নষ্ট করেছেন। ভয় নেই, চুরির দায়ে অভিযুক্ত হলেও আপনাদের রক্ষার যাবতীয় খরচ কোম্পানির, শাস্তি যাতে না হয় তার জন্য যাবতীয় চেষ্টা করা হবে। আর শাস্তি হলে কারাদণ্ডের বৎসরগুলিতে আপনাদের সংসার প্রতি-পালনের সমস্ত দায়িত্ব কোম্পানির। ফিরে এলে কোম্পানি আজীবনকাল আপনাদের সেবা পেয়ে ধন্য হবে। এখান থেকেই প্রচুর সঞ্চয় নিয়ে রিটেয়ার করবেন। এবং আপাতত···

মাথায় একটা প্রচণ্ড আঘাত পেয়ে টলে উঠল সনাতন। স্নায়ুতন্ত্রীতে তোলপাড় চলছে. ঘাম। এক কাপ চায়ের পরও গলাটা শুকনো। তেষ্টা।

বড়োসাহেবের ভ্রূকুটিতে তখন তীক্ষ্ণতা—'কি বলছেন? রাজি?'

সবগুলি দৃষ্টি সনাতনের উপরই নিবদ্ধ তখন। ছিপ ফেলে জলের দিকে অপলক চোখগুলি। ফাংনা নড়লেই ওদের চোখের পাতা কাঁপবে। সনাতন অনুভব করল। প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়তে চাইল সে কিন্তু ক্ষীণ কণ্ঠনালীতে কার শক্ত হাতের থাবা।

বড়োসাহেবের কণ্ঠস্বর পুরোহিতের মন্ত্রের মতো—'আই ডোণ্ট ওয়াণ্ট ইউ টু ডাই লাইক দোস্ হাউলিং হাংগ্রি বেগারস্। খবর পেলাম, পুলিশ লাঠি চালিয়েছে—প্রচুর জখম হয়েছে, অ্যারেস্ট করেছে আরও অনেক, গুলিতে মরেছে দু'তিনজন···

সনাতন তখন ঘামছে। সব কটা উদ্‌গ্রীব চাউনির সামনে নিজের বিপন্ন অস্তিত্বকে অনুভব করে পীড়িত হলো সে। মনে পড়ছে তার—এমনি একটা রুদ্ধশ্বাস পুলিসী-জেরার সামনে দাঁড়াতে হয়েছিল একদিন। সে ছিল আরও ভয়ঙ্কর—খোলা রিভলভার আর লক্‌লকে চাবুকের হুঁসিয়ারী। তেজী আলো, জ্বলন্ত সিগারেট চামড়ায়, ক্রোধে আর অপমানে ফেটে পড়েছিল আজিজ আর বসির। কিন্তু সনাতন যাদুকরের চোখে চোখ রাখতে চেষ্টা করল আবার। কম্পিত ক্ষীণকণ্ঠে, আধো আধো গোঙানির মতো যেন অনেক কষ্টে উচ্চারণ করল—'আওয়ার নর্মাল হার্টবিট্ গোজ্ এ হায়ার রেট দ্যান দ্যাট অব ইয়োর্স মিঃ বাজাজ। আই নিড্ সাম্ রেস্ট।'

'অ্যাণ্ড হিআর ইজ ইয়োর লাইফ। পোভর্টি'জ এ সিন। ফাইট্ ইট্ আউট্ জেণ্টল্‌ম্যান···'বড়োসাহেবের ভ্রূকুটি আর কপালের বলিরেখায় একটা আত্মতৃপ্তিবোধের প্রকাশ স্পষ্ট হয়ে উঠছে।

'ইনি মিঃ চোপরা, কোম্পানির ম্যানেজার, ইনি মিঃ বোস, অডিটর, ইনি মিঃ চৌধুরী, ল-অ্যাডভাইসর। এঁরা আপনাকে কেসটা ভালো করে বুঝিয়ে দেবেন। আপনি শুধু…'

অতর্কিতে, একান্তই আকস্মিকভাবে দেহমনের সমস্ত শক্তিকে একীভূত করে গলা ছিঁড়ে চিৎকার করে উঠতে চাইল সনাতন। পারল না। কণ্ঠনালীতে খামচে ধরেছে কেউ। তেষ্টা। হয়তো বা রক্তের চঞ্চলতায় শরীরে শিরায় চোখেমুখে কিছুটা আভাস ছিল তার। এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখ-সমরের প্রতিক্রিয়ায় চমকে উঠল। যেন গোটা চারেক কোষমুক্ত তরবারি ঝলসে উঠল চোখের উপর। এনাস্থিসিয়া সম্পূর্ণ না করেই বিছানায় শুইয়ে ছুরি-কাঁচি চালাতে চায় হিংস্র কুটিল ডাক্তার।

আস্তে আস্তে উঠে এলেন শশধর মিত্র। একেবারে পাশে দাঁড়িয়ে শান্ত, স্থির, লঘুস্বরে কানে কানে বললেন—'ডোন্ট বি সিলি …'

সনাতন চমকে তাকাল।

শশধর মিত্রের কটাক্ষে কুটিল ভ্রূকুটি—'গোটা কলকাতা শহর এখন অন্ধকার। পুলিশের কড়া টহল চলছে চারদিকে। ট্রাম পুড়ছে, বাস পুড়ছে, পুলিশের গুলি চলছে। মানুষ মরছে। এতটা পথ তোমায় হেঁটে যেতে হবে এই রাতে। তা ছাড়া…' শশধর মিত্র কণ্ঠস্বরকে আরও বিনীত করলেন—'এরা গোটা ভারতবর্ষ চালায় সনাতন। অফিসের সিক্রেট ফাইল তোমার কাছে ফাঁস করে দিয়ে এখন কিছুতেই দে উইল নট্ স্পেয়ার ইউ অ্যাট দ্য কস্ট অব দেয়ার সিকিউরিটি…।'

'কিন্তু আপনি…' সনাতন থরথর করে কাঁপছে।

'পেছনে দরজা বন্ধ। ওরা তোমায় গাড়ি করে পৌঁছে দেবে কিন্তু দরজা খুলবে না।'

'কিন্তু—'

'ভেবে দেখো ; নাউ ইট্ ইজ ইয়োর টাস্ক্ টু থিঙ্ক…'

সমস্ত উত্তেজনা শিথিল হয়ে আসে। হাঁটু কাঁপছে। অনিবার্য সর্বনাশের সামনে দাঁড়িয়ে সে তার শত্রুকে দেখছে, তার সুখী তৃপ্ত অনুত্তেজিত যুদ্ধজয়ের প্রসন্ন হাসি।

'এগুলোতে সই করো সনাতন।'

শশধর মিত্র একটা ফাইল নিয়ে সামনে দাঁড়ালেন। নিজেরই পকেট থেকে কলমের ক্যাপ খুলে ধরলেন।

একটা অন্ধকারের কালো পর্দা আস্তে আস্তে নেমে আসছে চোখের সামনে। সনাতন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হলো।

'ডোন্ট গেট্ এক্সাইটেড, জেন্টল্‌ম্যান। উই স্যাল্ গিভ্ ইউ লাইফ টু লিভ্, ওয়েলথ্ টু এনজয়...' মিঃ বাজাজ টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়লেন।

মাথার উপর ঘূর্ণায়মান পাখাটা যেন আস্তে আস্তে স্থির হয়ে আসছে। কয়েকটা মানুষ যেন জনতা হয়ে উঠছে হঠাৎ। আর চারদিক ঝাপসা, ঝাপসা, অস্পষ্ট, চারদিক দুলছে, কাঁপছে, সমস্ত শরীর টলছে তার। টের পাচ্ছে ধীরে ধীরে এনাস্থেসিয়া সম্পূর্ণ হয়ে আসছে। শরীর অবশ। শশধর মিত্র কলমটা ওর হাতের মুঠোয় তুলে দিলেন—'সই করো।'

সনাতন সই করল। একটি নয়, অনেকগুলি। মিঃ চোপরা এগিয়ে এসে দেখিয়ে দিলেন। পিঠ চাপড়ালেন আদরে।

গলা শুকিয়ে এসেছে। কাতরস্বরে উচ্চারণ করল সনাতন—'জল ......!'

বেল টিপলেন মিঃ বাজাজ—'বেয়ারা, একঠো অরেঞ্জ স্কোয়াস্।

এই সুন্দর পৃথিবীতে এত আনন্দময় তৃষ্ণার জল! সনাতন আকণ্ঠ পান করল।

মা-র আঁচল ভরে টাকা তুলে দিয়ে সনাতন অসম্ভব তিক্ততায় কারণে-অকারণে ভাইবোনকে ভর্ৎসনা করল, কাঁদাল। এবং সবশেষে আত্মগ্লানি আর আত্মধিক্কারে পীড়িত হয়ে আশ্রয় নিলো নিভৃতিতে। সমস্ত কলোনিটা তখন ফুটপাতের বেসামাল মেয়েমানুষের মতো ঘুমোচ্ছে। স্যাঁতসেঁতে মাটির মেঝে, ঘর্মা-ছাওয়া ভাঙাচোরা একটা জীর্ণঘরের পরিসরে ছেঁড়ানোংরা তেলচিটচিটে কাঁথা-বালিশের বিছানায় পাঁচটা মানুষকে এক সঙ্গে নিশ্বাস নিতে হয় বলে আজই প্রথম ঘৃণাবোধ হলো তার। লণ্ঠন জেলে বাইরের দাওয়ায় ছেঁড়া মাদুর পেতে শুলো। বাইরে বাতাস আছে, প্রয়োজনীয় অক্সিজেন নেই। হঠাৎ আবিষ্কার করল, পূর্ণিমা বিলম্বিত নয়। ত্রয়োদশী কি চতুর্দশীর চাঁদ উপচে পড়ছে পোড়ো-চালের উপর, দূরের শিউলি ফুলের গাছ থেকে গন্ধ আসছে। দেশ জুড়ে দুর্গা পুজোর ঢাক বাজবে শিগগির।

অস্থিরতা বাড়ল। ক্লান্ত শরীরে ঘুম নেই। বুকের পাঁজরে, স্নায়ু-

তন্ত্রীতে একটা তীব্র যন্ত্রণা তাকে পাগল করে তুলেছে। মনে পড়ছে নাজ্‌মাকে, মনে পড়ছে বুড়িগঙ্গার জল। মনে পড়ল কলকাতাকে। দুপুরের উর্বশী কলকাতা। মনে হলো, কারা যেন তার হাতটাকে শক্ত মুঠোয় ধরে, মচকে মচকে, একেবারে ধোওয়া-কাপড়-নিংড়োনোর মতো বাঁকিয়ে, মাটিতে মিশিয়ে দিচ্ছে। সনাতন সত্যি শরীরে একটা ব্যথা আর অসহ্য বেদনা অনুভব করল। এখনও একটু জ্যোৎস্নার লোভ! বাতাসে কিঞ্চিৎ স্নিগ্ধতার জন্য, একটু আরামের মোহে এখনও আকাশে নক্ষত্র খুঁজি? এই নিঃসঙ্গ নির্জন একাকিত্বে আকাশের চাঁদ আর একরাশ নক্ষত্রের মধ্যে যেন বিরাট একটা শূন্যতা অনুভব করে সনাতন লাফিয়ে উঠল। মিয়ে এলো আবদুল্লের চিঠি। এখনও অনেক কথা বলার আছে তাকে, অনেক কথা। পিছনের দিকে পুরো একটা সাদা পৃষ্ঠা। এই জ্যোৎস্নার মতো সাদা। মনের কথায় তাকে কালো করা যায়।

পুনশ্চ :— আমি মরিয়া গিয়াছি। একদিন আজিজ বসির আর ইয়াসিনের পাশে দাঁড়াইয়া মরিতে চাহিয়াছিলাম। সেদিন জীবনের প্রতি গভীর মমতা ছিল বলিয়াই বোধ হয় মৃত্যুকে লইয়া খেলা করিতে উৎসাহ বোধ করিয়াছি। আজ কষ্টে বাঁচিতে হইতেছে বলিয়া দুঃখ নাই, শুধুমাত্র বাঁচিয়া আছি বলিয়াই কষ্ট পাইতেছি। আমার বাঁচিয়া থাকাটা পাপ। এবং ইহা বুঝিয়াছি বলিয়াই বোধ হয় প্রতিমুহূর্তে মৃত্যুকে ভয়াবহ বলিয়া মনে হইতেছে। আমি স্বদেশ খুঁজিয়াছি। বুঝিয়াছি, আমার স্বদেশ নাই। আমি নারীর ভালবাসা পাইয়াছি। আমার জরাক্রান্ত যৌবনে একমাত্র নারীর নাম—নাজ্‌মুননাহার। গঙ্গা নয়, বুড়িগঙ্গাই আমার নদী। কিন্তু পৃথিবীর কোন মাটির কাছে ভিক্ষা চাহিয়াও বাঁচিবার অধিকার পাই নাই। স্বদেশহীন মানুষের স্থান এই মর্তভূমি কি করিয়া হইতে পারে?

সনাতন তাকাল। অপেক্ষা করল। সব কিছুই যেন ঝাপসা দেখছে সে। তারপর অনেক সময় কাটিয়ে আর কিছুই দেখতে পেল না। আস্তে আস্তে কলম বন্ধ করল, লণ্ঠন নেভাল! এবং তখনই অতর্কিতে একরাশ জ্যোৎস্না আছড়ে পড়ল শরীরে। কি দেখল সে চাঁদের দিকে তাকিয়ে! কি যেন মনে হলো তার। উঠে দাঁড়াল। মধ্যরাতে নিথর দীঘির জলে শাপলা পাতার পাশে পূর্ণিমার চাঁদের ছায়া সে কাঁপতে দেখেনি অনেক অনেক কাল। ঘরের দরজা ভেজানই রইল, পড়ে

রইল আজন্মের আশ্রয়। হঠাৎ যেন সেই জ্যোৎস্নাকেই ভালো লেগে গেল তার। দুপাশে কলোনির দোচালা ঘরগুলি নুয়ে নুয়ে পড়েছে থুরথুরে বুড়ির বাঁকানো পিঠের মতো। মাটির পথে ঝলমল করছে চাঁদের আলো। অদূরে তালগাছের মাথায় অদ্ভুত উজ্জ্বল একটি নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে নাজ্‌মাকে মনে পড়ে যায়। নাজ্‌মা দূরনক্ষত্রের মতোই একটি কল্পনা, এক মনোরম স্মৃতি। মন্টু মিনু বুলু—ছোট ভাইবোনগুলির মুখ ভেসে উঠল সামনে। রোগা লিকলিকে নিরীহ কতগুলি প্রাণী। বঞ্চনা আর অনাদর আর ক্ষুধার। মা! শব্দটার সঙ্গে সঙ্গেই সনাতন কাঁচা মাটির পথে চলতে গিয়ে হঠাৎ একটা নাড়া খেলো। মুহূর্তমাত্র। তারপরই আবার স্বচ্ছন্দে এগোতে পারল। দূরের গাছে কোথায় যেন প্যাঁচা ডাকল একটা, সামনের চকচকে কলাগাছের পাতায় জ্যোৎস্নার আলোয় কি যেন মনে হলো হঠাৎ। নিশির-ডাকে বেহুঁসের মতো এগোতে লাগল। এগোতে এগোতে পেরিয়ে গেল কলোনির শেষ প্রান্ত, ভুলে গেল, ঘরের দরজা ভেজানো রয়েছে পিছনে, ভুলে গেল, মা এখনই ঘুম থেকে জেগে উঠবেন…

ওয়ারেন্ট হাতে পুলিশ এলো পরদিন সকালে। তদন্তে প্রকাশ—ফেরারী গতকাল রাতদুপুরে ওপারে ট্রেনের তলায় মাথা দিয়ে আত্মহত্যা করেছে।

ইছামতী বহমান

প্রায় সন্ধ্যা নাগাদ একটা বাড়ির দরজায় এসে থমকে দাঁড়াল ওরা। লঞ্চ থেকে নেমে দেখতে দেখতে প্রায় চোখের উপর চারদিকের গাছপালা, ঝোপজঙ্গল, আকাশ আর ইছামতী নদী অন্ধকার হয়ে এলো। ছোট-বড়ো-সরু-লম্বা-ঝাঁকড়া কত রকমের গাছ—প্রায় কোনোটাই ভালো করে চেনে না মৃন্ময়ী। মাটির-ঘর, ধানের-মরাই, খড়ের-পালুই, ডুলি-পালকি পাখির ডাক,—দুপাশে যা কিছু চোখে পড়েছে সব নতুন। কিন্তু উৎসাহিত হবার মতো আবেগ অনুভব করেনি কখনও। অদ্ভুত একটা ভয় কণ্ঠনালীর মধ্যে আটকে আছে ভিতর থেকে, ভীষণ তেষ্টায় গলাটা শুকিয়ে আসছে। পুরো একটা রাত বাকি, আজ রাতেই একটা কিছু হবে, একটা ভয়ঙ্কর কিছু, বুকের ভয়টাই যেন বাইরে অন্ধকার হয়ে উঠছে, ঘরে আলো নেভালে যে অন্ধকার সেই অন্ধকার গোটা পৃথিবী জুড়ে—ভাদ্রমাস, সারাদিন ধরে আকাশ মেঘলা ছিল, থেমে থেমেই বৃষ্টি পড়ছে সেই সকাল থেকে, পায়ের তলায় কাদা, হাঁটু পর্যন্ত ডুবে যাচ্ছে কোথাও, ব্যাঙ আর ঝিঁ-ঝিঁর একটানা ঘ্যানোর ঘ্যানোর, ব্যাঙগুলি লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে সামনে, ভয়ে আতঙ্কে আর ঘৃণায় শিউরে উঠছে শরীর। বড়ো বড়ো গাছগুলির তলা দিয়ে যাবার পথে ঝুর ঝুর একপশলা জলে ভিজে যাচ্ছে মাথার চুল—কিন্তু কোন কথা নয়, টু-শব্দটি পর্যন্ত না—শক্ত করে দাঁতে ঠোঁট চেপে, ভিতরের কান্নাটাকে জোর করে বারবার ঢোক গিলে আটকে রেখে, সার্কাসের মেয়েগুলির মতো দুহাতে ভার সামলে সন্তর্পণে এগোচ্ছিল। জলে আর কাদায় গোড়ালির শাড়ি আর শায়ার নিচুটা সপ্ সপ্ করছে, হাঁটুতে জড়িয়ে আসে, শরীর ভেঙে ক্লান্তি। সামনে বড়দা পিছনে মা, ওরাও ক্লান্ত! দু-দুবার কাদায় পিছলে পড়ে যাচ্ছিলেন মা। সেই রহস্যময় অদ্ভুত মানুষটা, যে আজকের এই সমস্ত ব্যাপারটা ঘটাতে চলেছে, সব ব্যবস্থা করেছে এবং কলকাতা থেকে বসিরহাট, হাসনাবাদ, লঞ্চ,

পালকি সব কিছু করে এখানে নিয়ে এসেছে, তারই একটা টর্চ, তীব্র জোরালো টর্চ, সুটকেশ আর টর্চটা বড়দার হাতে, আর একহাতে ছাতা বাগিয়ে অন্য হাতে মা-কে ধরে পিছনে পিছনে আসছে লোকটা। অনর্গল কথা বলেছে গোটা পথ, কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ থেকে আয়ুব খাঁর শাসন পর্যন্ত লোকটা সব জানে। দুনিয়ার সব দেশেই তো আইন থাকে আর আইনের কেতাবগুলির মধ্যে উইয়ের মতো ঢুকে ফুকুরফাকর, ফন্দি-ফিকির খুঁজে বেরিয়েও আসতে হয়। সীমান্ত আবার কী? ওসব তো জাহাজ-উড়োজাহাজ, মোটরগাড়ি-রেল গাড়ির জন্য, নইলে সোনা-দানা থেকে জ্যান্ত মানুষ অবদি সবই তো এপার ওপার হামেশা চালাচালি চলে। একটু সাহস চাই, বুকের পাটা। অকারণে এমন ফিসফিস করে কথা বলে, যেন নিশাচরের মতো অন্ধকারে ঘুরে-ঘুরে পৃথিবীর অনেক গোপন কথা জেনে ফেলেছে লোকটা। মা অতসতো বোঝেন না, পুরানো দেশ-গাঁয়ের কথা হাঁ হয়ে শুনেছেন, মাঝে মাঝে কপাল কুঁচকেছেন বড়দা, ব্যাগ থেকে টাকা বের করে দিয়েছেন দরাজ-হাতে, যেন কিসের একটা নেশা লেগেছে তার, কোথাও কৃপণতা নেই। ইতিহাসের অধ্যাপক, গম্ভীর, কম কথা বলেন, যেন দুর্জ্ঞেয় একটা রহস্যের শেষ পর্যন্ত দেখার জন্যই মরিয়া! এবং সারাদিনের এত ক্লান্তির পরও শরীরটাকে ভুলে যাচ্ছে মৃন্ময়ী, গলা-বুক শুকিয়ে আসছে। পিছনে মা-কে ধরে ধরে আসছে মানুষটা, কথা বলছে, হাসছে। শুধু টাকা চাইবার সময়ই অদ্ভুতভাবে হাসে, অন্য সময়ে আরেক ধরনের হাসি, এবং অন্ধকারে লোকটাকে দেখা না-গেলেও তার কথায়, হাসিতে, পায়ের শব্দে, বুকের ভিতরটায় আগুনের ছ্যাঁকা লাগে। অথচ কী ভীষণভাবে লোকটাকে বিশ্বাস করে ফেলেছেন বড়দা, মা। এই বিশাল ভারতরাষ্ট্রের এক প্রান্তে, সীমান্ত এলাকায় কী সব হবে আজ রাতে, অন্ধকারে, নিঃশব্দ গোপনে---এবং এই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর লোকটাই নাকি সব আয়োজন করেছে। সাত-জেলে-মোল্লা-খালি গ্রাম, কী অদ্ভুত নাম! আর এই অজানা অপরিচিত এক গ্রামে এমনি একটা অজ্ঞাতপরিচয় মানুষকে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে, এমনি ভয়ঙ্কর অন্ধকার রাতে নিজেদের সম্পূর্ণ সমর্পণ করে...আর ভাবতে পারে না মৃন্ময়ী, দম বন্ধ হয়ে আসে। শুধু মা আর বড়দাকে নিরাপদ ভরসা মনে করে সাহস কুড়োয়, শক্ত হয়।

কিন্তু চারদিকের এই দুর্যোগ আর অন্ধকারের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়া

করতে গিয়ে কেমন যেন বুদ্ধিটুদ্ধি সবকিছু তালগোল পাকিয়ে যাচ্ছে দ্রুত। 'কোথায় যাচ্ছি আমরা ?'—সকালে বসন্ত রায় রোডের বাড়ি থেকে বেরিয়ে ট্যাক্সিতে ওঠার সময় প্রশ্ন করেছিল মৃন্ময়ী। বড়দা কথা বলেন নি, তাকিয়েছিলেন মা-র দিকে, নিঃশব্দে, মা তাকিয়েছিলেন বড়দার দিকে, বাইরে দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিলেন বৌদিরা, রাস্তায় একেবারে ট্যাক্সির দরজা ছুঁয়ে নেমে এসেছিলেন মেজদা, ছোড়দা। 'আমি কি পর হয়ে যাচ্ছি, তোমরা কথা বলো…' মেজবৌদিকে জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে উঠেছিল। ওকে ঘিরে অনেকগুলি ভালোবাসা, স্নেহ, আদর, পিঠের উপর অনেকগুলি হাতের ঘোরাফেরা। মা কাছে টেনে নিয়েছিলেন—'আমিই তো সঙ্গে যাচ্ছি, ভয় কি মা!' নিজে ধরে ধরে রাস্তায় নেমে একসঙ্গে ট্যাক্সিতে উঠেছিলেন। তারপর সারাদুপুর ধরে বাঙলাদেশের বুকের ওপর দিয়ে বাস, বসিরহাট-হাসনাবাদ, তারপর অন্ধকার নামল, এই অন্ধকার। আলো নেভানো ঘরের বাইরে গোটা পৃথিবী জুড়ে একসঙ্গে এত অন্ধকার নামতে পারে, সেই পাক-ভারত যুদ্ধের সময় ব্ল্যাকআউট-কলকাতার বীভৎস রাতগুলি ছাড়া অন্য কোন রাত্রির কথা মনে করতে পারে না মৃন্ময়ী।

এবং এখন অন্ধকার পথ ডিঙিয়ে এতদূর এসে একটা দরজার সামনে দাঁড়াবার পর সেই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর লোকটা বাড়ির ভিতর চলে গেল। বাইরে জল কাদা আর অন্ধকারে মিশে গিয়ে তিনজন একান্ত আপন মানুষ চুপচাপ স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। বাতাসের একটানা শব্দ চারদিকে। ঠাণ্ডা আর্দ্র বাতাস, ব্যাঙ আর ঝিঁঝিঁ-র ডাক, দূরে নদীর জলে মোটর-লঞ্চের বাঁশি, দূরে গলা ছিঁড়ে কে যেন ডাকছে কাকে! মাঝি-মাল্লা। হয়তো-বা। একেবারে পার ধরেই এতক্ষণ হেঁটেছে ওরা, ওপারে দু'একটা ইতস্তত আলো। গাছপালা ঝোপঝাড়ের আড়ালে, ফাঁকেফুকরে স্পষ্ট দেখা যায়। ওপারে কালীগঞ্জ থানা, খুলনা জেলা—হয়তো-বা অন্যমনস্কভাবেই হাতের টর্চ জেলে আলোটা মাথার উপরে চারদিকে ঘুরিয়ে নেন বড়দা, সে আলোয় ওরাও তাকায়। খুব বড়ো বড়ো গাছ সামনে, অনেক উঁচু, অন্ধকারে বোঝা যাচ্ছে না, কি গাছ তা-ও জানে না, চেনে না, তারপরই ঢালু জমি, তারপর নদী, ওপারে পাকিস্তান। কেমন ভয় করে মৃন্ময়ীর, সব মিলিয়ে ভয়, রাত-অন্ধকার-অচেনা জায়গা-পাকিস্তান। সীমান্তের কাছাকাছি এপারে ওপারে। গরুভেড়াছাগল ইত্যাদি চুরির

ঘটনা, সীমান্ত পুলিশের সংঘর্ষ—খবরের কাগজে প্রায়ই তো থাকে, যদি তেমনি হঠাৎ কিছু ঘটে যায় আজই। ঠিক এখানেই। অন্ধকারে দেখা যায় না, কিন্তু পরিষ্কার বোঝা যায়, ওপারের আলোগুলির দিকে তাকিয়ে আছেন মা, এবং ওই আলোগুলির জন্যই হাতের টর্চটা অমন ছেলেমানুষের মতো জ্বলে জ্বলে উঠছে বড়দার হাতে। এই বিপুল অন্ধকারের মধ্যে তিনটি হৃদয়, তিনজন আপন-মানুষ, নিঃশব্দে, পরস্পরকে স্পর্শ না-করে, পাশাপাশি দাঁড়িয়ে, নির্বাক বিস্ময়ে অথবা গভীর বেদনাকে বুকে চেপে, দুঃখে-যন্ত্রণায়—মৃন্ময়ী স্পষ্ট অনুভব করে—একই কথা ভাবছে। বৃষ্টির জলে-অন্ধকারে-কাদায় তিনজনই যেন অন্ধের মতো হাতড়ে হাতড়ে খুঁজছে একটা কিছু, কোন হারানো সম্পদ। 'নদীটা বইছে দেখ্ মিনু, পুরনো অভ্যাসে বইছে ইছামতী, যার এপারটা সত্যি, ওপারটাও সত্যি। আমার কৈশোর আর প্রথম যৌবনটা ওপারে, সেটা মিথ্যে হয়ে গেছে। আর তোর ..' বড়দা থেমে গিয়েছিলেন। হাসনাবাদ থেকে লঞ্চটা আসছিল, অপলক তাকিয়ে ছিলেন অন্যদিকের পৃথিবীতে। সকাল থেকে ট্যাক্সিবাসরিক্সালঞ্চ, সারাদিনের দীর্ঘ পথে একটি কথাও বলেন নি বড়দা, শুধু সন্ধেবেলা নদীতে নদীতে ভাসতে ভাসতে, ওপারের সূর্যটা যখন এপারে ঢলে পড়ছিল, নিতান্ত স্বগতোক্তির মতোই কথাগুলি উচ্চারণ করলেন বোনের পিঠে হাত রেখে—'মা-র একদিকে তুই, অন্যদিকে আমি, দু'জনই সত্যি। কিন্তু হঠাৎ আজ যখন ওই সত্যিটাকেই জোরের সঙ্গে বুঝে নিতে চাইছি, কাঁদিস নে, কেঁদে লাভ নেই, কোথাও একটা বিশ্বাস খুঁজে নিতেই হবে আমাদের। শক্ত পায়ে দাঁড়াতে হবে।' বড়দার কথাগুলি মনে হতেই এবং দৃশ্যটা মনে মনে কল্পনা করে অন্ধকারে হাত বাড়াল মৃন্ময়ী। বড়দা আর ওর মাঝখানে মা, শরীরে হাত পড়তেই দু'হাত বাড়িয়ে মা কাছে টানলেন। মা-র কাঁধে মাথা লুকিয়ে মৃন্ময়ী থরথর করে কেঁপে উঠল। ভিতর থেকে একটা কান্নার বাষ্প কোনদিকে বেরোবার পথ খুঁজে না-পেয়ে পাক খেয়ে খেয়ে গুমরোতে গুমরোতে যন্ত্রণায় তোলপাড় করছে বুকের ভিতরে, ঠোঁট দুটো কাঁপছে বাঁশপাতার মতো, চোখের জলে ভিজছে বুক। অন্ধকারেই দুহাতে বুকে জড়িয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন মা—'আমি তো আছি, সঙ্গে আছি, ভয় কী মা তোর?' অন্ধকারে স্থির দাঁড়িয়ে থেকে বড়দা নির্বাক। শুধু ঝিঁঝিঁ আর ব্যাঙের ডাক চারদিকে, অন্ধকারে জোনাকি, কোথায় ডানা ঝাপটাচ্ছে একটা পাখি, তার শব্দ।

মৃন্ময়ী কান্নায় ভাসল, বৃষ্টিতে ভেজা মায়ের আঁচলটা চোখের জলে ভিজছে। অচেনা এক গেঁয়ো-গেরস্তের বাড়ির দরজায় অন্ধকার আড়াল করে নিলো সব। শুধু শব্দ, চারদিকের অগুণতি ধ্বনির মধ্যেইছামতীর স্রোত আর কান্নার শব্দ। তোমার বয়স! তোমার বয়স কতো মিনু? ... বৌদি। স্বাধীনতার একুশ বছরে তুই কতো বড়ো হয়ে উঠেছিস মিনু! ধর, মনে করা যাক, তুই জন্মেছিলি উনিশ শ' সাতচল্লিশে, পনেরই আগস্ট, স্কুলের খাতায়. তোর হায়ার সেকেণ্ডারির সার্টিফিকেটে তাই তো লেখা আছে। কটা পনেরই আগস্ট, কতগুলো জন্মদিন পেরিয়ে তুই আজ এত বড়ো হয়েছিস রে! যখন ছোট ছিলি ফ্রক কিনে দিতাম, এখন শাড়ি, তোকে আদর করেই আমাদের স্বাধীনতা-উৎসব। মেখলা পরিস না কেন তুই! তোর জন্মদিনে পরাব। ঘাগরা হবে সবুজ, ব্লাউজ হবে সাদা, ওড়না হবে জাফ্রান।... মেজদা! মৃন্ময়ী, মিনু মৃন্ময়ী —মৃৎ মৃত্তিকা, মৃৎময়, মৃত্তিকাময়, মাটি, মাটিই যার সব, বাবা তোর নাম রেখেছিলেন, বাবা নেই, কিন্তু তোর নামটা আছে। নিজের নামের মধ্যে ডুবে যেতে পারিস মিনু? অন্তত নিজের পরিচয়টা, নিজের ইতিহাস।... সেজদা! সে অনেকদিন আগে, দেশবিভাগের পর সাতপুরুষের ভিটেমাটি ছেড়ে চোখের-জলে বুক ভাসিয়ে, কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে চারদিক থেকে ছুটছে মানুষ, হাজারে হাজারে, লাখে লাখে, মানুষের মাথা মানুষ খায়, আমরাও ছিলাম, ফরিদপুরের মাদারীপুর মহকুমার পালং গ্রাম থেকে যাত্রা আমাদের, বিকেল বেলা, গোয়ালন্দ, পদ্মার জাহাজঘাট থেকে রেলগাড়ি, ভিড়ের চাপে কে কোথায় হারিয়ে যাচ্ছে, চিৎকারহল্লাগুতোগুঁতি, বৃষ্টি পড়ছিল, শ্রাবণ মাস, পায়ের তলায় কাদা, কাদায় লেপটে-থাকা একটি মেয়ে, ফুটফুটে সুন্দর এক শিশু, কতো আর বয়স তখন, দেড়-দুই, অসহায়, আহা রে, কোন হতভাগী মায়ের বুক থেকে খসে-পড়া হৃৎপিণ্ড! চারদিকের মানুষগুলি তখন জন্তু, কেউ এক নিমেষের জন্যও থামতে জানে না, ওনার চোখে পড়ল, তুলে নিয়ে আমার বুকে দিলেন, আমার বুকে তখন শ্যামল, এক বয়সী, চলে এলাম। অনেক খোঁজখবর চলল তারপর, কত মানুষ এলো চারদিক থেকে, কত মায়ের বুক ভেঙেছে, বিশ্বাস করার মতো প্রমাণ জুটল না কোথাও, মায়া-জড়ানো মেয়েটাকে ছাড়তে পারলাম না।...মা! এতকাল ধরে লুকিয়ে রাখলে যদি, কেন আজই বললে, কেন লুকিয়ে রাখলে না? মা-গো...আজ একুশ বছর পরে...। চোখের ওপর একটু একটু করে বড়ো

হলি তুই, স্কুলকলেজের সব পড়া শেষ করে এম-এ পড়ছিস। কিন্তু এই একুশ বছর ধরে একটানা সন্ধান চলছে তোকে গোপন করে। তোর পরিচয়! কেন সংশয় মা? যদি জানতে, আমি মুসলমান, ডোম বা শুদ্দুরের মেয়ে… মা তোমার একুশ বছরের আশ্রয়, মা তোমার একুশ বছরের ভালবাসা, মা আমার একুশ বছরের বিশ্বাস! হাজার বছরের পুরনো একটা বটগাছ মিনু. মাটির তলার অন্ধকারে তার শিকড়গুলি পাক খেয়ে খেয়ে চারদিকে ছড়িয়ে, অনেক নিচে অন্ধকারের গভীরে ডুবে নিজের একটা সাম্রাজ্য গড়তে চায়, অন্ধকারের সেই শক্তিটা আছে বলেই মাটির ওপরে আলোয় মাথা উচু করে, শক্ত-ঋজু হয়ে এত দীর্ঘ দীর্ঘদিন, হাজার বছর সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আমাদের জন্মের আগে মাতৃগর্ভে সেই অন্ধকার, সেই অন্ধকারে আমাদের শিকড়। আমাদের জন্মের মধ্যে রক্তের পবিত্রতা খোঁজার কুসংস্কার নয় মিনু, নিজের জীবনটাকে সম্পূর্ণ করে জানার জন্যেই আমরা শিকড় খুঁজি, আমাদের নিজেদের ইতিহাসটা পুরোপুরি বোঝার জন্যে।…বড়দা! আমার শৈশব থেকে আমিও তোমাকে একটা বটগাছ ভেবে এসেছি বড়দা, কতো বড়ো তুমি। …আমরাও আমাদের শিকড় হারিয়েছি মিনু, খুঁজছি, ঠিক তোর মতো, আমরা সবাই। মাটির তলায় শিকড় নেই, শক্তবিশ্বাসে মাটিকে আঁকড়ে-থাকার বিশ্বাস! মাটির ওপরে আলোয় আমরা আগাছা।…মৃন্ময়ী, মিনু, মৃন্ময়ী; মৃৎ মৃত্তিকা, মৃৎ-ময়, মৃত্তিকাময়, মাটি, মাটিই যার সব। জনকরাজার রথের তলায় মাটি, মাটিতেই জন্ম নিলেন কন্যা, জানকী, শঙ্খধ্বনি মিথিলার সুরম্য হর্ম্যে, অশোককাননে নিঃসঙ্গ বেদনা, অযোধ্যার বঞ্চনা, ফিরে ফিরে সেই দ্বিধা-ধরিত্রী, শেষ আশ্রয়। খণ্ডিত জন্মভূমিতে জন্ম তোর মিনু, ফাটল ঘোচাবি তুই! আবার সেই ফাটলের কাছে বারবার ফিরে ফিরে আমরা আসব মিনু, আমরা সবাই, তোর সঙ্গে, ফাটলটার কাছে, তোকে জানতে, আমাদের পরিচয়টা…

কাদের যেন পায়ের শব্দ, ফিসফিস কথা! দরজার ওপাশ থেকে কারা এগিয়ে আসছে! সেই লোকটা, সঙ্গে আরও কেউ। একটা লালচে আলোর আভাস অন্ধকারে। সচকিত হয়ে উঠল সবাই। মায়ের কাঁধ থেকে মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল মৃন্ময়ী এবং অন্ধকারেই হাতড়ে হাতড়ে ওর চোখের গালের উপর আঙুল বুলিয়ে দিলেন মা—'কাঁদিস নে, কাঁদিস নে মা, আমিই তো সঙ্গে আছি, ভয় কি তোর?' মৃন্ময়ী ওর রুমালটা চোখেমুখেগালে

সর্বত্র বুলিয়ে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল।

অন্যমনস্কভাবেই টর্চের আলোটা ডানদিকে বাঁ-দিকে ঘোরালেন বড়দা। দু'পাশ থেকে লম্বা মাটির দেয়াল এসে একটা দরজায় মিশেছে, দরজায় লাল কাঠের গায়ে কোন শিশু-হাতের সাদা খড়িমাটির ছবি—মানুষ বলে ধরে নিতে হবে এমনি একজন কেউ, মাথায় লোহার-টুপি, হাতে বন্দুক, আরেক দিকে তিন-রঙা ঝাণ্ডা, মধ্যে চক্র, উপরে আঁকাবাঁকা হরফে 'জয়-হিন্দ'। সীমান্তের শেষ রেখা ছুঁয়ে পশ্চিম থেকে পুবদিকে, যেন সতর্ক-নির্দেশ। ইলেকট্রিকের পোস্টে যেমন মরা-মাথার খুলি আর আড়াআড়ি কঙ্কালের হাড়।

একটা লণ্ঠন নিয়ে দু'জন মানুষ এসে দরজায় দাঁড়াল, লণ্ঠনের লালচে-আলোয় কেমন ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে দু'জনকে। সেই বিদঘুটে লোকটা, সঙ্গে কালো মোটা ধুমসো-মার্কা আরো একজন। হাঁটু-উঁচু নোংরা ধুতি, খালি গা, রোমশ বুকে কারের সুতোয়-বাঁধা একটা চ্যাপ্টা মাদুলির লকেট, মেদ-থলথল কনুই-এ ঢাকঢোলের মতো আধ-ডজন কবচমাদুলি। লোকটা গোঁফের ফাঁকে হাসল—'পেন্নাম হই গো কত্তাবাবু, মা-দিদির। পেন্নাম…' লোকটা লণ্ঠনশুদ্ধ হাতজোড় করে বুক পর্যন্ত তুলল— 'গরিবের ঘরে রাত কাটাবেন এট্টা, আসুন, আসুন…'

বড়দা এগোলেন, তারপর মা, তাদের অনুসরণে মৃন্ময়ী পা বাড়াল। দরজার ওপাশেও প্যাক প্যাক কাদা, দুটো করে ইঁট গায়ে গায়ে বসানো, একটু দূরে দূরে। উঠোনটা বড়ো, অনেক বড়ো, কতো বড়ো বোঝা যায় না ঠিক। লণ্ঠনের আলোয় ইঁটগুলি কিছুদূর গিয়েই হারিয়ে গেছে! দূরে দূরে লণ্ঠন-হাতে দাঁড়িয়ে আছে আরও কিছু মানুষ, ঘরের বৌ-ঝিরা। ঘুঁটঘুঁটে অন্ধকারে লুকোন চারিদিকটা ভালো করে বুঝে উঠতে না-পারলেও, এরই মধ্যে, শুধু সদর দরজা পেরোতেই মৃন্ময়ীর মনে হলো, বড়দা, মা এবং সে নিজে কী দুঃসাহসিক অভিযানে অদ্ভুত এক জগতে এসে পড়েছে, বেমানান, বসন্ত রায় রোডের সুন্দর ওই ফ্ল্যাটবাড়িতে বসে ভাবাই যায়নি এতদিন, পৃথিবীতে কিংবা এই বাংলাদেশে এরকম একটা জগৎ আছে। এত অন্ধকার, এত স্তব্ধতা, এত বিচিত্র মানুষ! হয়তো-বা এদের কাছে নতুন কিছু নয়। আরও অনেকে আসে, আরও অনেক মৃন্ময়ীর জন্য আরও অনেক মানুষ, এই ফাটলটার কাছে। শুধু বিস্ময়, আর বুকের ঢিপ্ ঢিপ্

ভয়টা! অবশ পা-দুটো থমকে দাঁড়ায়। বিকট একটা হাঁক আসে অনেক দূর থেকে, মানুষের হাঁক, সঙ্গে সঙ্গে আরও কতগুলি, কাছেই মনে হয়, খুব কাছে, এই নিশুতিতে বুক ধড়াস করে ওঠে। বড়দা, মা, থমকে দাঁড়ালেন। সেই অদ্ভুত লোকটা হাসে—'ও কিছু না, কিছু না কত্তা, পাকিস্তানের পুলিশ...'

'পুলিশ...'

'শুনলেন না, এপার থেকেও জবাব গেল। এখন আর কি? রাত বাড়ুক, তিষ্ঠোতে দেবে না।'

'কেন, এসব কেন?'

'আমাদের শাসাচ্ছে, ঘুষের টাকা আগাম না দিয়ে যাচ্ছো কোথায় হে?'

'সে কি?' আৎকে ওঠেন মা—'ভয় করে না আপনাদের? যদি গুলি ছোঁড়ে!'

'গুলি?' ওরা হাসল, খকখকে হাসি—'ওপারে চাঁদ-তারার ছাপ, এপারে তিন-সিংহি, মাঝখানে এই চরটায় সারারাত ধরে এখন এই তো চলবে মা। আকাশে যুদ্ধ হবে, কলকেতায় ঢাকায় বোমা পড়ে আপনাদের মারবে, আমরা এই চরের মাঝখানটায় শিবঠাকুর সেজে মজা দেখব গো মা-ঠাকরুন।'

বড়দা নিঃশব্দে এগোলেন। ওরা ডানদিকে নিয়ে গেল বড়দাকে। টর্চের আলো ফেললেন বড়দা—ছোট একটা মাটির ঘর, খড়ের ছাউনি। মৃন্ময়ী শিউরে উঠল। ওঘরে কোথায় যাচ্ছেন বড়দা! বড়দা আলাদা হয়ে যাচ্ছেন। বসন্ত রায় রোডে বসবার-ঘরের দেয়ালে একটা বিলিতি কোম্পানির ক্যালেণ্ডারে গোপাল ঘোষের ছবিতে এরকম একটা ঘরের ছবি ঝুলছে। একেবারে জ্যান্ত-ক্যালেণ্ডারের সামনে দাঁড়িয়ে মৃন্ময়ী আতঙ্কে থরথর করে কেঁপে উঠল। বড়দাকে নিয়ে ওরা চলে যেতেই দূর থেকে মেয়েরা এসে আলো দেখাল, মা-র পিছু পিছু যেতে মৃন্ময়ী শুধু দুপাশের কতগুলি গেঁয়ো বৌ-মেয়ের লালসবুজ ডোরা-কাটা নোংরা শাড়ির গন্ধ নাকে সয়ে এগোতে লাগল। মা আর ও—মৃন্ময়ী অবাক হলো, দুটো মেয়েমানুষের কাছে কি লজ্জা বৌগুলির, ঘোমটা টেনেছে একহাত। বার-তের বছরের মেয়েটাও শাড়ি পরেছে, আর ওর বয়সী বাইশ-পঁচিশের বৌগুলি শাড়ি পরেছে, ব্লাউজ নেই, শায়া নেই, নাকে ফুল, কপালে-সিঁথিতে ড্যাবডেবে সিঁদুর। পাশাপাশি চলতে চলতে মৃন্ময়ী লক্ষ করল, সোজাসুজি চোখে

চোখ রেখে অথবা ঘোমটা সরিয়ে আড়চোখে ওরা দেখছে ওকে। রাগ হলো মেজোবৌদির উপর। ও নিজে চায়নি, কিন্তু মেজোবৌদি নিজে আলমারি খুলে জোর করে রঙিন সিল্কের শাড়িটা পরিয়ে দিয়েছেন।

আরও একটা মাটির-ঘর। দাওয়ায় উঠতেই অন্ধকারে কিসের সঙ্গে জড়িয়ে পড়ল মৃন্ময়ী। ভয়ে চিৎকার করে উঠল। খলখল খলখল হেসে ওকে ছাড়িয়ে দিল মেয়েরা। এপাশ থেকে ওপাশে টান-করে-রাখা বড়ো বড়ো মাছ-ধরার জাল, আঁশটে গন্ধ, গা গুলিয়ে আসে। ঘরের ভিতরেও আঁশটে গন্ধ। মৃন্ময়ী আবিষ্কার করল এতক্ষণ যে গন্ধটা ঠিক চিনতে পারছিল না অথচ বিচ্ছিরি লাগছিল, সেটা মাছের গন্ধ, এদের মানুষগুলির গায়ের গন্ধও আঁশটে। পায়ের জুতোজোড়া বাইরে রেখে ঘরে ঢুকতেই কান্না পেল। প্রায়ান্ধকার ঘরটায় ভেজা-মাটির মেঝেতে ঢালাবিছানা, ছেঁড়াফাটা নোংরা, হতচ্ছিরি কাঁথার উপর তেল-চিটচিটে ওয়ার-ছাড়া বালিশকে জড়িয়ে, অথবা বালিশ ছাড়াই ঘুমে-কুঁকড়োনো একপাল ন্যাংটো ছেলেমেয়ে। একপাশে ইঁটের উপর উঁচু-করা পুরনো তক্তপোশে ততোধিক নোংরা দুর্গন্ধময় কাঁথার বিছানায় দুটি বালিশ। মা বসলেন, মা-র গা ঘেঁসে মৃন্ময়ী। ওরা মা-কে প্রণাম করল একে একে, বামুন-ঠাকরুণের পায়ের ধূলি, মা-কে সারদা-মায়ের মতো দেখাচ্ছিল এবং সেই লণ্ঠনের লালচে আলোয় ওদের সকলের মুখগুলি দেখছিল মৃন্ময়ী, মেয়ে-বৌ-বুড়ি, হাড় গিলগিলে শরীরগুলি। এবং প্রণামের শেষে ওরাও মৃন্ময়ীকে ঘিরে দাঁড়াল তিন দিক থেকে, একেবারে গা-ঘেঁসে, চোখে-মুখে ভরাট-বিস্ময়। বয়সে নুয়ে-পড়া সেই বুড়িটা ছানি-পড়া চোখ তুলে, চোয়াল চুষতে চুষতে দেখতে চাইল। হাতের লণ্ঠনটা আরও উঁচু করে ধরল একজন, মৃন্ময়ীর চোখ বুজে এলো, ঝিম মেরে বসে রইল, শুনল বুড়িকে বলছে কেউ—'রূপবতী কন্যে গো মা, মা-লক্ষ্মীর ঝি, ডাগর ডাগর চোখ, মেঘবরণ কেশ, বেহুলা কন্যের কপাল গ, জলে ভাসতে এলো।' বোজানো চোখের-পাতা ভেদ করে লণ্ঠনের আলো এসে বেঁধে, কপালে ঘাম জমে, দাঁতে দাঁতের-চাপ পড়ে! অন্য কোনদিন হলে এ অবস্থায় নিঃসন্দেহে হাসি পেত; পেটে-খিল-ধরা হাসি। কিন্তু ঠোঁট কাঁপছে, রক্তচাপ-মাপার ডাক্তারী-যন্ত্রের পারা-ওঠানামার মতো কণ্ঠনালীটা ঘন ঘন উঠ-বোস করছে, বুকের ভিতরে কান্না। ফুলসজ্জার রাতে শ্রাবণীকে দেখার জন্য টেবিল-লাইট মুখের সামনে এনে পনের-মিনিট ধরে কী-সব হাসাহাসিমন্তব্য

করেছিল সবাই, ক্লাসে মেয়েদের কাছে গল্প করেছে, সে কী হাসির হুল্লোড়, কেমন একটা রোমাঞ্চও ছিল রক্তে। মৃন্ময়ীর কান্না পাচ্ছে। ওরা মুগ্ধ হয়ে আছে, এমন রূপ ওরা কখনও দেখে নি অথবা কদাচিৎ। কিন্তু নিজে চোখ খুলতে পারছে না। একই আলোয় ও কাদের দেখবে? রোগা চোয়াল ভাঙা, হতকুচ্ছিত কতগুলি মেয়ের মুখ, কণ্ঠা বেরিয়ে আছে, চোখ গেঁথে গেছে গা ভরে আঁশটে-গন্ধ। অবশ চোখ বুজেও সেই গন্ধে বমি আসছে ওর। যদি চোখ বুজেই বসে থাকা যেত আজ, সারারাত। এই লণ্ঠন তো আজ আবার নাকমুখচোখকানচুলদাঁত, হাতের-আঙুল, পায়ের-গোড়ালি নতুন করে পরখ করবে—শরীরে আচমকা ধাক্কা লাগে, যদি সত্যি তাই হয়! যারা আসবে, যদি দাবি করে! স্মাগলার মেয়েরা যেমন তাদের শায়া আর ব্লাউজের নিচে সুপুরির পুটলি আফিং-এর ডেলা লুকিয়ে চোরের মতো সীমান্ত পার হয়…তুমি…তুমিও নিজের পরিচয়টা গোপন করে পালিয়ে যাচ্ছো কোথায়? ওরা না-চাক, মা প্রমাণ চাইবেন। এবং তখন যদি পুরুষমানুষের চোখের আড়াল থেকে দূরে সরে গিয়ে, মা আর ভুল-মা দু'পাশে দাঁড়িয়ে লণ্ঠনের আলো তুলে ওর কোমরের শাড়ির গিঁট, শায়ার দড়ি একটু খুলে ঠিক উরুর তলায় একটা কালো জড়ুল খুঁজে পায়! জন্মের চিহ্ন। আর ভাবতে পারে না মৃন্ময়ী, এত কুৎসিত, এত অশ্লীল সব ব্যাপার ঘটতে পারে ওকে নিয়ে, কল্পনা করা যায় না। মাথা ঝিম-ঝিম করে। মুখের এত কাছে লণ্ঠনের তাপ, মাথার শিরাগুলি দপদপ করে যন্ত্রণায়।

'কী গ মা-ঠাকরুণ? উনুনটা বইয়ে গেছে, দুটো চাল ফুইটে নিন।'

মৃন্ময়ী চোখ খোলে। সামনে ছেলে-কোলে একজন বয়স্ক বৌ। গিঁট দেওয়া ডোরা-কাটা গোলাপী শাড়িটা বুক থেকে সরিয়ে ছেলের মুখে মাইটা পুরে ছেলেকে দোলাচ্ছে, একেবারে খোলাখুলি, চোখের উপর।

মা বললেন—'না বাপু, আমি বিধবা মানুষ, রাতে কিছু খাব না…'

'পর ভাবেন কেনে গ মা-ঠাকরুণ। কিছু মুখে দেবেন নি? একবাটি দুধ। ওখেনে বামুনঠাকুর, হেই দিদিঠাকরুণ…'

'ওরা তোমাদের রান্নাই খাবে, ওরা জাতকুল মানে না।'

'মোরা জেলে গ মা-ঠাকরুণ, জেলে-বৌর হাতে বামুনঠাকুরের ভগ্‌ অ মাগো, মোদের পাপ হবে নি?'

মৃন্ময়ী উঠে দাঁড়ায়। ডালা-বন্ধ-করা সিন্ধুকের ভিতরের পুরনো দলিল দস্তাবেজ, নথিপত্তর, ভিক্টোরিয়ার মুণ্ডু-মার্কা টাকা আর কাঁসাপিতলের হাড়িকলসীর মতো এইটুকু ঘরের মধ্যে এতগুলি মানুষের গাদা। দম বন্ধ হয়ে আসে। আপাতত ভেজা-শাড়িটা পাল্টানো দরকার, পায়ের তলায় সপ্ সপ্ করছে, কাদায় মাখামাখি। কিন্তু স্যুটকেশটা ওঘরে, বড়দার কাছে। বড়দার কাছে যাওয়া যায় না? সাহস পাওয়া যেত। কিন্তু বাইরের উঠোনে অন্ধকারের কথা ভেবেই মনটা সিঁধিয়ে গেল। বড়দাকে নিয়ে এখন ওরা নিশ্চয়ই শলা-পরামর্শ করছে, মৃন্ময়ী ভিতরে ভিতরে ঘামতে শুরু করে। রাত গাঢ় হচ্ছে। ঢাকা থেকে কালীগঞ্জ এসে ওরাও নিশ্চয়ই অপেক্ষা করবে। তারপর রাত আরও গভীর হলে সেই ভয়ঙ্কর আর অদ্ভুত লোকটা নিজেই ওপারে যাবে অথবা লোক পাঠাবে, রাত-দুপুরেরও পরে একটা-দেড়টা-দুটো, কতো রাত কে জানে, গাঢ় অন্ধকারে গা ঢেকে, কোন আলো না-জ্বেলে, কোন শব্দ না-তুলে ইছামতী পেরিয়ে নৌকোটা এপারে পৌঁছোবে। তারপর? গোটা শরীর ঝিম মেরে যায়, সম্ভাব্য দৃশ্যটা চিন্তা করতেও মাথা ঝিমঝিম করে, ঘামতে থাকে। আবার হয়তো লণ্ঠনের লালচে আলো উঠবে নাকের ডগায়, চোখ খুললেই লণ্ঠনের অর্ধবৃত্ত অগ্নিকণা আর চিমনির কালি-ঝুলির ওপারে কতগুলি উৎসুক চোখের চাউনি। ওরা কারা? রক্তের প্রবাহে ঝড় ওঠে, শরীরটা অবশ, মৃন্ময়ী চোখ বোজে। তোমরা কারা? কি চাও? আমি চিনি না। নিমজ্জিত অন্ধকারে বইছে ইছামতী, মৃন্ময়ী যেন তার স্পষ্ট কলধ্বনি শুনতে পাচ্ছে। যদি ভেসে যেতে পারতাম সেই স্রোতে। বিপুল অন্ধকারে স্নিগ্ধ জলের ধারা, শীতল বাতাস। ডান-হাতে জল কাটলে সবুজ দিগন্ত, বাঁ-হাতে সেই একই সবুজ, একই মৌসুমী বাতাসে এপারে ওপারে অখণ্ড বর্ষা।

শেষপর্যন্ত মা-কে রাঁধতে যেতে হলো। অশোককাননে সীতার মতোই চুপচাপ বসে থাকে মৃন্ময়ী। নিচে নোংরা বিছানায় এবং তার পাশে চটের বস্তা বিছিয়ে বুড়িটা ঘুমোয়। মৃন্ময়ী তাকিয়ে থাকে, এক সময়ে হাই ওঠে, ঘুম পায়। তারপর রাত আরও গভীর হলে, খাওয়াদাওয়ার পর সেই সদরের ঘরে ডাক পড়ে। ঘরের জানালা থেকে বাইরের দিকে তাকিয়ে স্থির বসে ছিলেন বড়দা। জানালা থেকে ওপারের আলো দেখা যায়। সারারাত ধরে আলো জ্বলছে ওদিকে—বর্ডার চেকপোস্ট। চৌকিদারী হাঁকের মতো

হুঙ্কার আসে ওপার থেকে, এপারে বর্ডার সিকিউরিটি ফোর্স, রাইফেলের ট্রিগারে আঙুল বাজিয়ে হিন্দীগানের শিস্ দেয়, পাল্টা জবাব হাঁকে। আর অন্ধকারে গা ঢেকে গোপন পথে কারা আসে? নিশাচর মানুষেরা, মানুষ-পাচারের দালালরা, চোরাইচালানের কুৎসিত মানুষগুলি। এর মধ্যে মায়েরাও আসেন, পিতারা, সন্তানের কাছে, সন্তানের খোঁজে। মৃন্ময়ী মা আর বড়দাকে দেখে। ঘুম নেই, কথাও নেই, যেন পৃথিবীতে বলার মতো কোন কথা নেই কারও, সব বলা হয়ে গেছে। এখন শুধু ইছামতী বইবে ধীরে, গাঢ়ঘনজমাট অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে রাত গড়িয়ে যাবে, আর সময়—দীর্ঘ একুশ বছরের বয়সগুলির সিঁড়ি একে একে ভেঙে এখন শুধু এই ভয়াবহ রাতের প্রতিটি মুহূর্তকে আঙুলের কড় দিয়ে গোনা। গলা পর্যন্ত উৎকণ্ঠা—দুর্ভাবনার বিষ—ওরা আসছে। ঘড়িতে আড়াইটা, হয় তো আরও রাত হবে। রক্তচক্ষু সীমান্ত পুলিশ আর কালো-চাদরে ঢাকা বীভৎস মানুষগুলি ছাড়া যখন এপারে ওপারে আর কেউ জেগে নেই, সেখানে জাগবেন ইতিহাসের অধ্যাপক বড়দা, মা, আর আমি—মৃন্ময়ী ভাবল, আর জাগবে ওরা, অন্ধকারের নদীতে সীমানা পেরিয়ে ওরা আসবে।

বাইরে কী এক কর্কশ ডাক, পাখি। মা বললেন—'কালপেঁচা'। হৃৎপিণ্ডের ভিতরে গিয়ে খামচে ধরল শব্দটা। ভয়ে শিউরে উঠল মৃন্ময়ী, বড়দাও আৎকে তাকালেন। শুধু মা জানেন, কালপেঁচার ডাক। মা-র অনেক বয়স। বাইরে কাদের চাপা কণ্ঠস্বর, দরজায় খিল-তোলার শব্দ, মরচে-পড়া পেরেকের চিৎকার? বুকের জ্বালাটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল, সেঁধিয়ে আসছে দেহ। গভীর উৎকণ্ঠায় বড়দা নিঃশব্দে উঠলেন, এগোলেন, মা এগিয়ে এসে মৃন্ময়ীর পাশে দাঁড়ালেন—'এই দেখ্ আমি আছি, সঙ্গেই আছি, ভয় কী মা তোর?' তক্তপোশের উপর পা ঝুলিয়ে বসে, মা-কে জড়িয়ে মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে চোখ বুজে থরথর করে কাঁপতে লাগল ভিতরে ভিতরে। লণ্ঠনের লালচে আলোয় আধো-অন্ধকার এ ভৌতিক ঘরটায় তোমাকে ছুঁয়ে থাকতে দাও মা। মায়ের বুকে এলোপাথারি নাক ঘসে ঘসে শেষমুহূর্তে একটু শক্ত হতে, বুক বাঁধতে চাইল মৃন্ময়ী।

ওরা এলো। প্রথম সেই অদ্ভুত ভয়ঙ্কর মানুষটা, তার সাঙাত আশ্রয়দাতা জেলে-বুড়ো। তারপর একজন প্রৌঢ়া নারী, সাদা সেমিজের উপর কালো রেলপাড় সাদা-শাড়ি, রোগা বিষণ্ণ মুখ, টিকোল নাক, ভাঙা চোয়াল,

কপালে দগদগে সিঁদুর। পিছনে বৃদ্ধ, হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, সস্তা কাপড়ের ঢোলা-হাতা পাঞ্জাবি, রুগ্ন, কালো, যেন পৃথিবীতে পাওনার চেয়ে অনেক বেশি দিন বেঁচে থেকে এখন ক্লান্ত। ওরা দরজার চৌকাঠে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে। মৃন্ময়ী মায়ের বুকে মুখ লুকিয়ে আড়চোখে দেখছিল। মা ওর থুতনি ধরে জোর করে মুখ তুলে ধরলেন, নিজের পিঠ থেকে ওর হাত দুটো ছাড়িয়ে নিয়ে সরে দাঁড়ালেন। সেই অদ্ভুত বিদ্ঘুটে লোকটা হঠাৎ তীব্র টর্চের আলো ফেলল মুখের উপর, অসভ্যের মতো। চোখ ঝাঁঝিয়ে উঠল, বুজে এলো, সমস্ত মনপ্রাণ কেন্দ্রীভূত করে স্থির শক্ত হয়ে সোজা হয়ে বসল মৃন্ময়ী। মনে হলো, এখন সে আস্তে আস্তে সত্যি যেন পট হয়ে উঠছে, লক্ষ্মীর পট। আধো-অন্ধকার এই রহস্যময় ঘরটায় সবাই অপলক তাকিয়ে আছে, ওকে দেখছে। এ কী, এত স্তব্ধতা কেন? এতটুকু শব্দ নেই কোথাও। বাইরের বাতাসও কী বন্ধ হয়ে গেছে, ইছামতীর স্রোত? পৃথিবীতে সত্যি কী সব কথা শেষ? অনেক দূর থেকে এসেছে ওরা, বাংলাদেশের মাঠনদী ভেঙে, ঢাকা-রাজধানী থেকে, আমরাও অনেক দূর থেকে, বাংলার বুকের উপর দিয়ে, কলকাতা, রাজধানী কলকাতা—আমরা এসেছি এই ফাটলটার কাছে। তবে এই নীরবতা কেন? দম বন্ধ হয়ে আসে। সত্যি যদি মা—তবে কান্না নেই কেন? একুশ বছর ধরে যে-কান্নাটা জমেছে বুকের ভিতর। ওরা সবাই কি পাথর হয়ে গেছে! নিজের ভিতরে কান্নাটা গুমরোতে থাকে, ঠোঁট দুটো কাঁপে, মুখের নিশ্বাসে কান্নাকে চেপে রাখার যন্ত্রণায় বুদ্বুদের শব্দ, চোখের নিচে নাকের দু'পাশের ঢালুতে অসহ্য যন্ত্রণা। মৃন্ময়ী চোখ খোলে। চমকে ওঠে, এক-বিঘতের মধ্যে লণ্ঠন উঁচিয়ে-ধরা, একেবারে মুখোমুখি, প্রায় নাকের সঙ্গে নাক ছুঁয়ে আরেক মুখের ছবি—কে? রক্তের স্রোতে হল্‌কা লাগে। হতবাক বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে, চোখে চোখ, পলক নেই, দর্পণে এ কার মুখ? নিজেরই মুখের ছবি। সেই রোগা বিষণ্ণ মুখ, টিকোল নাক, ভাঙা-চোয়াল, কপালে দগদগে সিঁদুর। কিন্তু মুখের আদলে এ কার প্রতিবিম্ব? ঠিকুজি-কোষ্ঠী নয়, রক্তের পরীক্ষা নয়, উরুতে জড়ুলের চিহ্ন নয়, সাক্ষ্যপ্রমাণ অনাবশ্যক সব—আমি, আমারই অতীত! মৃন্ময়ী সারা দেহে নিজের উত্তর শোনে—মা, আমার মা। কিন্তু পাথরের মতো শক্ত হয়ে ওঠে শরীরটা, তীক্ষ্ণতায় তাকিয়ে থাকে। ওদিকে থুতনিশুদ্ধ ঠোঁট কাঁপছে, ছলছল উপচে

উঠছে চোখ, লণ্ঠন-ধরা-হাত ঠক্‌ঠক্ কাঁপছে, ভেঙে পড়বে এক্ষুনি। কে এসে লণ্ঠনটা নিয়ে গেল হাত থেকে এবং প্রচণ্ড আবেগে কান্নার হিক্কা তুলে সেই রুগ্নশরীর আছড়ে পড়ল মৃন্ময়ীর গায়ে। মৃন্ময়ীকে দু-হাতে জড়িয়ে কান্না, কান্না, কান্না, একুশ বছরের সঞ্চিত কান্নার হিসেবনিকেশ। এবং সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে মৃন্ময়ীর মনে হলো, একটা স্নিগ্ধ জলপ্রপাতের নিচে দাঁড়িয়ে আছে সে। রক্তে রক্তে শীতল প্রবাহ, প্রসন্ন অবগাহন। ঘরে আরো যারা রুদ্ধবাক দাঁড়িয়ে ছিলেন, মৃন্ময়ী তাদের কারও দিকে তাকাতে পারল না। এমন কি বড়দা, মা-ও না। শুধু সেই বৃদ্ধ, পিতার মুখোমুখি চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইল। অত্যন্ত সন্ত্রস্তভঙ্গিতে এগিয়ে আসছেন বৃদ্ধ, কাঁপতে কাঁপতে, একেবারে গা ঘেঁসে পাশে দাঁড়িয়ে দুটো কাঁপা-কাঁপা হাত প্রসারিত করেও দ্বিধায় স্থির হয়ে গেলেন। বৃদ্ধ হলেও একজন পুরুষমানুষ এবং একটি মেয়ের শরীর! চোখে চোখ রেখে দাঁড়িয়ে রইলেন। স্থিরপলকের উপর দিয়ে সময় বইতে লাগল, সেই হাত এসে মাথায় স্পর্শ পেল, মাথা থেকে কাঁপতে কাঁপতে গলাকাঁধপিঠ ছুঁয়ে কোমর পর্যন্ত নামল। সারাদেহের রক্তে একটা স্নিগ্ধতার ঢল নামছে, আশ্চর্য শিহরন, ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে থাকে মৃন্ময়ী। সত্যি সে পট হয়ে গেছে, মা-লক্ষ্মীর পট। এবং সেই নারী যখন আশ্লেষ থেকে ওকে মুক্তি দিয়ে ওর বুককোমরহাঁটু থেকে গড়িয়ে একেবারে পায়ের কাছে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল এবং সেই পুরুষ, বৃদ্ধ, ওর শরীর থেকে হাত তুলে নিয়ে উবু হয়ে সেই নারীকে তুলতে চাইল, তখনই নিজের মধ্যে আবার নিজেকে ফিরে পেয়ে ছুটে গিয়ে মৃন্ময়ী মা-কে জড়িয়ে ধরল, ডুকরে কেঁদে উঠল, অঝোর কান্না। মা তোমার একুশ বছরের আশ্রয়, মা তোমার একুশ বছরের ভালোবাসা, মা আমার একুশ বছরের বিশ্বাস। কান্নায় শরীর কাঁপছে। অনুভব করে, পিঠে আঁচলের নিচে মায়ের-হাত আদর বুলোচ্ছে। ওপারে কান্না থেমেছে, পিছনে না তাকিয়েও স্পষ্ট বোঝা যায়, হতবাক বিস্ময়ে এপারের দিকে তাকিয়ে আছেন ভুল-মা। মা বললেন—'প্রণাম কর, ওদের প্রণাম কর মিনু…।' সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না মৃন্ময়ী। শুনতে পায়, কাঁপা-গলায় কে যেন বলছেন, বৃদ্ধের কণ্ঠ—'নাম ছিল পারুল, পারুলরাণী মালাকার, পিতার নাম শম্ভুনাথ মালাকার, সাকিন শুভাড্ডা, কেরানিগঞ্জ থানা, ঢাকা সদর, আলিমন গোত্র রাঢ়ী শ্রেণী।' মৃন্ময়ী শোনে,

রক্তের পরিচয়। মা-কে জড়িয়ে ধরে আরও নিবিড় করে। ওপার থেকে, যেন বহুদূর থেকে ভাটিয়ালী—'মাইয়াটারে গোয়ালন্দের ভিড়ে হারাইয়া আর আমরা ভারতের দিকে পা বাড়াই নাই। বাপঠাকুর্দার ভিটা গেল, একটামাত্র বুকের মাইয়া, যদি হেইটাও যায় তবে আমাগো আর ভারতে কাম নাই। পোলা দুইটারে লইয়া ফিরা গেলাম।' কান্নার হিক্কা থামে না। মা আবার বললেন—'প্রণাম কর, ছিঃ প্রণাম কর মিণু, প্রণাম কর ওঁদের।' মৃন্ময়ী শক্ত হয়। সোজা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে, ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে বাইরের অন্ধকারে মিশে যাচ্ছে ওরা। শুধু শেষবারের মতো একবার, আলোর শেষ রেখায় সেই নারীমূর্তিকে আবছা দেখা গেল। তারপরই অন্ধকার, অন্ধকার আর দূরাগত বৃদ্ধের কণ্ঠস্বরে রক্তে রক্তে শিহরণ—পারুলরাণী মালাকার, পিতা শ্রীশম্ভুনাথ মালাকার, সাকিন শুভড্ডা, কেরানিগঞ্জ থানা, ঢাকা সদর, গোত্র আলিমন, রাঢ়ী শ্রেণী।

মধ্যরাতে লণ্ঠনের লালচে-আলোর চারপাশে প্রায়ান্ধকারে আবার সেই নীরবতা। তিনটি আপন-হৃদয় স্তব্ধবাক, তিনজনের উপর দিয়ে সময় গড়িয়ে যায়, ইতিহাসের সময়। মা তক্তপোশে গিয়ে শুলেন আর সেই জানলার বাইরে তাকিয়ে রইলেন বড়দা। ইছামতী বইছে, ওপারে আলোটা জ্বলছে, সারারাত জ্বলবে। ক্লান্ত শরীর টেনে মৃন্ময়ী পাশে গিয়ে দাঁড়াল। মধ্য-রাতের অন্ধকারে পথ খুঁজে খুঁজে কারা এগিয়ে যাচ্ছে ইছামতীর দিকে? কালো জমাট বাঁধা অন্ধকারে মাঝে মাঝে টর্চ জ্বলে উঠছে, দূরে দূরে মিলিয়ে যাচ্ছে, জানলা থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। অন্ধকারে গায়ে কালো চাদর ঢেকে ওরা ওপারে চলে যাবে, ওপারের আলোটার দিকে। মৃন্ময়ী তাকিয়ে থাকে। ওরা কারা! চোখ বুজে একাগ্রভাবে নিজের রক্তের অণুতে পরমাণুতে নিজেকে হাতড়ায়। শ্রীশম্ভুনাথ মালাকার। একটা অন্ধকারের নাম, খুঁজে পায়না। শুভড্ডা গ্রাম, কেরানিগঞ্জ থানা, ঢাকা সদর! পৃথিবীর কোথায় সে দেশ? কতদূরে? এই ফাটলটার ওপারে কোথায় যাচ্ছো তোমরা শ্রীশম্ভুনাথ মালাকার? হঠাৎ একটা হাত এসে কাঁধে জড়ায়। মৃন্ময়ী বড়দার বুকে মাথা রেখে স্থাবর হয়ে ওঠে। নিরাপদ আশ্রয় আর বিশ্বাসের শান্তি। চোখ বুজে আসছে, ঘুম। মনে হলো, স্বপ্নের মধ্যে কে যেন পরম আদরে ওর ভালোবাসার

চামর বুলোচ্ছে সর্বাঙ্গে, যেন স্বপ্নের মধ্যে কার কণ্ঠস্বর—'কাঁদিস নে, কাঁদিসনে মিনু। এরপরও তো পৃথিবীতে বাঁচতে হবে আমাদের। মানুষের বুক থেকে হৃৎপিণ্ড তুলে নিয়ে অন্যদেহে সংস্থাপনের সার্থক অস্ত্রোপচারের যুগে, আমরা, এপারে ওপারে দীর্ঘশ্বাস নিয়েও বাঁচব। বাঁচতে তো হবেই আমাদের। আর আমাদের ইছামতী বইছে। দেখ, দেখ মিনু, ইছামতীর জলে জ্যোৎস্নার আলো…আমরা ফাটলটার কাছে বারবার ফিরে ফিরে আসব, আমরা সবাই, তোর সঙ্গে এই ফাটলটার কাছে, শুধু তোর একার জন্যে নয়, আমাদের সকলের পরিচয়টা জানতে…'

বাইরে ইছামতীর জলে তখন মধ্যরাতের চাঁদ উঠছে। মৃন্ময়ীর ক্লান্ত শরীরে ঘুম।

স্বদেশে সংসারে

এতকাল একভাবে যা-সব ভেবে রেখেছিলেন, শেষপর্যন্ত ঠিক ঠিক সে-রকম ঘটল না।

রিকশ থেকে নেমে কেমন যেন বিমূঢ় হয়ে পড়লেন অবিনাশ। চারুবালার মাজায় বাত। মাকে রিকশ থেকে নামতে সাহায্য করছে পরেশ আর সন্তু। সাড়া পেয়ে বাড়ির দরজায় বাঁশবেড়ার ধার ঘেঁসে সবাই এসে দাঁড়িয়েছে ভিড় করে—ছেলে-বৌ, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনী। ঘিয়ের বয়ম, মুড়ির টিন, কাসুন্দির বোতল, বাকশো-বোচকা কোন কিছুর প্রতি আর তাঁর দায়-দায়িত্ব নেই। স্থিরপলকে বাড়িটার উপর প্রশান্ত চোখ বুলিয়ে মুখগুলির দিকে তাকালেন একবার। পর পর অনেকগুলি মুখ। ওরাও অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। অনেকদূর থেকে দু-জন অতিথি আসবে ওদের বাড়ি। কিন্তু কাউকেই ঠিকমতো ধরতে পারছেন না অবিনাশ। শিয়ালদা ইস্টিশানেও ঠিক এই-ই ঘটেছিল। নিজের ছেলেদেরও ঠাওর করে নিতে পারেন নি। বুড়োবয়সে চোখের-ছানি পড়েছে বলে নয়, আজ কতদিন পরে দেখা! ছেলেরাই ভিড়ের মধ্যে খুঁজে নিয়েছিল ওদের বাপকে, মাকে।

পিছনে মালপত্তর নামানোর হুড়োহুড়ি, রিকশর দাম মেটানোর দর কষাকষি, কোনদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই তাঁর। বাড়ির সামনেই লঙ্কার চারার মধ্যে হঠাৎ একটা করবী ফুলের গাছ। গাছের পাশে দেয়ালের উপর সাদাপাথরে খোদাই করা বড়ো বড়ো কালো হরফে কি যেন একটা লেখা। লাঠিতে হাতের ভর রেখে ঘাড় উঁচিয়ে স্যালুটের কায়দায় কপালের উপর ডানহাতের চার আঙুল রেখে চোখ কুঁচকে শব্দটা পড়লেন—'বলাকা'। বলাকা কার নাম!

ছুটে গিয়ে শাশুড়িকে জাপটে ধরেছে এক বৌ। প্রবল উচ্ছ্বাসে বকবক কি সব বকেই যাচ্ছে চারুবালা। কুঁজো-বুড়ি, বাঁ-হাতে মাজাটা ধরেই আছে সবসময়। তাকে নিয়ে কি ঝক্কিই না পোহাতে হয়েছে এ-দুদিন—ইস্টিমারে,

নৌকোয়, রেলগাড়িতে। এখন নিজেরই কেমন অবাক লাগে ভাবতে, এই বুড়োহাড়ে সব ঝক্কি সামলে সত্যি সত্যি এসে পৌঁছেছেন এখানে। সবই ঠাকুরের ইচ্ছা। পূবদিকে চোখ তুলে সূর্যদেবকে একবার প্রণাম করলেন অবিনাশ। প্রণাম কয়েক শ মাইল দূরে রুদ্ধগৃহে বন্দী করে রেখে আসা চৌদ্দপুরুষের গৃহদেবতাকে।

'বাবা...'

অবিনাশ চমকে তাকালেন।

'আমাকে চিনতে পারছ না?'

পুষ্পাঞ্জলির মতো বৃদ্ধ তার কাঁপা কাঁপা হাতে গভীর মমতায় তুলে ধরলেন যুবতীর মুখ। ফর্সা কপালে দগদগে সিঁদুরের ফোঁটা, সিঁথিতে সিঁদুর। পিছনের দিকে ঘোমটা গড়িয়ে পড়েছে কাঁধে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন অবিনাশ। যেন তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে ওর চোখের-মণি, ভ্রূরেখা, নাকঠোঁট-থুতনি, এমন কি ফর্সা বলেই চোখে পড়ে, নাকের তলায় অস্পষ্ট মৃদু গোঁফের-রেখা পর্যন্ত খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করলেন। চশমার ডাঁটির মতো দু-ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে নামছে দু-পাশে কানের দিকে। সকালে রোদ লেগে ঝলমল। নিজের মুখটাকে আরও নামিয়ে আনেন অবিনাশ—'কে? ছোঁটখুকু না?'

চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না বেশিক্ষণ। মেয়েটার চোখ বুজে আসে—'ঘরে চলো বাবা...'

মেয়েকে বুকের মধ্যে লেপটে নিলেন অবিনাশ। মাথার খোঁপা থেকে পিঠ পর্যন্ত সস্নেহ হাতের প্রলেপ—'যামু মা, যামু। তগো ঘরসংসার দেখতেই না আইলাম অ্যাদ্দিন পর। সেই পয়ষট্টি সালের যুদ্ধ শ্যাষ হইতে না-হইতেই দ্যাশটা যান কেমন হইয়া গেল। বুড়াবুড়ি কোনরকমে বাইচ্যা আছি, দেবুর চিঠি গেল, তর বিয়া। রাইত বারটায় লগ্ন। তর বিয়ার দিন বুড়াবুড়ি সমস্ত রাইত ঘুমাইতে পারি নাই। অন্ধকারে আকাশের দিকে তাকাইয়া থাইকা থাইকাই তর মায় খালি কয়—এখন আমার খুকুরে পাটে তুলল, বুঝলা নি, অনেক লোক খাওয়াইব, ছোট বইন ত? সম্প্রদান করব কে কও ত? দেবু! মধু ঠাকুরপোয় ত কই জানি থাকে? তাইনেরেও নিতে পারে। মায়ের কাম করব কেডা?...' বলতে বলতে একটু থামলেন অবিনাশ। দম নিলেন—'অন্ধকার না মা। মনে আছে, দ্যাশ ভইরা

চান্দের জোছনা আছিল সেইদিন। গোয়ালঘরে সাদা গাইটা ডাকল সেই রাইতেই...

বুকের ভিতর কাঁদছে মেয়েটা। এবার মাথা তুলল—'ঘরে চলো বাবা। সব শুনব...'

'যামু মা, যামু। তগো কাছেই ত আইছি। তগো ঘর, তগো সংসার, তগো দ্যাশ...অসীম কই মা? অসীমবাবা আসে নাই?'

'এসেছেন। সবাই আছে। তুমি চলো...'

মেয়ের কাঁধে হাত রেখে এগোন অবিনাশ। লক্ষ করলেন, তাকে ঘিরে অনেক মানুষ। পাড়াপড়শী অথবা তারই ছেলে-বৌ, মেয়ে-জামাই, নাতি-নাতনী হয়তো-বা। ঝাপসা চোখে সব মুখই কেমন যেন ভেজা কাচে নিজের মুখের মতো।

বাঁশের কঞ্চির বেড়া পেরিয়ে ভিতরে ঢুকতেই দুটো একতলা পাকা দালান, ঘরের মধ্যবর্তী একফালি সরু পথ। চারদিক দেখতে দেখতে এগোলেন অবিনাশ। জানালাদরজা, দরজায় তেলসিঁদুরের ফোঁটা। জানালার ফাঁকে ঘরের ভিতর তক্তপোশের বিছানা, বারান্দায় কাঠের চেয়ার, খাটো টুল। দেড় যুগ আগে, সেই উনপঞ্চাশ-পঞ্চাশ সালে, একবার এসেছিলেন। কী গভীর বন ছিল! রেললাইনের ওপারে শহর—বালী উত্তরপাড়া, এপারে বিস্তীর্ণ বাঁশঝাড়। কো-অপারেটিভের নীল কাগজে সাদা কালিতে রাস্তাঘাট, ঘরবাড়ি, দালানকোঠার প্রস্তাব। জমি দেখতে এসে চন্দ্রবোড়ার পাকানো শরীর দেখলেন পায়ের গোড়ায়। দেবু-পরেশ, জোয়ানমরদ ছেলে, ভয় পেল। এবং ওদেরই জন্য আমজামকাঁঠালবাঁশ-ঝাড়ের দশ কাঠা জঙ্গল রেজিস্ট্রি করে দিলেন। গোখরো-কেউটের গর্ত বুজিয়ে ঘর গড়ুক ওরা।

হুণ্ডিতে টাকা পাঠাতেন। বন কেটে শহর হচ্ছে—চিঠিতে খবর যেতো। 'দুইটি বড়ো ঘরের ভিত দিয়া বাড়ির কাজ শুরু হইয়াছে...' পাটাতনের তলায় লুকোনো সুপুরির পোঁটলার মতো গোপন টাকা...'সতু এই বৎসর পাশ করিতে পারে নাই, যমুনার বয়স বাড়িয়াছে, শ্রীধর মামা একটি প্রস্তাব আনিয়াছেন পাত্রের ভরদ্বাজ গোত্র, পিতা মুন্সীগঞ্জের বড়াইল গ্রামনিবাসী...' মেহেদি-মাখা দাড়ি মুঠোয় ধরে তাকাতেন হামিদ মিঞা, কুতকুতে চোখে বিষ। একেবারে দাওয়ার উপর উঠে এসে পা ঝুলিয়ে বসতেন আতাউল্লা—'অমুদ

পইথ্য দিয়া মানষের রোগ সারাও তবে নিজে ক্যান মুরগিকবতরের মতন ডরে ডরে বাচ কও দেখি ডাক্তার, পোলামাইয়ার লেইগা মন খারাপ লাগে? হেইডা জাইনাই না ভারতে যাও নাই, জননী জন্মভূমিচ্চ...'

সাতচল্লিশ সালটাকে না-মানার নিদারুণ অহঙ্কারে আর যন্ত্রণায় প্রায় দুই যুগের দীর্ঘ কৃষ্ণপক্ষ কাটিয়ে আজ তাঁর জীবনের প্রথম গৃহপ্রবেশ অথবা প্রথম গৃহত্যাগের দিনে শাঁখকাঁসরের ঘন্টা নেই, কিন্তু একটানা নির্জনতায় নিশ্বাস টানার পর এখন তাঁকে ঘিরে অনেক কলরব।

অবিনাশ সত্যিই দম নিলেন। ভিতরের উঠোনে তুলসীতলায় চারুবালাকে দাঁড় করিয়ে ওরা প্রণাম করছে ওদের মাকে। উনসত্তর বছরের অভিভূত বুড়ি। খেই হারিয়ে ফেলছে সবকিছুর। একটাও দাঁত নেই, বকেই যাচ্ছে অনর্গল। আশীর্বাদের হাত তুলে জড়িয়ে ধরছে—হামাগুড়ির নাতি থেকে জোয়ানমরদ নাত-জামাই, বাচ্চা-কোলে ছেলের-বৌ। দুদিন দুরাত ঘুম নেই, অমানুষিক ধকল গেছে শরীরটার উপর। অবিনাশের হঠাৎ মনে হলো, ওই বুড়ির জন্য আর কেউ ভাববার নেই, শুধু তিনি ছাড়া। এবং এখন তাঁকেও গিয়ে দাঁড়াতে হবে পাশে। নতুন বর-কনের মতো। ওরা বরণ করে ঘরে তুলবে ওদের বাবাকে মাকে। যখন কথা ছিল, ওদের ঘরে ঠাকুরের আসনে ফটো হয়ে বেঁচে থাকবে ওদের বাপ-মা।

'বড়োবৌদি বাবা...'

'কে, কে জবা! জবা মা...' গলায় আঁচল জড়িয়ে হাঁটু ভেঙে প্রণাম সেরে মাথা তুলতেই কাঁপতে কাঁপতে নরম শরীরটাকে বুকে তুলে নিলেন অবিনাশ—'তোমার হাতটা মা! আঙুলটার লেইগা কোন অসুবিধা হয় না তো আর...'

সবাই হাসে। সাত-আঁতুড়ের পর, মেয়ের-ঘরের-নাতির মুখ দেখেও জবা বুড়োশ্বশুরের বুকে লজ্জা পায়। আঁচলে ডানহাত ঢাকে—'আপনার মনে আছে বাবা...'

'মনে থাকব না? কও কি?' গলা উঁচিয়ে সামনের সাদা দেয়ালের দিকে তাকালেন অবিনাশ। এখনও তাঁর বুক কাঁপে ভয়ে। গোলাঘরের পাশে ঢেঁকিতে পাড় দিচ্ছিল নমশুদ্দুরের দুই মেয়ে। লক্ষ্মীপুজোর আতপ। ঢেঁকির গৈলায় ধান জোগাচ্ছিল বড়ো-বৌ। ভরদুপুর। কাঁচা বয়স। চোখের পাতায় ঢুলুনি লেগেছিল বোধ হয়। ডানহাতের আঙুলের উপর

পড়ল লোহার নাল। গলগল রক্ত, যন্ত্রণা, চিৎকার। এল-এম-এফ ডাক্তার অবিনাশ ঘোষের সাধ্যি ছিল না ভাঙা শাপলা-ডগার মতো নুলো, প্রায় দু-ফাঁক আঙুল জোড়া লাগায়। তখন মাঠখাল থইথই করছে জলে। নৌকো ভাসিয়ে আনা হলো শহরে। ঢাকা মিডফোর্ট হাসপাতালে তখন বড়োসার্জেন স্মিথসাহেব। মাত্তর আঠারো-উনিশ বছর বয়সে বড়োবৌর ডানহাত গেলে সংসারই যে অচল। আদরে হাত বুলোন অবিনাশ— শুধু তুমি, তুমিই তো আমাগো চিন মা। গত পচিশ বছর তোমাগো ফোটোর দিকে তাকাইয়া দিন কাটাইছি। আমার ঘরের লক্ষ্মী, হ, তোমার নামও তো লক্ষ্মী…'

'আমি ভুলে…' জবা হাসে।

'ভুইল্যা গেছ। হ, আমরা ত অনেক কিছুই ভুইল্যা গেছি। তোমার শাশুড়ির খুড়শ্বশুরের ঘরের ভাসুরের নাম আছিল লক্ষ্মীপদ…' পায়ের পাতায় কোমল একটা ছোঁয়া পেলেন হঠাৎ—'কে?'

'জয়ন্তী…'

'মেজোবৌদি বাবা…'

বাঁ-হাত বাড়ালেন অবিনাশ। থুতনিতে আঙুল ছুঁয়ে দেখলেন নববধূর মুখ। ত্রিশ-বত্রিশ বছরের যুবতী—'পরেশ! পরেশের বৌ? সতীসাবিত্রী হও মা। সুখে থাকো। কে?'

'মেজো জামাইবাবু…'

'যমুনা! যমুনা কই?'

'এই তো বাবা।'

'ভালো আছস মা?'

'ভালো বাবা'

'তর পোলামাইয়া…'

'এই তো সবাই। সব এসেছে।'

'আমার দিদি কই বৌমা? আমার দিদিমণি?'

'দাদু…'

'প্রণাম কর ডলি, এদিকে এসো বিপুল…'

মাটি থেকে হামাগুড়ির ছুট্টু শিশুকে কোলে তুলে নিতে উবু হয়ে টানটান দু-হাত বাড়ালেন অবিনাশ। আচমকা আটকে গেল হাত। কোমর থেকে

হাত বুলিয়ে মাথাটা খুঁজে পেলেন বুকের কাছাকাছি—'কতবড়ো হইয়া গেছস তুই দিদি। পালোয়ান দাদুটাও গেছিল ইস্টিশনে। অরেও বুঝতে পারি নাই…'

'ভলির বর বাবা, বিপুল…'

'অ…' খুশিতে ভরপুর অবিনাশ আদরে কাছে টানলেন—'আরে বেইমান তর সইল না বুঝি। বুড়াটার লেইগা দুইটা দিন থাকতে পারলি না। জুটাইয়া লইলি…'

খুশির খই ফোটে তাঁকে ঘিরে। নাতনী-নাতজামাইকে বুকে জাপটে অবিনাশ স্থবির হয়ে যান। ঘোলাটে চশমায় চোখ তাঁর উর্ধ্বে স্থির হয়ে থাকে। ভোটে-জেতা নেতার মতো তাঁকে ঘিরে স্তাবকের হুড়োহুড়ি। সত্যি কি স্তব! প্রতিটি মুখ লক্ষ করেন তীক্ষ্ণতায়। জীবনবীমার হাতদুটির মতো কাঁপা কাঁপা হাতে প্রতিটি মুখের-প্রদীপ ধরতে চান। ছয়-ছেলের পাঁচ-বৌ, তিন-মেয়ের তিন-জামাই, অসংখ্য নাতি-নাতনীর ডালাপালা ছড়ানো বিশাল বটগাছের ডগায়, আরামে দোল খাবার সুখ। শিরশির শিরশির করে কেঁপে কেঁপে উঠছে পায়ের-পাতা। বর্ষায় খালপুকুর ডুবিয়ে জলের স্রোত উঠে আসছে ডাঙায়, পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন অবিনাশ। ঠাণ্ডা জলের ধারায় মাছেরা পায়ের-পাতা ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়। শিহরণ জাগে—'সেজোবৌদি বাবা…', 'ন-বৌদি', 'পরেশ ঠাকুরপোর বড়ো ছেলে দ্বিজু, বি. এ. পরীক্ষা দেবে এবার…', 'ছোট খুকুর বর অসীম', 'সতু ঠাকুরপোর মেয়ে সোনা', 'বড়দির ছেলে খোকা আর খোকার-বৌ বাবা', 'ন-ঠাকুরপোর ছেলে সুবোধ —টেন ক্লাশে পড়ে', 'রাঙা ঠাকুরপোর বৌ কল্যাণী, ওর ছেলের মুখে-ভাত হলো এই সেদিন…' বর্ষার বৃষ্টি, খালবিলনদীপুকুর সব একাকার। ঠাণ্ডা জলের স্রোত পায়ের-পাতা ছাপিয়ে, হাঁটু ছাপিয়ে, কোমর ছাপিয়ে, বুক ছাপিয়ে, মাথা ছাপিয়ে আছাড় মারে ঘরের উঠোনে। নাও-ডিঙি ভেসে উঠল জলে। গলুই নাচে ঢেউয়ে। শীতল জলের অন্তঃসলিলে ডুবে যাচ্ছেন অবিনাশ। শাপলা ফুলের মতো গলা উঁচিয়ে চাঁদসুয্যি দেখছেন। দীর্ঘদিনের বঞ্চনা থেকে এত সুখ তিনি জমিয়ে রেখেছিলেন ব্যাঙ্কে। বার্ধক্যের ভোগ!

'ঘরে গিয়ে বসুন। বুড়োমানুষ; অ্যাক্সুর থেকে এসেছেন ··'

কপট-ক্ষোভে চোখ পাকিয়ে নাতজামাই-এর দিকে তাকালেন অবিনাশ—

'বুড়া! হ, বুড়ামানুষ! খুব ত পালোয়ান দেখতাছ বাবুরে। এই হেইদিনও নাও বাইয়া পাইনা পশ্চিমদি টেঁঘইরা নৈলন্তা রুগী দেখতে গেছি। পারবানি আমার লগে হাইট্যা? বাজি ধরবানি বুড়ার লগে··'

'তা হোক, তুমি ঘরে গিয়েই বোসো বাবা, এই তোমাদের ঘর। তুমি না থাকবে···'

'আমাগো ঘর!' প্রাণের আবেগে উচ্ছল অবিনাশ টাল সামলাতে ধরে ফেললেন পাশের দেয়াল। জাপটে ধরে নাতনী-নাতজামাই সন্ততিরা। যেন কুমোরবাড়ি থেকে ঠাকুর এসেছে ঘরে, বাঁশের মাচায় বেঁধে তাকে যথাস্থানে বসাবার শ্রম।

চৌকাঠ ডিঙোবার মুখে হঠাৎ একটা চেয়ার-রাখার শব্দ হতেই সবাই চমকে তাকাল।

'আপনি এখানেই বসুন একটু···'

'এ-সব কী হচ্ছে বৌদি···' ছোটখুকুর ঝাঁঝাল গলার স্বর।

'না, বড়ো ট্রাঙ্কটা বের করে নিই ঠাকুরঝি···'

'সে তোমাকে এক্ষুনি নিতে হবে! পরে করলে হতো না···তোমরা···'

'থাক্ মা, থাক্···' মেয়ের কাঁধেই হাত ছিল, শান্তভাবে পিঠে চাপড় মারলেন অবিনাশ। চেয়ার রেখে সবুজ-লুঙ্গি, হাতকাটা জালি গেঞ্জি, লম্বা-লম্বা চুল-জুলপির একটা তাগড়াই ছোঁড়া ঘরে গিয়ে ঢুকল। সঙ্গে আরও দুজন। স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন অবিনাশ। সামনেই পটের ছবির মতো ঘোমটাটানা নববধূ। শাড়ির রঙ-এই চিনলেন, একটু আগে প্রণামের ভিড়ে ছিল। ঠাওর করতে পারছেন না, কে। কার বৌ।

'আপনি একটু বসুন বাবা। ঘরটা সাজানো হয়নি এখনও···'

'পচিশ বছরে বড় খাসা সংসার সাজাইছ ত বৌমা···' অবিনাশ দীর্ঘশ্বাসে হাসলেন। এগোলেন চেয়ারটার দিকে। তাকে বসতে হবে। সত্যি ক্লান্ত।

বহুরূপীর খেলা শেষ। কুমোরবাড়ির ঠাকুরের মতোই স্থবির বসে থেকে লক্ষ করলেন, ভক্তদর্শকদের ভিড় পাতলা হয়ে যাচ্ছে তাঁকে ঘিরে। পায়ের-ধুলো কুড়োবার প্রণামীটুকু মিটিয়ে এতদিনের নাম-শোনা অপরিচিত মুখগুলি, ঝাপসা চোখে যে-মুখগুলিকে এখনও ভালো করে চিনে উঠতে পারছেন না, অথচ নিজেরই বংশস্রোত—ছেলে-বৌ, অসংখ্য নাতি-নাতনী,

নাতজামাই আস্তে আস্তে নিজেদের কাচ্চাবাচ্চা নিয়ে সরে সরে যাচ্ছে। সরে যাবার একটা অস্বস্তিতে পেয়েছে ওদের। বাচ্চাটা হিসি করে দিলো' গায়ে, শাড়িটা বদলাতে হবে এক্ষুনি। ছেলেটা কাঁদল, ধমকের সঙ্গে ওকে থাপ্পর। আঁ করবে মেয়েটা, ওকে নিয়ে পায়ের আংটায় বসাতে হবে, বিচ্ছিরি অভ্যেস হয়ে গেছে দাঁড়াবার পর থেকে। কুটনো কাটতে কাটতে উঠে এসেছে কার বৌ, কাত্-করা বঁটিটা পড়ে আছে ঘরে; ছেলেপুলের সংসার। কার বৌ আবার উনুন সাজিয়েই ছুটে এসেছে শ্বশুর দেখতে, বেলা চড়ে যাচ্ছে—ঘোমটার ফাঁকে কৈফিয়ৎগুলি পরপর উঠছে পড়ছে। নির্দিষ্ট কোন উদ্দেশ্য নেই, শ্বশুরমশাই বলে একটা মানুষ যখন এসেই পড়েছে, তার কাছে বিনীত হবার একটা সাধারণ নিয়ম আছে সংসারে।

জোয়ানমরদ তিনটে ছেলে কঁকিয়ে-কঁাকিয়ে হাঁপিয়ে দু-পাশের আংটা ধরে টেনেহিঁচড়ে বের করছে একটা মস্তো ভারি ট্রাঙ্ক। লাল সাদা ডুরে-শাড়ির সেই বেহায়া-বৌ নিজে তদারক করছে দাঁড়িয়ে থেকে। একহাত ঘোমটায় মুখ ঢাকলেই সব হয়! মাথার স্নায়ুতে, শিরায় শিরায়, বুকের ভিতরে একটা চাপা রাগ দানা বেঁধে উঠছে। অস্থির হয়ে উঠলেন অবিনাশ। অজানা-অচেনা মেয়ে, নিজের ছেলে-বৌ! ভালো করে মুখটাও দেখা হয়নি এখনও। নইলে…

বড়োবৌ, ছোটখুকু, নাতজামাই ঝিম মেরে গেছে। ওদিকে বারান্দার কোণে কিছু দুধের-বাচ্চা দাঁড়িয়ে থেকে জয়-বাংলার বুড়ো দেখছে গোল গোল চোখে। বাবড়ি-চুল, লম্বা-জুলপির অদ্ভুত কিছু ছেলে পেন্নাম সেরে কাছা-কাছিই ছিল এতক্ষণ, এখন দূরে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে। মাবোনদের পাট চুকলেই কাছে আসবে—কি রকম সব চলছে ওখানে? কতো ঘর হিন্দু আছে আপনাদের বাঘের গ্রামে? যুদ্ধের সময় কি করছিলেন? ইয়াহিয়ার সৈন্যরা যায় নি? রাজাকাররা আসলে কী বলুন তো? যুদ্ধের সময় আকাশবাণী শুনতেন? গুষ্টির পিণ্ডি। ইষ্টিশন থেকে গোটা রাস্তায় জ্বালিয়েছে দেবুর বড়োছেলেটা। ইচ্ছে করছিল, কষে লাঠিপেটা করেন রাস্তার উপরই। কিন্তু পারেন নি। বড়োছেলের-ঘরে প্রথম নাতি। দাদুর হাত ধরে সেই শিশু যে-উঠোনে হামাগুড়ি থেকে প্রথম হাঁটতে শিখেছে, সেখানে ঝোপজঙ্গল, ফণিমনসার কাঁটা গজাতে দেননি পঁচিশ বছরে, খানসেনা আসে নি। কিন্তু এখন। আশি বছরের বুড়ো শরীরে ঢেউকে

ঢেউয়ে গলুই-এর নাচন থেমেছে। মরামাছের চোখের মতো ঘোলাটে চোখে নিজেরই বংশস্রোতে টগবগে জ্যান্ত মানুষ দেখেন অবিনাশ। খিঁচিয়ে ওঠেন হঠাৎ—'যাও কই বৌমা?'

ওরা ট্রাঙ্ক নিয়ে সরে যাবার পর, ঘোমটাটা সিঁথি পর্যন্ত তুলে দু-পা বাড়াতেই বাধা পেল বড়ো-বৌ—'ভাতের হাঁড়িটা সেই তখন বসিয়ে এসেছি বাবা, লেগে যাবে…'

'ভাতের-হাড়ি লাগব! কারে বুঝাও বৌমা? যেই সংসারে চল্লিশ-পঞ্চাশডা পাত পড়ে বেলায়, একপুকুর জল লাগে যেই সংসারের হাড়িতে, কইলেই হইল লাইগ্যা যাইব! হু…' দেশান্তরযাত্রায় এখনও বিশ্রাম পানান অবিনাশ। শরীরে ক্লান্তি—'মাইয়াটা য্যান কার বৌ কইলা…'

'মেজো-ঠাকুরপোর…'

'কার পরেইশ্যার!' অবিনাশ কপালে ভাঁজ তুললেন—'মাইয়া দেখতে গেছিল কেডা? কার পছন্দ?'

ছোটখুকু বলে—'সোক আজকের কথা নাকি। সেই কবে, আমি তখন ফাইভে-না সিক্সে পড়ি, মেজদার বিয়ে হলো…'

'হু… বাক্সটায় কী আছে? সোনাদানা হীরামুক্তা সব বাক্স ভইরা যৌতুক দিছিল বুঝি বাপে? তয় তোমরাই ক্যান অর ঘরে আমাগো থাকনের বেবস্থা করলা। আর ঘর আছিল না তোমাগো?'

'ও ছেড়ে দিন বাবা। ও একটু কেমন কেমন, ও সব ঠিক হয়ে যাবে…'

'হ, এতকাল ইস্তক সবই ত ঠিকঠাকই করছ। তোমাগো ঘরে পা দিয়াই ত দেখতাছি…'

'না, না বাবা, কাল রাত পর্যন্ত ঠিক ছিল তোমরা উত্তরের-ঘরে উঠবে। কিন্তু আজ সকলেই হঠাৎ সকলের-মত বদলে গেল। তাড়াতাড়িতে…'

'তব্ বাপ্‌কাকাগো হঠাৎ মত বদলাইয়া গেল! ক্যান্ ভাই-এ ভাই-এ লাঠালাঠি হয় নাই? মাথা ফাটে নাই কারও…'

সবাই চমকে ওঠে। ঘাড়গর্দানশিরদাঁড়ামাথা সোজা রেখে চেয়ার ছেড়ে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলেন আশি বছরের বুড়ো। শক্ত কব্জিতে লাঠিটা বাগানো—'বুঝছি, বুঝছি, হগ্‌গল কতা তোমরা আমাগো জানাও নাই বৌমা, জানাও নাই। ভাবছিলা, খানস্যানারাই তো কোপাইয়া বুড়াবুড়িরে জলে ভাসাইয়া দিব। তাগো আর জানানের কাম কী?'

'কি বলছ তুমি বাবা ?'

'হ, হ মিছা কই নাই। কি মিছা কইতাছি—' ঝকমকে তরুণ নাতজামাই-এর দিকে হঠাৎ ফিরে তাকালেন অবিনাশ।

অতর্কিত আক্রমণের মুখে দিশেহারা নাতজামাই—'না, না, তখন আমরা ভীষণ ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম আপনাদের জন্যে। বিশ্বাস করুন, শরণার্থী শিবিরে শিবিরে অনেক খোঁজ করেছি, যদি কোন খবর পাওয়া যায়। ছোট কাকার সঙ্গে আমি নিজে গিয়েছিলাম বাংলাদেশ মিশনে . '

'পাও নাই ?'

'আজ্ঞে না…'

'এখন দেখতাছ না তারে ?' ক্রুদ্ধ উত্তেজনায় কাঁপছেন অবিনাশ—'সাতচল্লিশ সালে উদ্বাস্তু হয় নাই তোমার শ্বশুরশাশুড়ির মতন, পরে শরণার্থীও হয় নাই, তারে কি কইবা এখন ? কোন্ শব্দ বানাইয়া রাখছ !'

তীব্র ভর্ৎসনার মুখে বংশস্রোত ঝিম মেরে যায়। এবং ঝাঁকুনিতে হ্রস্ব-ই-কারের মাথা থেকে লাঠির গলাটা অবিনাশ আঁকড়ে ধরলেন শক্ত মুঠোয়। চাবুক কিংবা তরবারির মতো। তারপরই মাথা উঁচিয়ে খাড়া পায়ে ঘরের ভিতর ঢুকলেন তেড়েফুঁড়ে। নদীর ধারে ধারে কাশগুচ্ছের মতো হাওয়ায় উড়ছে মাথাব নরম চুল, খোঁচা খোঁচা দাড়ি, চামড়ায় চামড়ায় শিথিল কুঞ্চন। ভিতরে ঢুকেই স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ইঁটের উপর বসানো পুরনো তক্তপোশে গুটোন বিছানা, তেলচিটাচিটে তোশক, ছেঁড়া পাটি, একদিকে দেয়ালের-তাকে ঠাকুরের-আসন, দেয়ালে-দেয়ালে রঙিন ক্যালেণ্ডার, ফটো, চেনাঅচেনা মুখের সারি। জোড়াপায়ে দাঁড়িয়ে সার্চলাইটের মতো চারদিকে মাথাটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ভালো করে লক্ষ করেন, বর্ষার জল চুইয়ে চুইয়ে ছাতা পড়েছে মাত্র বছর-কুড়ির নতুন বাড়ির দেয়ালে। বুক-কাঁপানো একটা দীর্ঘশ্বাসে কিছুক্ষণ চোখ বুজলেন—এরা ঘর গড়তে জানে না। অথচ…খোলা জানলার আলোয় পায়ের কাছে একটা মস্তো চিড় দেখলেন মেঝেয়, বুকের ভিতরটা দুমড়ে-মুচড়ে উঠল…অথচ পাটাতনের তলায় লুকোন সুপরির মতো গোছা গোছা টাকা। একবার দুবার নয়, একাদিক্রমে অনেক বছর…

টলতে টলতে তক্তপোশে এসে বসলেন। ঘরে পৌঁছে ছেলেরা আসছে না কাছে, প্রণামী মিটিয়ে যে-যার মতো সরে পড়েছে সবাই। কোথায়

একটা মস্তো ফাঁকি। আস্তে আস্তে চোখ তুলে তাকালেন। দেখলেন চারদিক। আরও ঘন হয়ে গা লেপটে দাঁড়িয়েছে ছোটখুকু, বড়-বৌমা। বাইরে জানলায় জানলায় এখনও উঁকিঝুঁকি। জয় বাংলার বুড়ো, চৈত্তিরমাসের সঙ্। ক্লান্ত শরীরে নিশ্বাস ফেললেন।

পিছনের জানলা দিয়ে তাকালে ঠিক এমান উঠোনটা চোখে পড়ত। উত্তরের-ঘরের পাশে ঢ্যাঙা নারকেল গাছটার ছায়া তুলসীমঞ্চে পড়তেই শিশিবোতলের ছিপি এঁটে গোছগাছ শুরু করত হুমায়ুন কম্পাউণ্ডার। গরিব চাষীজেলেমাঝি রোগাঁটোগাঁও আর থাকত না এত বেলা অবদি। কিন্তু নিজে উঠতে পারতেন না কিছুতেই। পাইন্যার হাট থেকে ঘরে ফেরার পথে একবার আসবেনই আতাউল্লা। উইল্যাকালে ছাতা-মাথায় মাঠ ভেঙে হেঁটে, বর্ষায় জলে জলে নৌকায়। তার জন্য ঘরের কোণে আরামের জোগান রাখতেন অবিনাশ। হুঁকোকলকেটিকা, দা-কাটা কড়া তামাক। আতাউল্লা প্রথমই ঘরের কোণে হাঁটু ভেঙে বসে তামাক সেজে সামনের বেঞ্চিতে এসে বসতেন হুঁকো-হাতে।

'মুখডা কেমন য্যান ব্যাজার ব্যাজার লাগে ডাক্তার!'

'হু, শ'রের যা খবর, দ্যাশ গেরামে কি থাকন যাইব!'

'যাইবা কই?'

অবিনাশ চুপ করে যান। গুড়গুড় তামাক টানেন আতউল্লা। হুঁকোর খোলে জলের শব্দ, ধোঁয়া, মৃদু গন্ধ।

'কি হইল, কিছু কও না ক্যান মিঞাবাই?'

'কি কমু? দ্যাশডারে অরা কোরবানি করল, নিজেগো সংসারডারে তোমরা জবাই করলা...'

'হেই কতা আর ক্যান কও? হেই ত অনেকদিনের কতা। ভুল করছি।'

'হেই আমি জানি না। তবে এইট্টা বুঝি ডাক্তার, নিজেরে দুইখান কইরা বাচন যায় না।'

'কি কও!' দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়ে অবিনাশের কপালে।

হাতের-তেলো দিয়ে থুতু মোছেন আতাউল্লা। তোতোজল ঢুকেছে মুখে। উঠে গিয়ে ওয়াক-থু থুতু ছোঁড়েন জানলার বাইরে—'কই, হামিদ মিঞারা মিছা কয় না। সাচা কতাই কয়...'

'কি কইলা মিঞাবাই? তুমি! তুমিও...'

'তোমাগো মরণ তো তোমাগো নিজের মধ্যেই ডাক্তার। কে তোমাগো বাচাইব। আনিস কয়, মিছা কয় না…'

'আনিস কয়? আর কি কয় আনিস!'

'ডাক্তারখানার উপরে যতই চাদতারার ফালেগ উড়াও ডাক্তার, পোলামাইয়ার লেইগা পরানডা কান্দে না তোমার? তাগো ভাল চাও না?'

'হেইডা তুমি কি কও?'

'হালার পুত হামিদ তোমারে গুপ্তচর কয়।'

'হ…' স্বজনহীন স্বদেশে বন্ধুর দিকে সংশয়ে তাকান অবিনাশ। বুক ঢিপ ঢিপ করে। বাইশ-তেইশ বছরের একটানা নিঃসঙ্গতায় বুকে শুধু ভয়ের বাসা—'সত্য কথাই কইছ তুমি।'

'কোনডা?'

'ওই যে কইলা, নিজেরে দুই ফালা কইরা বাচন যায় না…'

'দুই ফালা করলা ক্যান। হেই ত তোমাগো ভুল হইছে।'

'ভুল! কিসের ভুল!'

'পালাইয়া বাচন যায় ডাক্তার, কিন্তু যারা পালায় না তাগো মাইরা বাচতে হয়। তোমাগো বেবাক লোকে পোটলাপুটলি বাইন্ধা পালাইল আর জলের দামে জায়গাজমিঘাড়গরুনাওপুকুর কিন্যা, বেদখল কইরা হামিদ মিঞা নবাব হইয়া গেল। হগ্‌গল লোকে থাকলে একলগে বাচতাম, একলগে মরতাম, লড়াই কইরা সুখদুঃখ ভাগ করতাম…'

'কও কি মিঞাবাই, আইজকাইলের পোলাপানেরা বোঝে না, হেই কতা তুমিও কও মনে লয়!'

হুঁকোর মাথা থেকে কলকেটা নাকের ডগায় নামিয়ে হাসতে হাসতে আঙুল টিপে আগুন ঠিক করেন আতাউল্লা—'হ, হ, হেই কতা কি ভুলন যায়। হেই হগল কতা কি তখন আমিও জানতান নাকি ডাক্তার! আনিস তখন কই! করিমের মা-ডা মলল, ছোটবিবিরে নিকাই করি নাই তখনও…'

বিষণ্ণ অবিনাশ। হঠাৎ বললেন—'হ, তোমার পোলাডা বড় ভালো। বাইচ্যা থাকুক…

'নসিবের গুণ কও, তোমার পোলা হইয়া জন্মায় নাই।'

'ক্যান, হেই কতা ক্যান কও?'

'সংখ্যালগু হইত…' লুঙির উপর হাঁটুতে চাপড় মারেন আতাউল্লা। অট্টহাস্যে দিলখুশ—'কি কও ডাক্তার! মিছা কইলাম!'

'বাবা…'

দেয়ালের ফটোর দিকে অপলক তাকিয়ে ছিলেন অবিনাশ। বড়বৌমার ডাকে হঠাৎ নাড়া খেলেন। গলা উঁচিয়ে খুব শান্তভাবে তাকালেন মুখগুলির দিকে—'নারু কই বৌমা? হগ্‌গলেরেই দেখলাম, কই নারু ত আইল না। ইস্টিশানেও যায় নাই। দেবুরে জিগাইলাম, কয় ঘরে চলেন…'

বুকের মধ্যে ঝাপটা খেলেন অবিনাশ। নড়ে উঠল বড়োবৌমা।

'বৌমা?'

'বলুন…'

'তোমরা কতা কও না ক্যান। খুকু…'

'বাবা…'

'কি হইছে নরেশের? তরা কতা কস্‌ না ক্যান?'

'কুট্টিদা এখানে থাকে না বাবা।'

'এইখানে থাকে না? কই থাকে?'

'কলকাতা…'

'কইলকাতা! কইলকাতা ক্যান?'

'ওখানেই মাস্টারি করে একটা স্কুলে।'

'দেবু পরেশ হারু সতু দীনু অরাও ত চাকরি করে কইলকাতা। নারু আলাদা থাকে ক্যান?'

যেন এক অবোধ শিশুর প্রশ্নের পর প্রশ্নের মুখে অসহায় মায়ের মতো চুপ করে যায় ওরা। বড়বৌ, ছোটমেয়ে, নাতনী আর নাতজামাই। একঝামটায় শক্ত মোটা লাঠিটা আবার হাতের মুঠোয় বাগিয়ে নিলেন অবিনাশ। লাফিয়ে উঠলেন—'তর বাপে কই!'

নাতনী ভলি হঠাৎ ভয় পায়—'তখন তো দেখলাম, তুলসীতলায় কথা বলছেন ঠাকুরমার সঙ্গে।'

'তর আর সব কাকারা?'

'ওখানেই কাছেপিঠে।'

কাঠবাঙালের গোঁ। হঠাৎ রক্তটা চিড়বিড়িয়ে উঠল মাথায়। ঘরের

বাইরে মানুষগুলিকে দু-হাতে সরিয়ে লম্বা লম্বা পা ফেলে ঝড়ের মতো গিয়ে নামলেন উঠোনে—'দেবু, দেবু…পরেশ সতু হারু দীনু কই গেলি তরা…'

যেন এ-মাটিও তাঁর। এই পাকাদালান, কাঁচাঘর, উঠোন, ইঁদারা, আমগাছ, জামগাছ কাঁঠালগাছ…সব। তিনিই কর্তা। এবং বৃদ্ধের বাজখাঁই গলার স্বরে উঠোনের মানুষগুলি, এমন কি, তখনও যারা ঘরে ছিল, চমকে বেরিয়ে এলো। আচারের বয়ম, কুলোয় ডালের বড়ি, পুরনো চাল শুকোচ্ছে রোদে। মাথার উপরে টান-টান-তারে ভেজা-শাড়ি ধুতি ঝুলছে থিয়েটারের পর্দার মতো। শালিকপায়রাচড়ুই ছিল উঠোনে, কাপড়-শুকোবার-তারে গোটা দুই কাক, সব উড়ে গেল।

হঠাৎ, ডাক ছেড়ে দাপাতে দাপাতে কোন ঘর থেকে ছুটে এলো কুঁজোবুড়ি—'কই, কই আছিলা তুমি? শুনছনি পোড়াকপাইলাগো কত্তা! হা ভগবান, এই দেখনের লেইগা ক্যান আইলাম, ক্যান আইলাম বেইমানগো কাছে…'

নিজের ঋজুতায় শক্ত হয়ে দাঁড়ালেন অবিনাশ। উঠোনের চারদিকে ঘরের দাওয়ায়, বারান্দায়, গাছতলায় দর্শকের ভিড়। এলোমেলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে লুঙি পরে, ধুতিকে লুঙির মতো করে, গেঞ্জি-গায়ে অথবা উদোল গায়ে ছেলেরা। চোখে চোখ পড়ার ভয়। কি বুড়ো হয়ে গেছে দেবু! নিজেরই সমবয়সী মনে হয়। ধবধবে সাদা মাথা। গেল-শ্রাবণে বাহান্ন পুরিয়ে তিপ্পান্ন। পরেশের মাথা জুড়ে টাক, বুকে কাঁচাপাকা লোম। হাড়-গিলগিলে কঙ্কালসার সতু। কুলীন কায়েতের ছেলে হাতুড়ি পেটায় কারখানায়। খেতে পায় কিনা কে জানে! ছেলেদের ডেকে দুটো কথা বলতে, কি জানি কেন, কথা আটকে গেল তার। এতদিন বাদে সত্যি দূরের মানুষ। সত্যি সত্যি বিদেশী।

পায়ের কাছে মাটিতে পড়ে অনর্গল কপাল-চাপড়ানো চিৎকার। নিচু চোখে তাকালেন অবিনাশ। মাজা ধরে উঠোনে বসে পড়েছে বুড়ি। জীবনে মরণে সাথী। ধরাগলায় শান্তভাবে বললেন—'কান্দ ক্যান? প্যাঁচাল পাইড়া লাভ কি…'

'হ কারে আর কমু!' আঁচলে চোখ মোছেন চারুবালা—'দুধের বাচ্চা নারুডা বামুনের মাইয়া বিয়া কইরা আলাদা থাকে কইলকাতা। ঘরে আসে না।'

বামুনের মাইয়া। নতুন সংবাদ। ধাক্কা খেলেন না অবিনাশ। কাঁপা-কঁাপা হাতে হাতের-লাঠিটা একবার ঘোরালেন চারদিকে। ছেলেদের দিকে অথবা ঘরগুলিই লক্ষ্য —'আইব! কই আইব! তোমার পোলারা লাঠালাঠি কইরা ভাগ হইয়া গেছে। বুঝ না? মরলে দুইডা জ্ঞাতিকুটুম নাই যে পুড়াইব। পোলারা গঙ্গাজল খাওয়াইব, মুখে আগুন দিব, হেই লোভেইনি আইলা। এখন কার ঘরে উঠবা কও! পাচচুলায় ত পাচডা হাড়ি, কার অন্ন মুখে তুলবা!'

'কইও না, আগো আর কইও না, তোমার পায়ে পড়ি…'

'কমু না! ক্যান কমু না। তোমার লোভ…' বুড়ির দিকে তাকালেন অবিনাশ। আদ্যিকালের পুরনো ঢলঢলে সেমিজের উপর চওড়া লাল-পাড় শস্তা মেঠো শাড়ি। চামড়া ঝুলছে। কুঁচকোন চামড়ার ভাঁজে ছোট ছোট মাছের অঁাশ। একটাও দাঁত নেই, তোবড়ানো গালে শক্ত চোয়াল। সাদা ভুরু, জ্যাবজেবে সিঁদুর, সারাজীবন সিঁদুর ছুঁয়ে ছুঁয়ে সাদা মাথায় টাক। প্রায় সত্তর বছরের বুড়ির কপালে এত লাল মানায় না আর। বুড়োধাড়ি ছেলে, ছেলে-বৌ, নাতি-নাতনীব চোখের সামনে সাদায় সাদায় শুদ্ধ পবিত্র থাকার বয়স এখন।

ভিতরে ভিতরে জ্বলছিলেন অবিনাশ। লাঠির বাকানো হুম্ব-ই-কার শক্ত করে কোমরে চেপে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। নিজের নিজের ঘরের কাছে মুখ ফিরিয়ে ছেলেরা ঘুরছে ফিরছে, ঘুরঘুর করছে পোষা-মুরগির মতো। হাত কচলাচ্ছে, বুক হাতড়াচ্ছে, মাথা চুলকোচ্ছে। অস্বস্তিতে পেয়েছে ওদের। দূরে ঝাঁকড়া-মাথা আমগাছের ভিতর হাজার টুকরো হীরের মতো জ্বলছে সূর্য। সেদিকে তাকিয়ে, অনেকটা স্বপ্নের ঘোরে প্রলাপের মতো, আপনমনেই বললেন—'দুই দিন দুই রাইত এত কাঠখড় পুড়াইয়া পোলাগো কাছে আইলা, এখনও একটু জিড়ানের কতা কয় না কেউ। আমাগো থাকনের ঘরই ঠিক হয় নাই…'

'হ, তাই ত দেখতাছি…'

'কেরমে কেরমে আরও দেখবা।'

'না, দেখনের আর কাম নাই…'

'হাউস মিটছেনি কও?'

'হু…'

'পোলাগো অন্নজল মুখে তুলবা না ?'...

'পোলাগো ভাত খাইছি নাকি কোনদিন? এত্ত মারামারি-কাটাকাটি গেল, দ্যাশডারে শ্মশান কইরানি আইয়া পড়ল সব। শ্মশান আগলাইয়া শ্বশুরের ভিটেয় পইড়া রইলাম নি কও। এখন আসনের সমে আতা মিঞা কয়—শ্যাষে আপনেরাও নি যান ঠাইরাইন...'

আতা মিঞা। চমকে ওঠেন অবিনাশ।

লালবালির তুলসীমঞ্চ বেয়ে আমগাছের ছায়াটা তুলসীগাছের শরীর ছুঁয়েছে। নিষ্পলক তাকিয়ে থাকেন অবিনাশ। একটা চাপা ক্রোধের আগুন জ্বলছে শরীরে। বৃদ্ধ বয়স, দীর্ঘ পথযাত্রার শ্রম, নিজে ডাক্তার—পরিণাম ভেবেই ভিতরে ভিতরে দাঁত চেপে চোখ বুজে সংযত হতে চাইলেন। চোখের পাতায় এখনও বর্ষার ভরাট গাঙে পাল-তোলা নাও-এর ছবি। বদর বদর... মাঝিমাল্লার হাঁকে ঝাঁক ঝাঁক বালিহাঁসের ডানায় প্রতিধ্বনি কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে যায় আকাশে। আকাশে জলে সীমা নেই। দূরে দূরে পিঠ-চাগানো চরের বালিতে মেঘের বাহার। এখানে পায়ের কাছে লেপটে-বসা বুড়ি। তিল তিল সময় কাটিয়ে জীবনের শেষে এই বসে-পড়া। গোঙানির মতো প্রলাপ। সামনেই ছেলেরা—সাদা-চুল, পাকা-দাড়ি, পরিপূর্ণ টাক, কাঁচা-পাকা বুকের লোম, মেদ-থলথল শরীর, ভুঁড়ি, হাঁপানির টান—যেন সমবয়স্ক কতগুলি মানুষ। একদিন পরিচয় ছিল, একদিন চিনতেন। এখন রক্তের মধ্যে চাক্‌কু। হঠাৎ হাতের ঝাঁকুনিতে লাঠির হ্রস্ব ই-কার থেকে গলাটা শক্ত মুঠোয় বাগিয়ে ধরে চিৎকার করে উঠলেন—'হে...ই দেবু পরেশ সতু হারু দীনু হারামজাদা বেইমানেরা, আয় এইদিকে আয় সব...'

স্তম্ভিত দর্শকবৃন্দ। কেউ কেউ এগিয়ে আসে।

শুকনো গলায় কাশি ওঠে। তবু অকুতোভয় অবিনাশ গলা ছিঁড়ে চিৎকার করে হাতের-লাঠি তুলে হাঁকলেন—'হে ..ই পরেইশ্যা, আয় আয় শোন্ এইদিকে...'

ছেলেরা এগিয়ে আসে। যেন পিতৃশাসন এখনও কিছুটা সত্য। ওদের ছায়াগুলি ঘুরে ঘুরে আঁকিবুকি খেলছে উঠোন জুড়ে। ঘিরে ফেলছে তাকে। অবিনাশ লাঠি তুললেন—'হেই পরেইশ্যা, তর বৌ যে টাঙ্কডা লইয়া গেল যুদ্ধ কইরা। হেইডা আন বেবাক মানুষের সামনে। কী আছে দেখুম...'

চারদিকে অদ্ভুত নীরবতা। বড়ছেলে দেবেশ গুটি গুটি এগিয়ে আসে কাছে, উদ্যত লাঠির সীমানায়—'আমাগো সেই দশ-সেরী-চালের বড়ো কাঁসার হাঁড়িটা, মা-র ঠাকুরপূজার সমস্ত পাথরের থালাবাটিগ্লাস ভাগে তো পরেশই পাইছে…

'ভাগ! কিসের ভাগ! আমার জিনিস কে ভাগ করে? বেইমান শয়তান…' চিৎকারে চিৎকারে পাঁজরা ছিঁড়ে গেলে থুতুর ফেনায় রক্ত দেখেও অবিনাশ একহাতে লাঠি আর অন্যহাতে বুক চেপে কাশতে কাশতে চোখ তুলে তাকাতে চাইলেন একবার। চৌদ্দপুরুষের আরাধ্য গৃহদেবতার পবিত্র তৈজসপত্র, কবে কোন নবাবী-আমলে-কেনা কোন পূর্বপুরুষের স্মৃতি…'

দ্রুত ছুটে-আসা দেবু, দেবেশ, প্রথম সন্তানের ছায়াটা শরীর স্পর্শ করতেই, জীবনের প্রথম ঘৃণায়, বাপঠাকুদ্দার চৌদ্দপুরুষের ভিটেকে কলুষিত হতে-না-দেবার পাপে, সারা শরীরে রক্তে রক্তে আশ্চর্য এক যন্ত্রণায় বিদ্ধ অবিনাশ, দূরের আমগাছের ডালেপাতায় আটকানো ছিন্নবিচ্ছিন্ন ভোকাট্টা ঘুড়ির দিকে তাকিয়ে, দীর্ঘজীবনশেষে বিদেশবিভুঁই-এ আজ হঠাৎ, সবকিছুর অর্থহীনতায়, শূন্যতায়, সংসারপ্রবেশের পাসপোর্ট-ভিসা বুকে চেপে, ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে উঠলেন।

গনগনে দুপুরেও সূর্যদেব ধৃতরাষ্ট্র আজ। এবং হাতের লাঠিটা সত্যি সত্যি তরবারি হয়ে ওঠার আগেই স্পষ্ট বুঝলেন, বড়োবৌ আর ছোটখুকুমণি জাপটে ধরেছে তাঁকে। কার্তিক মাসে উঠোন ছুঁই-ছুঁই বর্ষার জল দ্রুত গড়িয়ে নামছে। বাঁশের মাচায় তক্তা-ফেলা-ঘাটের পাশে গাবগাছের গুঁড়িতে বাঁধা দড়ি খুঁজে দেবার মাঝি নেই। ডাঙায়-কাদায় আটকে যাচ্ছে নৌকো। কাদা শুকোবে। নৌকো আটকে থাকবে। ভেসে উঠবে, যদি আবার বর্ষা আসে।

'নিজেরে দুইফালা কইরা বাচন যায় না।' —আতাউল্লাকে মনে পড়ে। স্বদেশ।

রোহিতাশ্বের নামে

কে বা কারা কাল রাতে ফটিককে খুন করেছে।

সংবাদটা ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত তল্লাট জুড়ে ভোর থেকেই নাকি একটা তুলকালাম কাণ্ড। রতন সাহার বস্তির একেবারে কোণের দিকে ট্রাম-রাস্তার উপর গরুমোষের খাটালের পাশে দিনের-পর-দিন ফেলে-রাখা আবর্জনার স্তূপ আর পাবলিক-ল্যাট্রিনের পচা-দুর্গন্ধের মধ্যে তাজা জোয়ান ছেলেটার মৃতদেহটাকে ঘিরে যে পরিমাণ লোক জমেছিল, এককাট্টা থাকলে তাতে নাকি একেবারে খালি-হাতেই একটা বড়োরকমের ডাকাত-দলকে হটিয়ে দেওয়া সম্ভব। ফুটপাতের ঘুম থেকে উঠে কয়েকজন রিকশ-কি-ঠেলাওয়ালা পায়খানা করতে এসে যখন মৃতদেহটাকে প্রথম আবিষ্কার করে, তখনও ভালো করে সূর্য ওঠে নি। কাক ডাকছিল, রাস্তার সরকারি আলোগুলি জ্বলছিল, প্রথম ট্রাম রাস্তায় নামে নি। হোশপাইপের জল ছড়াচ্ছিল কর্পোরেশানের মানুষ, কলকাতা ঘুমোচ্ছিল তখনও। এবং বেলা প্রায় এগারটায় কলকাতার আরেক প্রান্ত থেকে প্রতিদিনের মতো ইস্কুলে এসে শিক্ষক নরেশ মজুমদার শুনলেন—ইস্কুল বন্ধ। ওআর্নিং-বেলের অনেক আগেই হেডমাস্টারমশাই দরজায় নোটিশ সেঁটে জানিয়ে দিয়েছেন—'...দশম শ্রেণীর ছাত্র শ্রীমান ফটিক রায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে বিদ্যালয় বন্ধ রহিল।' নোটিশের চারদিকে যথারীতি কালো-কালির একটা চওড়া বর্ডার ছিল। কিন্তু মৃত্যু! মৃত্যু আর নিহত হওয়া কী এক! সংবাদটার প্রথম ধাক্কা সামলে ওঠার পরই নরেশ মজুমদারের প্রশ্ন। আপাতত এই জাতীয় প্রশ্ন অবান্তর। এবং প্রধান শিক্ষকের নিজের-হাতে-লেখা নোটিশে যদি বানান-ভুল বা ব্যাকরণের-ভুলও থাকত, আজ প্রশ্ন উঠত না। ক্লাশ টেন-ডি, হিউম্যানিটিজের ছাত্র ফটিক রায়, ষোল...বড়ো জোর সতের হবে বয়স, পাতলা-দোহারা সুন্দর ছেলেটা! কালও সেকেণ্ড পিরিয়ডে বোর্ডে ডেকে এনে একটা সহজ কম্‌প্লেক্‌স্ সেনটেন্‌স্ ভেঙে অ্যানালাইসিস্ করতে বলেছিল যাকে এবং মন দিয়ে পড়াশুনো না-করার জন্য

মৃদু তিরস্কার করে যাকে বেঞ্চে ফিরে গিয়ে বসতে বলেছিল, কচি কিশোর স্মার্ট ছেলেটা কেন এমন বিচ্ছিরিভাবে খুন হবে মানুষের হাতে ?

দুপুরবেলার নিঝুম স্কুলবাড়িটার চারদিকে তখন একটা থমথমে আবহাওয়া। সামনে রাস্তার উপরই পুলিশের ওয়্যারলেস্ ভ্যান, জিপ্। এবং এ-রকম একটা ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে পুলিশের গাড়ি দেখেই কৌতূহলী মানুষের ভিড় বাড়ছে, কোলাহল শোনা যায়। এবং পুলিশজনতার গা-ছোঁয়াছুঁয়িতেই আজকাল যেভাবে দপ্ করে আগুন জ্বলে উঠছে, সেই আশঙ্কাতেই পুলিশের-গাড়ি পাহারা দিতে বেঞ্চি টেনে বসে বা দাঁড়িয়ে হাতে-হাতে খৈনি ডলছে রাইফেল-কাঁধে সি-আর-পি। উপরে হেডমাস্টারের ঘরে স্থানীয় থানার ও-সি, তাঁরও বড়োকর্তা ডি-সি। সুইং-ডোরের সামনে টান হয়ে দাঁড়িয়ে ইস্কুলের চার-চারজন বেয়ারার। বেচারিরা ভয়ে চুপসে গেছে।

টিচার্স-রুমে তখন ধোঁয়া উড়ছে। পাঁচ মাস যাবত সরকারি মহার্ঘভাতা আসছে-না-বলে ক্ষুব্ধ শিক্ষক থেকে শুরু করে দেশে বিপ্লব-আসছে-না বলে উত্তেজিত—প্রায় সকলেরই চোখমুখ কেমন যেন বদলে গেছে মনে হলো। নরেশ একটা চেয়ার টেনে নিঃশব্দে বসল। ঠিক এই মুহূর্তে সে চোখ রেখে তাকাতে পারছে না কোনদিকে। ওকে ঘরে ঢুকতে দেখে একবারমাত্র ঘাড় ফিরিয়ে ওকে দেখল সবাই। 'শুনেছেন মশাই'—অন্নদাবাবুর বাজখাঁই গলার উত্তরে নিস্পৃহভঙ্গিতে মৃদু ঘাড় নেড়েই পকেটের রুমালে ঘাড়গর্দান মুছল নরেশ। সিলিংফ্যানটা দূরে পড়েছে, তারই তলায় হঠাৎ-ছুটির আসর। এককোণে চুপচাপ বসে সে ফটিকের মুখটা মনে মনে ভাববার চেষ্টা করল। প্রায় সাড়ে-সাতশ ছাত্রের মধ্যে একটি বিশেষ মুখ। এক ঝটকায় মনে হয়, মুখটা সে এই মুহূর্তে মনে আনতে পারছে না। একবার ফটো দেখতে হবে। টুকরো টুকরো ঘটনার স্মৃতি। ক্লাশ ফাইভ থেকে ফটিক পড়ছে এ-ইস্কুলে। এবং সে চাকরি করছে আজ প্রায় একটানা আট বছর। কোনদিক দিয়েই খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। না অতি-সুবোধ বালক, না হতচ্ছাড়া মায়ে-তাড়ানো বাপে-খেদানো নচ্ছার। নরেশ স্পষ্ট অনুভব করে, সে ভিতরে ভিতরে ঘামছে। ও-পাশে স্থানীয় অধিবাসী ইকনমিক্সের ভবানীবাবু, ফিজিক্সের পরেশবাবু, পুরনো মাস্টারমশাই সদানন্দবাবু চুপচাপ থাকলেও বা মাঝে মাঝে দু-চারটে কথা বললেও কমার্সের হরিবাবু প্রায় প্রত্যক্ষদর্শীর ভূমিকায় এক নাগাড়ে বলে যাচ্ছেন কথা। সকাল থেকে ঘুরেফিরে যতো

তথ্য তিনি সংগ্রহ করেছেন। একরাশ বিরক্তির ভারে নরেশ মজুমদার ক্লান্ত। চেয়ারের পিঠে হেলান দিয়ে টেবিলের তলায় লম্বা পা ছড়িয়ে একটু স্বস্তি চেয়েছিল। সহকর্মী দেবাংশু বসাকের পায়ে পা ঠেকে যেতেই আঙুল কপালে ছুঁয়ে দ্রুত পা গুটিয়ে নিলো। এবারে সরস্বতী পুজোয় প্রচুর খেটেছিল ফটিক। গাইতে জানে না, নাচতে জানে না, এমন কি পাঠ্যপুস্তকের বাইরে রবীন্দ্রনাথের কোন কবিতার একটা চরণও মুখস্থ নেই, তবু পঁচিশে-বৈশাখের উৎসব নিয়ে মেতে ঘেমেনেয়ে একসার হলো সেদিন। কিন্তু…কিছুদিন ধরে এই কয়েকমাসে কেমন যেন একটু একটু করে পাল্টে যাচ্ছিল ছেলেটা। একটু সিরিয়াস। মাঝে মাঝে ক্লাসের মধ্যেই অদ্ভুত সব প্রশ্ন তুলত, ইতস্তত কিছু বিক্ষিপ্ত বিচ্ছিন্ন শব্দের ব্যবহার—শব্দ, শব্দ শুধু, রাজনৈতিক পরিভাষা… ভাসা ভাসা একটা ধারণা, অর্থ বা সংজ্ঞা বোঝার কোন দায় নেই, ট্রামেবাসে হাটেবাজারে যথেচ্ছ ব্যবহারে যা আজ আর পণ্ডিতি ব্যাপার নয়…'বলেন কী মশাই এ-টুকুন ছেলের পেটে পেটে এত?' নরেশ হরিবাবুর দিকে তাকায় —'পুলিশ তো সন্দেহ করছে শুনেছি…সেদিন কোলে-মার্কেটের কাছে ওদের প্রতিদ্বন্দ্বী-পার্টির ছেলেটাকে দিনদুপুরে ছুরি মেরে ফেলে দিয়ে পালাল, অ্যাবডোমিনা দু-ফাঁক…বলেন কী…ফটিক! আমাদের ফটকে!…রিটালি-য়েশন!' নরেশ চোখ তুলে ঘুরন্ত পাখার দিকে তাকায়। অনেক দূরে—যদি একটু বাতাস আসত এদিকে। রুমাল দিয়ে ঘাড়গর্দান মোছে। অসহ্য গরম। 'ফিরতে রাত হবে বলে বাড়ি থেকে বেরিয়েছিল সন্ধেবেলা। রাতে আর ফেরে নি।'…'প্রায়ই তো যেত এ-রকম…অনেক কিছুই তো হতে পারে…ভুষো কালি আর ব্ল্যাকজাপানে সাদা দেয়াল খুঁজে খুঁজে কতো কী লিখে বেড়াত, রাত জেগে দেয়ালে দেয়ালে পোস্টার সাঁটত…ভালো সিগারেট আছে? কী খাচ্ছেন? চারমিনার…একস্কিউজ মি…নাম্বার টেন আছে? উইলস? আরে মশাই, করেন তো মাস্টারি, বুর্জোয়া ঠাটটা তো ঠিক আছে।…ওই একরত্তি ছেলেটা মানুষ খুন করেছে, বিশ্বাস করি না…মেট্রোর বইটা কালই উঠে যাচ্ছে, চলুন যাই,…ডি-এ কবে আসছে দাদা…পে-কমিশনের কী হলো, এই যে এ-'ব-টি-এ স্যর…লেনিন বলেছিলেন…এক ঝটকায় চেয়ারটা ঠেলে সশব্দেই উঠে দাঁড়াল নরেশ। দু-পাশের বন্ধ-দরজার ফাঁকা ক্লাশঘরগুলি পেরিয়ে একেবারে সিঁড়ির মুখে এসে একটি সিগারেট ধরাল। স্কুল ছুটি বলেই এখন সে করিডরের নির্জনতায়, রেলিং-এ হেলান দিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ

দাঁড়িয়ে অনায়াসে ধূমপান করতে পারে। নিস্তব্ধ দুপুরের তেজী রোদে কাক ডাকছে ইতস্তত। ভাবতে অবাক লাগে, কয়েক শ' শিশুকিশোরের কলকল হল্লাচিৎকারের পরিবর্তে এই স্তব্ধতা। হঠাৎ-ছুটি! ক্লাস টেন-ডি-র কতোগুলি হোম-টাশ্‌কের খাতা আছে ডেস্কে। দেখলে হতো। অন্তত একটি খাতা, যা আজ বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে, স্মৃতি করে নিয়ে যাওয়া যায়। ওর ভুল-বানান অথবা ব্যাকরণ-ভুল লাল-কালিতে রক্তাক্ত করে লাভ নেই। আমাদেরই ভুল-অঙ্কের, ভুল-ব্যাকরণের পরিণামে সারা দেহে রক্তাক্ত হয়ে কালরাতে, সকলের অলক্ষ্যে রাস্তার আবর্জনায় পড়ে ছিল।

নরেশ সচকিত হয়ে ওঠে। নিচের তলায় হঠাৎ যেন জমাটবাঁধা কলরব, দ্রুত সিঁড়ি ভেঙ্গে উপরে ওঠার পায়ের-শব্দ। স্যাণ্ডেল-চটি-ভারি জুতো আর শব্দহীন স্লিপারের সমবেত ধ্বনি উপরে উঠে এসেই একেবারে মুখোমুখি থমকে দাঁড়াল। চোখে চোখ পড়তে সবাই নির্বাক। টেন-ইলেভেনের বড়ো ছেলেরা, কয়েকজন যুবক, প্রাক্তন ছাত্র—কলেজে পড়ে। তিনতলায় ওঠার সিঁড়ির রেলিং-এ হাত রেখে নরেশ নিঃশব্দে একমুখ সিগারেটের-ধোঁয়া উড়িয়ে ওদের দিকে তাকাল। ওরা হাঁপাচ্ছে, বেশভূষায় চপ্‌চপ্‌ ঘাম। এলোমেলো চুলে রুক্ষতা।

'পোস্টমর্টমের পর পুলিশ ডেডবডি ছেড়েছে স্যার। ওদের বাড়ি ঘুরে স্কুলে আনা হবে।'

নরেশ চুপ করে শোনে। ছাত্র শিবনাথকে পরিণত বয়স্ক-যুবক মনে হয়।

'আমরা মালা দেব স্যার, টাকা চাই।'

'স্কুলের তরফ থেকে হেড-স্যরকে মালা দিতে হবে স্যর।'

'স্টাফ-কাউন্সিল থেকে আপনাদেরও মালা দিতে হবে।'

'সোমশবাবু কোথায় স্যর?'

সোমেশবাবু! সোমেশ মুখুজ্জে! প্রগতি আর প্রতিক্রিয়ার মাঝখানে দাঁড়িয়ে গত পাঁচ বছরে যিনি বারবার ডানে-বাঁ-এ দোল খাচ্ছেন। নরেশ তার অতিপরিচিত ছাত্র সত্যব্রতর চোখের মণিতে আগুনের হল্‌কা দেখে চমকে উঠল। লিপিপরিচয়হীন বিদেশীভাষার বই-এর মতো দুর্জ্ঞেয় মনে হচ্ছে ছেলেগুলিকে। উত্তেজনায় কাঁপছে। হয়তো যে-কোন সময়ে হঠাৎ যা-খুশি করে বসতে পারে অনায়াসে। কাছাকাছি কোথায় একটা প্রচণ্ড বোমার শব্দ, পরপর আরও কয়েকটা। পুলিশের রাইফেল। নিস্তব্ধ দুপুরের শান্তি

থরথর করে কাঁপে। তিনতলায় ছাদের কার্নিশ থেকে একঝাঁক পায়রা উড়ে গিয়ে পাক খেতে খেতে কোথায় চলে গেল।

'আমরা জানি স্যার, ফটিককে কারা খুন করেছে...'

'পুলিশফুলিশে বিশ্বাস করি না। আগুন জ্বলবে।'

'একটা মানুষের-বাচ্চা কুকুরবেড়ালের মতো ডাস্টবিনে মরে পড়ে থাকবে আমরা মুখ বুজে সইব?'

'বুর্জোয়া আইনে এর প্রতিকার হয় না স্যর।'

পিঠ টান করে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে কথা বলছে ছেলেগুলি। নিরুত্তর নরেশ ওদের ভাষা বুঝতে চাইল। মানুষ মানুষের ভাষা বুঝছে না, অদ্ভুত এই সময়। পকেট থেকে অনেক খুঁজে দুটো টাকা বের হলো। এগিয়ে দিয়ে বলল—'আমার হয়ে একটা মালা দিয়ো ফটিককে।'

'মিছিলে যাবেন না স্যর?'

'সব স্কুলকলেজ থেকে ধর্মঘট করে ছাত্ররা আসবে। হাজার হাজার ছেলের মিছিল, লালপতাকায় ভাসিয়ে দেব।'

'আমাদের মিছিলে যেতে ভয় পাচ্ছেন স্যর?'

ভয়! নরেশ সর্বাঙ্গে নাড়া খেলো। কাল এবং সামনের আরও অসংখ্য দিন ক্লাসে বসিয়ে ওদের পড়াতে হবে। শুদ্ধ ইংরেজি লেখার কায়দাগুলি, পরীক্ষা পাশের জন্য।

'কিন্তু সোমেশবাবুকে আমরা চাই স্যর। আমাদের সঙ্গে যেতে হবে।'

'যদি না যান?'

'আগুন জ্বলবে স্যর, খুন কা বদলা খুন।'

বাঁ-হাতের পাতায় ডান-হাতের ঘুসি-মারার মুহূর্তে অমরের লিকলিকে হাতদুটোতেও যেন পেশীর উত্তেজনা চোখে পড়ে নরেশের। সে এবার সত্যি ভয় পায়। এখন, অন্তত এই মুহূর্তে অথবা কখনও, অন্য কোন সময়ে শুধু বাক্য দিয়ে, মানুষের ভাষা বা বুদ্ধি দিয়ে এই তীব্র হননের উন্মাদনাকে প্রশমিত করা অসম্ভব। যেমন সম্ভব নয়, জীবনে অনেকবার রং-বদল-করা সুখী-মধ্যবিত্ত এবং বর্তমানে বিপ্লবী শিক্ষক নেতা সহকর্মী সোমেশ মুখুজ্জেকে বোঝান, পরীক্ষার খাতায় বে-আইনী নম্বর বাড়িয়ে ভ্রাতুষ্পুত্রকে ক্লাশ-প্রমোশন দেওয়া যথার্থ বিপ্লবী-চরিত্র নয়।

এবং ঠিক তখনই অকস্মাৎ বিস্ফোরণের প্রচণ্ড শব্দে নির্জন বাড়িটা থরথর

করে কেঁপে উঠল যেন। আসলে কাঁপল নিজেরই ভিতরের বুকটা। নরেশ কোন কিছু বুঝে-ওঠার আগেই জোয়ান ছেলেগুলি চোখের পলকে আবার অশ্বক্ষুরের ধ্বনি তুলে সিঁড়ি ভেঙ্গে দ্রুত গড়িয়ে গিয়ে কোথায় মিশে গেল। স্কুলবাড়িটা এখন চারদিক থেকে বন্ধ। কোথায় পালাবে? কিংবা ওরা হয় তো সব পারে। নরেশ ভাবল। মুহূর্তের মধ্যে তালগোল পাকিয়ে ঘটে যাচ্ছে কিছু। ওদিকে মাস্টারমশাইরা দ্রুত ছুটোছুটি করছেন, হেডমাস্টারমশাই হুড়মুড় করে নেমে গেলেন নিচে। সদরদরজা বন্ধ, এবার ভিতর থেকে তালা পড়বে। আস্তে আস্তে ডালা-বন্ধ-সিন্দুকের মতো চারদিক থেকে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে বাড়িটা। নরেশ দ্রুত নামল। রাস্তায় হাজারো মানুষের কোলাহল, চিৎকার। বোমাপটকা, বন্দুকের গুলি, কাঁদানে গ্যাস। দূরাগত হল্লা-চিৎকারের সঙ্গে বাতাসে চোখেমুখে জ্বালা-ধরানো গ্যাস আর বারুদের গন্ধ। এক্ষুনি, ঠিক এক্ষুনি বেরোতে না-পারলে হয়তো সারাদিন ধরে দুঃসহ বারুদের গন্ধ আর প্রচণ্ড শব্দ-বিস্ফোরণের মধ্যে ভয় আর আতঙ্কের সময় গুনে গুনে একা একা ভাবতে হবে ফটিককে। তুচ্ছ নাম-না-জানা অখ্যাত এক কিশোর-বালক হঠাৎ এক বিশাল ময়াল-সাপের ফণায় স্থির হয়ে শুয়ে, লকলকে জিভের ক্রুদ্ধহিংস্রতায় বাতাসে-ওড়ানো আগুনের শিখায় ফুঁসতে ফুঁসতে এগিয়ে আসছে। অশান্ত বেপরোয়া যৌবনের ডগায় ফুলের-পাহাড় বুকে নিয়ে ঘুমোচ্ছে ফটিক। হিংস্র ময়াল-সাপটার উপর শিকারীর সঙ্গীন তাক করা ছিল, গর্জে উঠল। প্রতিহিংসার লকলকে জিভগুলি দাউ দাউ আগুন হয়ে জ্বলে উঠেই চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল। সমস্ত তল্লাট জুড়ে ক্রোধ আর হিংসার আগুন। অসংখ্য ফটিক, অনেক ফটিকের বিরুদ্ধে। মাঝখানে শিকারী। নরেশ পিছনের দিকে সরু গলিটার দিকে ছুটল। ছেলেদের পেচ্ছাবের ঘর আর পায়খানার পাশ দিয়ে একটা দরজা। দরজাটা বন্ধই থাকে চিরকাল। স্কুলের বেয়ারার মদনকে ডেকে দরজা খুলে নরেশ লাফ দিয়ে বেরিয়ে পড়ল। এক চিলতে সরু গলি। গিজ্‌ গিজ্‌ করছে মানুষ। উত্তেজনা আর সন্ত্রাস। দু-পাশের বাড়িগুলির রকে, জানালায়, দোতলার রেলিং-এ উৎকণ্ঠা। নরেশ এই মুহূর্তে পালাবার পথ খুঁজল। ট্রামবাসযানবাহন নির্ঘাৎ বন্ধ। গলিতে গলিতে হেঁটে যদি পৌঁছে যাওয়া যায় শিয়ালদা, তারপরও না-হয় হাঁটা যাবে অনেকক্ষণ।

ইউনিয়ন অফিসেই ছিলেন নীলুদা। অবসাদে ক্লান্ত হয়ে নরেশ যখন ঘরে

এসে ঢুকল নীলুদা কথা বলছিলেন কয়েকজন মানুষের সঙ্গে। চোখে-চোখ পড়তেই একটু হয়তো বিস্মিত হলেন কিন্তু নিস্পৃহভঙ্গিতে আবার নিজেদের কথাবার্তায় মন দিলেন যথারীতি। নরেশ একটা বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। আজ কতো বছর পরে, ঠিক হিশেবে আনা কঠিন, প্রায় পাঁচ-সাত বছর পরে এখানে সে এলো। এর মধ্যে নীলুদার সঙ্গে তার দেখা হয়েছে—রাস্তায়, যুক্তফ্রন্টের সভায়, মিছিলে, কদাচিৎ বাড়িতে। অথচ নীলুদা! ছেলেবেলায় ··· নরেশ ঠিক মনে করতে পারে না, সেটা বয়সের কোন স্তর, শৈশব না বালক-বয়স, পিশিমার বাড়িতে থাকার সময় ওর চোখের সামনে পুলিশ ধরে নিয়ে গেল মানুষটাকে। বে-আইনী পার্টির লোক। পিশিমা ছেলের জন্য মেঝেতে লুটিয়ে গড়িয়ে কাঁদলেন, পিসেমশাই ঝিম মেরে রইলেন এবং সেই বয়সে, কোন কিছুই-না-বোঝার বয়সে সে তার জীবনের প্রথম জ্যান্ত বড়ো-মানুষ, মহৎ-মানুষ দেখেছিল প্রথম।

কথা-শেষ-না-হওয়া পর্যন্ত চুপচাপ বেঞ্চিতে বসে থেকে অফিসঘরটা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছিল নরেশ। মোটামুটি ফাঁকা, ইতস্তত কয়েকজন মানুষের আসা-যাওয়া। চেয়ারটেবিল, কাগজের-ফাইলের স্তূপ, টেলিফোন, টাইপ-রাইটিং, সাইক্লোস্টাইল মেশিন, আলমারি, সারি সারি ফাইল। চারদেয়ালে বাঁধানো ছবি—মার্কস, এঙ্গেলস্, লেলিন, হো-চি-মিন। ছোট-বড়ো আরও অসংখ্য ফটো, দূর থেকে বোঝা যায় না ঠিক—শ্রমিক মিছিল, বিগ্রেড-ময়দানে বিশাল সমাবেশ। ঝুল আর মাকড়সার জালে আচ্ছন্ন দেয়ালে পুরানো বছরের বাতিল ক্যালেণ্ডারের সুন্দর ছবির মতো ফটোগুলি অনাদরে ঝুলছে।

'কি রে, কি খবর! হঠাৎ একেবারে এখানে···' কথা শেষ করে নীলুদা সামনে এসে দাঁড়ালেন—'চাকরিবাকরি করছিস্। ভালো সিগারেট আছে?'

প্রায় পনের বছরের বড়ো দাদার হাতে সিগারেটের প্যাকেট আর দেশলাই তুলে দিয়ে নরেশ বলল—'কাল রাতে নৃশংসভাবে কারা ফটিককে খুন করেছে।'

'কে ফটিক?' হাতের করপুটে লুকোন আগুনে সিগারেট ধরিয়ে দরজার দিকে তাকালেন নীলুদা—'কমরেড, কাল বিকেল পাঁচটায় তিন নম্বর গেটের গেটমিটিং-এ আমি যাবো। সুখনকে জানিয়ে রাখবেন। আর এদিকে, ভেরি বিজি, বুঝলি···'

নীলুদা টেবিলের ওদিকে গিয়ে বসলেন। নরেশ উঠে গিয়ে মুখোমুখি

চেয়ারে। সিগারেট ঠোঁটে চেপে টেবিলের উপর কাগজের স্তূপ থেকে কি যেন খুঁজতে খুঁজতে হঠাৎ ঠোঁট চেপে বললেন—'হ্যাঁ, কি যেন বলছিলি, কে কাকে খুন করেছে।'

'ফটিককে...'

টেলিফোন। 'যাস্ট্ এ মিনিট...' নীলুদা রিসিভারটা তুলে নিলেন—'হ্যালো...' কী একটা সংবাদে যেন খুশি হলেন মনে হলো। নরেশ তাকিয়ে রইল। কাঁচাপাকা চুল, লম্বা-পাতলা পঞ্চাশোর্ধ মানুষটি সত্যি কর্মব্যস্ত। একসময় রিসিভার রেখে চিৎকার করে কাকে ডাকলেন। একটা জরুরি কাগজ খুঁজে না পাওয়ার জন্য তিরস্কার করলেন। সেই ভদ্রলোক কাগজ খোঁজার দায় নিলে নীলুদা আবার তাকালেন—'হ্যাঁ, খুনোখুনির কথা কি বলছিলি। কে খুন হয়েছে?'

'ফটিক।'

'সে কে।'

'আমার ছাত্র।'

'ছাত্র?' মুঠো-করা আঙুলের ভাঁজে সিগারেট রেখে দীর্ঘ একটা কলকে-টান দিলেন নীলুদা। ভাঙা চোয়ালদুটো গেঁথে গেল, কণ্ঠাসর্বস্ব গলাটা জিরাফের মতো চাগিয়ে উঠল ভয়ঙ্করভাবে। তারপর খুকখুক কাশি সামলে হাসলেন—'তুই ভুল করছিস! এটা একটা ট্রেড-ইউনিয়ন আপিশ। পুলিশ স্টেশন নয়, আমিও পুলিশের বড়োবাবু নই।'

'পুলিশের কাছে যাবেন ওর বাবা। হয়তো গেছেন। সেটা আমার কাজ নয়। কিন্তু আমি তোমার কাছেই আসতে পারি নীলুদা। আমি বুঝতে চাই...'

'একটা মৃত্যুর জন্যে এরকম ফ্যাচ্‌ফ্যাচ্ কান্নাকাটি সেন্টিমেন্টালিজম্। রাজনীতিটা ভীষণ ক্রুড্।'

'না, একটা মৃত্যুর কথা আমি বলছি না। আরও অনেক, অসংখ্য মৃত্যুর জন্যে...রাজনীতি যুদ্ধ বাঁধালে হাজার হাজার মানুষ মরে, তার অর্থ বুঝি। কিন্তু বিপ্লবের কোন স্তরে একটি নিম্নমধ্যবিত্ত গরিবের ছেলেকে এভাবে খুন হতে হয়?'

নীলুদা হাসলেন—'বিপ্লবের যে-স্তরে সেটা প্রয়োজন। কোন পার্টি'ই বৈষ্ণব নয়, এমন কি গান্ধীবাদীরাও নয়।'

'ইভ্‌ন্ কেরেনেস্কি, নাম্বার ওয়ান এনিমি অব দ্য সোস্যালিস্ট রিভোলিউ-শান ওঅজ অ্যালাউড্ টু কুইট রাশিয়া...' উত্তেজনায় চেঁচিয়ে ওঠে নরেশ—'লেনিন তাকে খুন করেন নি।'

নীলুদা তথাপি হাসেন। একগুঁয়ে ছাত্রের সামনে প্রাজ্ঞ শিক্ষকের মতো—'আমাদের পার্টিও খুনখারাপি চায় না। বাট্ উই মাস্ট হ্যাভ্ দ্য রাইট্ অব সেলফ্-ডিফেন্স। ইফ্ নেসেসারি, বুলেট ফর বুলেটস...'

'ঠিক এই কথাই বলছিল আমার ছাত্ররা। ফটিকের আততায়ীকে ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে। কিন্তু কে আততায়ী? ফটিক নিজেই কি ওর আততায়ীকে চিনতে পেরেছিল নাকি? অথচ ওরা, ফটিকের বন্ধুরা, হত্যাকারী খুঁজতে গিয়ে মাস্টারমশাইকে সন্দেহ করছে।'

'সে তো হতেই পারে। ইনডিভিজুয়াল্ কে? ইডিওলজি অ্যাণ্ড পার্টি দ্যাট ম্যাটারস্...'

'ইডিওলজি!' নিজের উত্তাপে নিজেই ভিতরে ভিতরে জ্বলে ওঠে নরেশ। চারদিকে তাকিয়ে টেবিলের উপর ঝুঁকে পড়ে, আস্তে অথচ দৃঢ়তায় ফুলে ওঠে—'কালই বুর্জোয়া এডুকেশানের জন্যে যারা হাইবেঞ্চিতে গিয়ে বসবে আর চাকরি রাখার দায়ে তোমাদেরই পার্টির লোক, যিনি বুর্জোয়া-এডুকেশান বিলোবেন, দু-পক্ষই কিন্তু পরস্পর ঘেন্না আর অবিশ্বাসের চোখে তাকাবে। দুদিকেই ছুরির শান চলছে। কে শেখায়? কে শেখে?'

'শিখতে হবে না। কি হবে ওসব ছাইপাশ শিখে? হবে তো তোর মতো কেতাদুরস্ত ভদ্দরলোক। রবিঠাকুরের গান গাইবি আর একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করে বৌকে নিয়ে সিঁধিয়ে থাকবি। সেল্ফ-সেন্টার্ড পেটিবুর্জোয়া স্কাউন্‌ড্রাল্স...।'

'এই, এখানেই তোমার সঙ্গে আমি একমত নীলুদা। আমরা স্কাউন্‌ড্রাল্স...' নরেশ সোজাসুজি তাকায়। কাঁচাপাকা চুল, ভগ্নস্বাস্থ্য, একগাল দাড়ি, অনাড়ম্বর জীবন। সারাটা জীবন শুধু দেশকে ভালোবেসে শুধু পার্টির জন্য আজও অকৃতদার। মানুষটাকে রহস্যময় মনে হয়, শ্রদ্ধা আর বিস্ময়—'আমার ছাত্ররাও ঠিক তোমার মতোই কথা বলে নীলুদা। এ সব অর্থহীন। ফিউটাইল্। সুতরাং ভাঙো, ভাঙো সব কিছু। জানি, আমরা স্কাউনড্রাল্স, যা পড়াই সব ননসেন্স। কিন্তু একটাকে নাকচ করলে অন্য কিছুকে মেনে নিতে হয় না? কি বলে তোমাদের ডায়লেক্‌টিকস্?

এর সব বাজে বলে সব ভাঙতে হবে, কিন্তু সবটাই স্পন্‌টেনিউটির উপর ছেড়ে দিয়ে ? কন্সাস্‌নেসের লেভেল নেই কোথাও ? লাঠিছুরিবোমা, এসিড-বাল্‌ব, মলোটভ-ককটেল...'

'এসব আমাদের পার্টি তৈরি করে নি। তৈরি করতে বাধ্য করেছে। কুড়ি বছর ধরে এ দেশটায় কারা ভূতের নেত্য নেচেছে রাজনীতির নামে, ঘরে ঘরে গুণ্ডা তৈরি হয়েছে, তার সঙ্গে লড়তে গেলে এসব প্রয়োজন। ইনেভিটেবিলিটি বিয়ণ্ড কোশ্চেন। ট্রেড ইউনিয়ন করেছিস কখনও ? মালিকের হয়ে শ্রমিকদের খুন করতে কারা আসে দেখেছিস্‌ ? জমিদখলের আন্দোলন কি জিনিস জানিস্‌ ? বেনামী জমি দখলে রাখতে জোতদার ঘরে ঘরে কাদের পুষ্যি রাখে জানিস্‌ ?'

'কিন্তু ষোল বছরের ছাত্র ফটিককে যারা খুন করে...'

'একটা স্তরে এসবও হবে...'

'হবে !' নরেশ বোবা হয়ে যায়। বিস্ময়ে শিথিল হয়ে আসে—'তোমার বড়োভাই খোকনদা, পুরনো দিনের কমিউনিস্ট, গান্ধীজি ঘুরে আসার কিছুদিন পরেই নোয়াখালিতে রিলিফ-ওয়ার্কে গিয়ে, দাঙ্গা থামাবার ঝুঁকি নিয়ে নিজেই খুন হয়ে গেলেন, মনে নেই তোমার ?'

'সে কথা কেন ?

'কারণ তোমরাও তাই করছ।'

'মানে ?' নীলুদার কপালের ভাঁজে তীক্ষ্ণধার রেখা পড়ে।

'স্রেফ্‌ ঘেন্না আর বিদ্বেষ ছড়িয়ে এদেশে স্বাধীনতা এসেছিল। ভাবতে পারো, গোটা দেশ একটা স্লটারল্যাণ্ড, একটা পুরো জাত স্লটারার। সেদিন নিজেদের স্বার্থে যারা হিন্দু মারতে মুসলমান যুবককে, আর মুসলমান মারতে হিন্দু যুবককে পিঠে চাপড় মেরে বাহাবা দিয়েছে, তারা কেউই কিন্তু পরে আর ওদের হাত থেকে বন্দুকবোমাছুরি ফিরিয়ে নেয় নি। সমাজের একটা স্তরে একটা কাল্ট তৈরি হয়ে গেছে গুণ্ডাবাজির। স্বাধীনতার আগে খোকনদা ওগুলো কেড়ে নিতে গিয়েই গুণ্ডার হাতে প্রাণটা দিলেন। আর তোমরা নীলুদা। তোমরা...' উত্তেজনায় চিৎকার করে ওঠে নরেশ। সংযম হারায়—'তোমরাও দেশের যৌবনের ফ্রাস্ট্রেশনের সুযোগটা নিলে। পার্টি ভাঙল, নিজেরা টুকরো টুকরো হলে, জনসাধারণকে নানাভাগে ভাঙলে। তারপর সেই ঘৃণা আর বিদ্বেষের রাজনীতি ! প্রতিদিন পার্টি ভাঙছে,

প্রতিদিনের ভগ্নাংশ পুরনো ভগ্নাংশকে মারছে। সেই স্বতঃস্ফূর্ত উন্মত্ততার রাজনীতি। খোকনদার মতো তোমরা দাঙ্গার মাঝখানে দাঁড়িয়ে মরতে শিখলে না, মারতে শেখালে। সেই বোমাপটকাবন্দুকপাইপগানলাঠিছুরির ট্র্যাডিশন সমানে চলেছে। এককালে ইংরেজ তাড়ানোর নামে নিজেরা খুনোখুনি করে দেশকে ছিঁড়েছি, আজও নিজেরাই নিজেদের রক্তে হাত লাল করে বারবার পার্টি ভাঙছি অ্যাণ্ড এভ্রিথিং বাই দ্য নেম অব ক্লাশ স্ট্রাগ্‌ল···বাঃ, সুন্দর···'

'সাট্ আপ···' একেবারে অতর্কিতে, অসতর্ক পথচারীদের মধ্যে হঠাৎ বোমা-ফাটার মতোই গলা ছিঁড়ে চিৎকার করে উঠলেন নীলুদা। চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠে থরথর করে কাঁপছেন। চারদিক থেকে ছুটে এসেছে মানুষজন, টেবিল ঘিরে বিস্ময় আর কৌতূহল। প্রবল উত্তেজনায় দ্রুত কথা বলতে নীলুদার গলা ফ্যাঁসফ্যাঁস ধরে আসে—'এটা ট্রেড-ইউনিয়নের আপিশ হলেও সবাই একটা পার্টির লোক। অনেকক্ষণ তোকে সহ্য করেছি। নাউ আই সে, গেট আউট···'

নরেশ নিজেও হাঁপাচ্ছে। এবার বিব্রত বোধ করে। ওকে চারদিক থেকে মানুষ ঘিরেছে। মানুষ! ড্যাবডেবে চোখগুলিতে সেই ভয়ঙ্কর অবিশ্বাসের দৃষ্টি। নীলুদার দিকে তাকায়। পঞ্চাশোর্ধ সেই দুঃসাহসী তেজী মানুষ। জীবনের বহু বছর জেল খেটে, বহুবার লাঠিবন্দুকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে যে নিজের জন্য কিছুই চায়নি, দেশের জন্য নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়ে আজও পার্টিই যার সংসার। নরেশ ভ্রাট বিস্ময়ে তার মুখের দিকে তাকায়। ওর জীবনে চোখে-দেখা প্রথম বড়ো-মানুষ, মহৎ-মানুষ। নিরুত্তেজ শান্ত গলায় বলে—'আমি তোমার কাছে বুঝতে এসেছিলাম নীলুদা···'

'কি বোঝাব তোকে?' নীলুদা সক্রোধে তার কমরেডদের দিকে তাকালেন —'এখানে এসে অকারণে যারা এভাবে রাজনীতির কথা বলে, আমরা তাদের পুলিশের লোক মনে করি। কিন্তু তুই, মামাতো ভাইকে এর বেশি সহ্য করা যায় না। নারু বাড়ি যা···'

'তোমরা আমাকে সন্দেহ করছ?'

'বিশ্বাস করি না।'

স্নায়ুর শিরাগুলি দপ্ দপ্ করছে। নীলুদার চোখে চোখ রেখে উঠে দাঁড়ায় তাকায় চারদিকের অবিশ্বাসী চোখগুলির দিকে। দিনদুপুরে হায়নার

মতো জ্বলছে। নীলুদার মাথার উপরে দেয়ালে টাঙানো লেনিন। মনে হয়, যেন ওর দিকেই তাকিয়ে আছেন। লেনিন কি যিশুখৃষ্ট হয়ে গেছেন। বুদ্ধ। নইলে ফটোর মানুষকে এতটা অসহায় মনে হয় কেন? নরেশ তাকাতে পারে না। তার চেয়েও যেন অনেক বেশি বাস্তব মনে হয় নীলুদার চোখ, আরেকজন বড়ো-মানুষ মহৎ-মানুষের দৃষ্টি। ইস্পাতের ছুরির মতো উজ্জ্বল আর তীক্ষ্ণ। আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসে। আচ্ছন্নের মতো টলতে টলতে সিঁড়ি ভেঙে রাস্তায়।

মানুষ! মানুষ! মানুষের স্রোতে ভেসে নিরাপদ শান্তি। গলিতে গলিতে একা হেঁটে এবার সে এগোয়। কিন্তু কোথায় পালাবে? নীলুদার টেবিল ঘিরে কতগুলি অবিশ্বাসী চোখের চাউনি এখনও যেন শাণিত ছুরির ফলার মতো ওকে বিঁধছে। অথচ বিশ্বাসে স্থির থেকে জীবনে কতো অসংখ্য-বার মিছিলে মিছিলে হেঁটেছি কলকাতার পথে, তবু কেন দ্বিধাসংশয় সন্দেহ আর অনৈক্যের চোরাবালিতে ডুবে যাচ্ছি আমরা! নিজের কাছে নিজের প্রশ্ন নিয়ে নরেশ চোখ তুলে তাকায়। ভরদুপুরের কলকাতা জ্বলছে। দুপাশের উঁচু উঁচু প্রকাণ্ড বাড়িগুলি আকাশের দিকে মাথা চাগিয়ে স্থির। সোজা সরলরেখার মতো প্রকাণ্ড রাজপথে অপরিচিত মুখের শোভা-যাত্রা। বিহ্বল ছোটাছুটি। তাদের চোখে, কপালে, নাকে, মুখে, হাতে, পায়ে, জামার বোতামে, জুতোর গোড়ালিতে, নাকের ঘামে, ছাতার বাঁটে, হাতের ব্যাগে, চুলের সিঁথিতে, মুখের হাসিতে, কপালের বলিরেখায়, চোখের চশমায়, পোশাকেআশাকে নীলুদার মুখ মনে পড়ে, ফটিকের মুখ! কেমন যেন নিষ্পাপ মনে হয় মুখগুলি। অথচ লুকোন পাপ। আততায়ী। ভিতরে ভিতরে একরাশ ক্লান্তি অবশ করে শরীর। ফটিক! কাল মধ্যরাত্রির নিস্তব্ধ নিশুতির নির্জন কলকাতায় নাকেমুখে রক্ত তুলে মুখ থুবড়ে মাটিতে পড়ে কাতরাতে কাতরাতে শেষমুহূর্তে কি ভেবেছিল ফটিক? আততায়ীর ছুরির ফলায় সে তার নিজের চোখের ছায়া দেখেছিল কি? অবিশ্বাসীর চোখ! আততায়ীর দিকে তাকিয়ে কোন চেনামুখ? ওই নীলুদা! যার শেষ মুহূর্তের ক্রুদ্ধ-ভঙ্গিটাকে এখনও ভুলতে পারে না সে। শরীরেমনে বিধ্বস্ত নরেশ হাঁটতে হাঁটতে, পথে অনেকগুলি সিগারেট নিঃশেষে শেষ করে গলির মুখ পেরিয়ে যখন কলেজ স্ট্রিটে পড়ল, চারদিকে সোরগোল তুলে তখন ভিড়ের মানুষ পালাচ্ছে। ট্রামের পর ট্রাম, সারিবাঁধা

গাড়ি অচল হয়ে আছে। বাসমোটরট্যাক্সিরিকশঠেলা সমস্ত রাস্তা জুড়ে খিচুড়ি পাকিয়ে সব বন্ধ করে দিয়েছে চারদিকে। মানুষের চিৎকার, দূরে দূরে বোমার শব্দ, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষের চিৎকারে কোলাহলে দিগদিগন্ত তোলপাড়। 'ওদিকে যাবেন না দাদা, ভীষণ গণ্ডগোল...' নরেশ দাঁড়ায় না, সম্মোহিতের মতো হাঁটে। এই সময়ের উপর দিয়ে আমরা হাঁটছি। 'ছাত্রদের মিছিল মশাই, হাজার হাজার লাখো লাখো ছেলে ...ষোল, সতের, আঠারো বছর বয়স...' দূরে, মনে হয় রাইফেলের আওয়াজ। নরেশ নতুন একটা সিগারেট ধরাল। 'নাউ ইউথ্ ইজ্ অন্ দ্য এজেণ্ডা...' গায়ে গায়ে ধাক্কা। মানুষ পিছনের দিকে পালাচ্ছে। যৌবনকে ভয়! কোলাহল, ভিড়, ঠেলাঠেলি, মানুষ, ভয়, সন্ত্রাস সব ঠেলে সামনের দিকে এগোতে এগোতে কেন যেন মনে হলো, পিছোবার কোন মানেই হয় না আর। ক্লাশের ব্যাকবেঞ্চার ফটিক আজ পথের নায়ক। তার মুখোমুখি দাঁড়াতে ভয়? খোকনদাকে মনে পড়ে। বুকের উপর থেকে পাথর সরে যায়। সারি সারি মুখের সারি, কৈশোরের-যৌবনের মুখ। তার প্রতিদিনের জীবিকায় সেই মুখ। কলেজ স্ট্রিট মহাত্মা গান্ধী রোডের মোড়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত পরিত্যক্ত নগরীর ভগ্নদশা। এমন কি, ফুটপাতের ফেরিওয়ালাও কেউ বসে নাই। জনশূন্য নগরীর প্রাসাদ চূড়ায় হিন্দী-ফিল্মের বিশাল হোর্ডিং-এ আলিঙ্গনবদ্ধ যুবকযুবতীর চুম্বন দুপুরের রোদে জ্বলছে। দখলকারী সৈন্যের মতো পুলিশ আর সি-আর-পির উঁচোন সঙ্গীনে শত্রুর প্রতীক্ষা। শত্রু! কোথাও কেউ নেই। বানভাসি জলের কল্লোচ্ছ্বাসে লাখো লাখো কণ্ঠস্বর। শব্দব্রহ্ম তোলপাড়। হঠাৎ যেন কিসের নেশা লাগল। চারদিকের তাক করা রাইফেলের সন্ত্রাসের মধ্যেও পুলিশের পাশ দিয়ে নেশাগ্রস্তের মতো রাস্তায় নামল নরেশ। এই মুহূর্তে, এ-অরণ্যে, যে-কোন মুহূর্তে হঠাৎ কিছু ঘটে যেতে পারে। রাস্তার পাগলের মতো সে এগোয়। খোকনদা! উন্মত্ত হিংস্রতার মাঝখানে দাঁড়িয়ে খোকনদা মরেছিল। কিংবদন্তি মনে হয়। দুদিক থেকে ট্রামরাস্তাগুলি এসে যেখানে দাবার ছকের চতুষ্কোণ তৈরি করেছে, ঠিক তার মাঝখানে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে তাকাল সামনের দিকে। পা টলছে, মাথাটা ঝিমঝিম্ করছে মনে হলো। স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে অসহ্য যন্ত্রণা। নরেশ নড়তে পারে না। ভয়ঙ্কর, বিশাল একটা ময়াল সাপ, রাস্তার এ-পাশ থেকে ও-পাশে, দুদিকের ফুটপাত জুড়ে

শুধু কালো সাপের বিশাল শরীরটা ক্রোধেক্ষোভেহিংসায় আর বিদ্বেষে ফুঁসতে ফুঁসতে, পাক খেয়ে খেয়ে, সারা শরীরে মোচড় দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উত্তরে, হয়তো-বা নিমতলার দিকে এগিয়ে আসছে। তার হিংস্র নিশ্বাসে রাস্তার ধুলো ওড়ে, লকলকে সহস্র জিহ্বা টুকরো টুকরো আগুন হয়ে দাউদাউ করে জ্বলে। প্রতিশোধের নেশা আক্রোশে ফুঁসছে। আর ঠিক মাঝখানে, প্রতিরোধের সব শক্তি যখন ভেঙে চুরমার, রাস্তার মোড়ে অচঞ্চল দাঁড়িয়ে নরেশ মুখোমুখি তাকায়। তার প্রতিদিনের জীবিকায় পরিচিত মুখের মিছিল। নীলুদা, এ-মুখ তুমি কোনদিন দেখোনি। ভারসাম্য রাখতে পারছে না নরেশ। শরীরটা ভেঙে ভেঙে পড়ছে। প্রচণ্ড আক্রোশে এগিয়ে আসছে ময়াল সাপ, সহস্র জিহ্বায় আগুন। জীবনে বহুবার পুলিসের লাঠিগুলির মুখোমুখি দাঁড়িয়েছ নীলুদা। বন্দুকের কুঁদোয় কোমরের হাড় ভাঙা তোমার। কিন্তু রাস্তায় এই ভয়ঙ্কর ময়াল তুমি দেখো নি কোনদিন। ক্লাশের প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে যে মুখ আমি প্রতিদিন দেখি। দেখতে হয়। নরেশের মনে হচ্ছে, তার পায়ের তলার শক্ত কালো পিচ যেন হঠাৎ উঁচু হয়ে উঠে আসছে। ঊর্ধ্বে, ঊর্ধ্বে সূর্যের দিকে উঠে যাচ্ছে সে। অবশ শরীরটা শক্ত হতে হতে যেন পাথর হয়ে, প্রস্তরমূর্তি হয়ে রাস্তার মোড়ে, ঠিক মাঝখানে, গান্ধীজি কি স্যর আশুতোষ কি নেতাজীর মতো, অর্থহীন সংজ্ঞাহীন শব্দ শুধু, নিষ্প্রাণ শব্দের মতো যাগযজ্ঞহোমপূজায় দেবতা বানানো বিগ্রহ হয়ে ওঠার আগে, ঠিক শেষমুহূর্তে, ময়াল সাপের নিশ্বাস গায়ে এসে লাগতেই অনুভব করল, গ্রানাইট পাথরের স্তম্ভের উপর সে হঠাৎ পাথর হয়ে গেছে। পুলিশের রাইফেল পাথরের মনীষীর বুক বেঁধে না, পাথরের চোখে মনীষী দৃষ্টিহীন। শুধু সজীব সতেজ জোয়ারে ছুটে আসে ভয়ঙ্কর ময়াল, একগুঁয়ে, গোঁয়ার। নেতৃত্বহীন। ক্রুদ্ধ আবেগে তেড়ে আসে, বাধা সরায়, পথের বাধা। বিচূর্ণিত হবার আগে চেতনায় ফিরে এসে, নিজেকে নতুন করে খুঁজে পেয়ে, আবিষ্কার করেন শিক্ষক শ্রীনরেশচন্দ্র মজুমদার, তাকে পথের পাশে সরিয়ে রেখে, প্রতিশোধের আগুন বুকে নিয়ে ছুটছে ময়াল। মাথার ফণায় অপঘাত-মৃত্যুর প্রতিবাদ। রোহিতাশ্বের শব।

নচিকেতা জানিতে চাহিলেন…

রাত তখন কত হবে। হাত-ঘড়িটা যদিও কব্জিতেই বাঁধা ছিল, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে, সময়ের হিসেব নেই, কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলেন, আচমকা নাড়া খেয়ে ধড়ফড়িয়ে উঠে বসতেই, একেবারে অবিশ্বাস্য এবং ভয়ঙ্কর দৃশ্যটার মুখোমুখি, প্রথম ধাক্কায় ঠিক যেন বিশ্বাসই করতে পারেন নি ডঃ এস্, সি, দাশগুপ্ত, অন্তত কয়েক পলক নিঃশব্দে তাকিয়ে থাকার পর, যখন শরীরের রক্তচাপ, কণ্ঠনালীর তেষ্টা, করোনারির সেই অস্থিরতাটা প্রায় একসঙ্গে তালগোল পাকিয়ে তীব্র বেগে ছুটে গিয়ে সেরিব্রায় ধাক্কা মারল এবং মাথার পরিপূর্ণ মসৃণ টাক থেকে ঘাড়গর্দান বেয়ে গলগল ঘামে-ঘামে জামাগেঞ্জি-পায়জামা ভিজে চপ্‌চপ্ হয়ে উঠতেই স্পষ্ট অনুভব করলেন—স্বপ্ন নয়, নিদারুণ বাস্তব, পায়ের তলায় মাটি নেই, মাটির উপর এক্সপ্রেস ট্রেন একটানা লোহার চিৎকার তুলে হুড়মুড় করে ছুটছে, সুন্দর সাজানোগোছানো নির্জন ফার্স্ট ক্লাশ কামরা, টিউবলাইটের নীলচে আলো, ঝক্‌ঝকে আরশি, ফ্যান-টিউব শেকলে-ঝোলানো সবুজ-রেক্‌সিনে-মোড়া বাঙ্ক, বাঙ্কের পাশে দরজার মাথায় লোহার শিকল, লাল-হাতল, লাল হরফে 'আলার্ম', হাড়খুলি আঁকা রেল-কর্তৃপক্ষের হুঁসিয়ারি, দূর থেকে শুধু কতগুলি কালো সরলরেখা, কিছুই পড়া যায় না, টেবিলের উপর চশমা নামিয়ে রাখলে দিনদুপুরেও যিনি সামনের বেঞ্চির ছাত্রছাত্রীদের পরিচিত মুখ দেখতে পান না, রাতদুপুরে তাঁর চোখে সবই আবছা আর ধোঁয়াটে এখন। কিন্তু হাত বাড়ালেই যে শরীরটা ছোঁয়া যায়, যার কোমরের কাছে তাঁর নাক, শক্ত-পায়ে দাঁড়িয়ে-থাকা সেই যুবক এবং তার হাতের জীবন্ত পিস্তলটা, নেহাতই যেন একটা খেলনা অথবা দু-আঙুলের ফাঁকে সিগারেটের মতো হালকা হেলাফেলার কোনো জিনিস, ঠিক তারই দিকে তাক করে নিঃশব্দে উঁচিয়ে। এবং সেই যুবক, লম্বা ছিমছাম, সার্টপ্যান্টজুতোর নিখুঁত বেশভূষায় সুন্দর চেহারার একুশ বাইশ বছরের স্মার্ট ইয়ংম্যান। মাথা তুলে তাকাতেই মনেহলো, গ্রহণের সূর্যের মতো

একজোড়া চোখ। একপলকে হঠাৎ, নিজেরই সন্তান দীপুকে মনে পড়ে। মুখের আদলে, পুরো চেহারায় আশ্চর্য মিল। এবং এখন, এই মুহূর্তে পাথরের মতো জমে আসছে শরীর। মাঝপথের কোন এক জংশন থেকে হঠাৎ উঠল, নিঃশব্দে শুয়েবসে কাগজের-মলাট-ঢাকা কি একটা বই পড়ল দুপুর থেকে সন্ধে। যদিও প্রায় ত্রিশ বছরের অধ্যাপকজীবনে ছাত্রছাত্রীদের নাগাল থেকে দূরে দূরে থাকার অভ্যাসটাই মজ্জায় মিশে আছে, তবু এখন, যেন ভাবাই যায় না, হাজার মাইলের ট্রেনযাত্রার বিরক্তিতে নিজের কাজ ফেলে সহযাত্রী এই যুবকের সঙ্গেই তার কথা বলার সাহস হয়েছিল সন্ধেবেলা। এবং তখনই জেনেছিলেন, ইনজিনিয়ারিং-এর ছাত্র। দীপুরই মতো এক বয়সী, সতীর্থ। ঠিক মাথার উপর আলো রেখে স্থির। ডানে বাঁ-এ সামনে পিছনে কোথাও তার ছায়া নেই। আলোর পোকাগুলি ঘুরপাক খেয়ে চোখেমুখে বিরক্ত করলেও চোখের পলক ওর কাঁপছে না এতটুকু।

এবং এই মাঝরাত্তিরে, এক্সপ্রেস ট্রেনটা যখন কালো অন্ধকার ঠেলে প্রতিমুহূর্তে প্রতিগজ অচেনা ভারতবর্ষ পেরিয়ে তীব্রবেগে ছুটছে, মাঝে মাঝে হুইসেলের গর্জন, কানে অভ্যস্ত-হয়ে-ওঠা লোহার ঝনঝন এখন আর চেতনার মধ্যে নেই। সহযাত্রী যে মাড়োয়ারি পরিবারটি দিল্লী থেকেই সঙ্গে ছিল, তারাও নেমে গেছে, রেলের অ্যাটেন্‌ডেন্ট ভদ্রলোকও বেঘোরে ঘুমোচ্ছেন কোথাও। নিঝুম ফাঁকা রেলের কামরাটা শূন্যে ভাসছে, দোল খাচ্ছে দু পাশে। রাতদুপুরের অন্ধকারে বিরাট একটা সেতু পেরোচ্ছে রেলগাড়ি। ব্রিজটা যেন ফুরোবার নয়, গুরগুর শব্দটা বুকের ভিতর। বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে থাকেন ডঃ দাশগুপ্ত। জীবনের জন্য এত করুণভাবে কখনও তাকাননি, হাসপাতালের ডাক্তারের দিকেও না। রুমালের জন্য পাঞ্জাবির পকেটের দিকে হাতটা নামাতেই হঠাৎ, একটা প্রচণ্ড শব্দে থরথর কেঁপে উঠলেন। এক ঝটকায় মনে হয়েছিল, বুঝি গুলিরই শব্দ, কিন্তু নিজের মধ্যে ফিরে আসার পর যখন বুঝলেন, শক্ত মেঝেতে ছেলেটির ভারি জুতোর পা ঠোকার শাসন, ঘেমেনেয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে করুণভাবে তাকালেন।

'একটা পয়েন্টেড রিভলবারের মুখোমুখি কখনও পকেটে হাত দিতে নেই। আপনি নিশ্চয়ই জানেন...'

অবশেষে সেই শব্দহীন যুবক কথা বলল। হয়তো পিস্তলটাও কথা বলবে এক্ষুনি। ডঃ দাশগুপ্ত অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

'হাত তুলুন...'

পোষ-মানানো কুকুরের মতো হাতদুটো তুলতেই মাথার উপরে বাঙ্কটায় আঙুলগুলি ঠেকল।

'দাঁড়ান...'

দাঁড়াতেই হয়।

'এদিকে আসুন...'

পিস্তলের শাসন। মহাপ্রভুর মতো দু-হাত তুলে, মেদবহুল বিশাল শরীর নিয়ে দাঁড়াতেই পায়ের তলায় একটা স্লিপার পাওয়া গেল, একটা পাওয়া গেল না, এবং এক পায়ের চটি টেনেই এগোতে লাগলেন। এবার কী দেয়ালে পিঠ ঠেসে সোজা শক্ত হয়ে দাঁড়াতে বলবে? এতটা নৃশংস হবে এই বয়সের একটা ছেলে?

সাহস করে মাথা তুলতেই হঠাৎ শিউরে উঠলেন, আততায়ীর চোখ নয়, নিজেরই বীভৎস মুখ। ঝকঝকে আরশিতে নিজেরই স্পষ্ট প্রতিচ্ছবি। আরশির পাশে ব্র্যাকেটের হুকে ঝুলছে ওয়াটার ব্যাগ, ফ্লাস্ক। তালে তালে দুলছে, ডানে বাঁয়ে, এপাশে ওপাশে। প্রচণ্ড গতি আর পায়ের তলায় সবকিছু গুঁড়িয়ে-দেওয়া লোহালক্কড়ের শব্দের মধ্যে নির্জন কামরাটা স্থির গৃহের মতোই মনে হয়। ভূমিকম্পে কাঁপছে শুধু। বুকের ভিতর পাঁজরাদুটোও আলগা হয়ে দুলছে, তেষ্টায় গলা শুকোচ্ছে, পিস্তলের নলটার শান্তভঙ্গি। আর আরশিতে নিজেরই একজোড়া চোখ চোখে পড়তে জমাট রক্তের চাপে অসহ্য যন্ত্রণা। পেট থেকে একটা খিঁচুনি সেরিব্রা পর্যন্ত। থপথপ করে এগোতে এগোতে হঠাৎ ঝিঁঝিঁ-ধরা অবশ পায়ের উপর ভারি শরীরটা সামলাতে না পেরে, ডঃ দাশগুপ্ত হুমড়ি খেয়ে টলে পড়লেন ওদিকের ফাঁকা সিটটায়। সেই সিটটা, যেখানে টান হয়ে শুয়ে সারাদুপুর অশ্লীলভাবে নাক ডেকে-ডেকে পড়ে পড়ে ঘুমিয়েছে মাড়োয়ারি ব্যবসায়ী। এবং উপুড় হয়ে পড়েই দু-হাতের পাতার উপর কাঁধের ভর রেখে, মাথাটার উপর নিয়ন্ত্রণশক্তি সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়ে, যেন বলির হাঁড়িকাঠ অথবা গিলোটিন্ অবধারিত সত্য এখন, গর্দানটা ঝুঁকিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। চোখ তুলে তাকাবার সাহস নেই। পিস্তলের মুখোমুখি দাঁড়াবার অভিজ্ঞতা এই প্রথম। জীবনের এত অসংখ্য বছর পেরিয়ে এসে লক্ষ লক্ষ বই-এর পাতা, পাতার পর পাতা ওল্টানোর পর চোখের ছানিকাটা শেষ করে যখন সব ঝাপসা, লোহালক্করের

প্রচণ্ড শব্দের মধ্যেও বাতাসে বই-এর পাতা ওড়ার খসখস খসখস্ শব্দ শুধু, সারাটা জীবন ধরে শুধু বই, বই, বই···ফাইল, কাগজপত্তর, পেপারস্, থিসিস, আলমারি, র‍্যাকের পর র‍্যাক বই, বই-এর পাহাড়, হাজার হাজার যুবক যুবতী, ছাত্রছাত্রী, ত্রিশ বছরের অধ্যাপকজীবনের পুরো হিসেব নেই, চেনা-অচেনা কত অসংখ্য মুখের মিছিল···বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ অধ্যাপক, হেড অব দ্য ইকনমিকস্ ডিপার্টমেন্ট, প্রোপোজ্‌ড্ ভি সি, প্ল্যানিং কমিশনের সদস্য, পদ্মশ্রী···ভাবাই যায় না, জীবনের এত অসংখ্য সাফল্যের সেতু ডিঙোবার পর আজ, অ্যাগ্রো-ইকনমির উপর তার নতুন থিসিসে যেখানে কৃষি ভারতবর্ষের গোটা চেহারাটাই বদলে যেতে পারে, যাতে ইতিমধ্যেই দিল্লীতে যোজনাভবন থেকে প্রধানমন্ত্রীর খাসকামরা পর্যন্ত আন্দোলিত, পদ্মভূষণ থেকে ভারতরত্নের দিকে নিশ্চিত যাত্রায় হয়তো-বা জাতীয় অধ্যাপক, হয়তো-বা রাজ্যসভায় পা রেখে সেন্ট্রাল কেবিনেট, কোথাও বড়োসড়ো অ্যাম্বেসেডর কি হাই-কমিশনারও হয়তো লবির জোরে অসম্ভব নয়, ঠিক তখনই অকস্মাৎ, নিছক প্রাণভিক্ষার জন্য এত করুণভাবে আজ··· ধুঁকতে ধুঁকতে আড়চোখে তাকালেন ডঃ দাশগুপ্ত, মেঝের উপর শান্তভঙ্গিতে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজোড়া কালো জুতো, চকচকে পালিশ, জুতো থেকে শক্ত গাছের মতো বেড়ে ওঠা সরু প্যান্টের ক্রিজ্। জীবনের শেষ কয়েকটা মুহূর্ত এখন, হয়তো শেষ রাত। ঠাণ্ডা হয়ে জমে আসছে শরীর। অথচ অসহ্য গরম। গলগল ঘাম। মাথা তুললেন। শীতাতপনিয়ন্ত্রিত কামরার বন্ধ জানালার কাচে কৃষিঅর্থনীতির ভারতীয় দিগন্ত···মাঠ আর মাঠ, দূরে দূরে বিলীন গ্রাম, গাছ নদী কুঁড়েঘর বুভুক্ষু মানুষ অমাবস্যার গাঢ় অন্ধকারে একাকার কুচকুচে কালো ব্ল্যাকবোর্ড। জানালার-কাচে আলোকিত কামরার অস্পষ্ট ছবি। নিজেরই বীভৎস মুখ এবং পিস্তল উঁচিয়ে সেই কম্পনহীন যুবক। এবং অধ্যাপক, এই রুদ্ধশ্বাস ঘরটায় যখন দমবন্ধ হয়ে হৃদযন্ত্রে একটা ঝড়ের আশঙ্কায় হাঁপাচ্ছেন, যখন ধরাশায়ী হয়ে লুটিয়ে পড়ার সময়, অকারণ গুলি খরচ না করেই যখন জিতে যাচ্ছে পিস্তলটা, ঠিক তখনই পাথরের মূর্তি করুণাময় ঈশ্বরের কাছে সকাতর জিজ্ঞাসার মতো ভিতর থেকে হঠাৎ উগড়ে তুললেন বাক্যটা, ফ্যাসফেঁসে গলা—'আমাকে মারবে তুমি?'

'বুঝতেই পারছেন···'

'এ-জন্যে, শুধু এ-জন্যে তুমি আমার পিছু নিয়েছ?'

'আজ নয়, অনেকদিন থেকেই আমরা সুযোগ খুঁজছি...'

'অনেকদিন !'

'অনেক বছর...'

যুবকটি এগিয়ে আসে। হৃদযন্ত্রের উপর স্টেথিস্কোপের মতোই পিস্তলের নল। পাঞ্জাবি আর গেঞ্জির তলায় বুকের চামড়ায় স্পর্শটা অনুভব করলেন অধ্যাপক—'আমি তো কোনদিন কোন অপরাধ করিনি।'

'এ-যুগে আমরা কেউই নিজেদের অপরাধ সম্বন্ধে সতর্ক নই...'

'কিন্তু বিশ্বাস করো, আমি...'

'দি ওঅর্ল্ড অ্যারাউণ্ড আস ইজ ইয়োর ক্রিয়েসান...'

'পেরেন্টাল ডিউটি, ইউ অ্যাক্সেপ্ট ইট্ ?'

'ইট্ করাপ্ট্স্, অ্যাণ্ড উই ব্লিড...'

'ইউ ক্যান বিলিভ মি, অ্যান এডুকেশানিস্ট অল দ্য লাইফ, আই শেয়ার ইয়োর ফিলিং...'

'জীবনে কতবার প্রতিবাদ করেছেন ?'

'প্রতিবাদ !'

'ঢাকা জগন্নাথ কলেজের লেকচারশিপ থেকে দিল্লীর প্ল্যানিং কমিশন পর্যন্ত ত্রিশ বছরের কেরিয়ার তৈরিতে সব কিছু মাথা পেতে অ্যাকসেপ্ট না করে প্রিভেলিং অর্ডারের বিরুদ্ধে কতবার প্রতিবাদ করেছেন ? ফিউ একজাম্প্ল্স্...'

পিস্তলের নলটা বুকের উপর খেলা করে। এবং সেই অর্বাচীন যুবার দিকে অপলক তাকিয়ে থেকে হঠাৎ, নিতান্তই আকস্মিক, পায়ের তলায় মাটির অস্তিত্ব টের পেয়ে অধ্যাপক চমকে উঠলেন। মনে হচ্ছে, রেলের গতিটা কমে-কমে আসছে. পায়ের তলায় লোহালক্কড়ের শব্দগুলি বদলে বদলে যাচ্ছে, ঘনঘন হুইস্‌ল্। এবং মনে হতেই একটু স্বস্তিতে, ক্ষীণ আশায় ভিতরে ভিতরে ঝিম্‌ধরা শরীরটায় হঠাৎ রক্ত-চলাচলের স্পন্দন অনুভব করলেন। পাখাগুলি ঘুরছিল মাথার উপর, যেন বাতাস ছিল না, অনেকক্ষণ পরে ঠাণ্ডা বাতাসের ছোঁয়া লাগল ঘর্মাক্ত শরীরে। তবু খটকা লাগে। অবচেতনের ভ্রান্তি অথবা বাস্তব! ট্রেনটা কি সত্যি থামছে কোথাও ? সত্যি কোন স্টেশন এলো! যেন একটু নিশ্চিন্ত হতেই, ঊর্ধ্ববাহু হয়ে বাঁ-দিকে মাথাটা ঘুরিয়ে একটু দেখতে চাইলেন। কাচের জানালায়,

কিছুই দৃশ্যমান নয়। কৃষি-অর্থনীতির ভারতীয় দিগন্ত মিশ্‌মিশে কালো ব্ল্যাকবোর্ড, চকখড়ির দাগে স্ট্যাটিসটিক্‌সের জটিল অঙ্কের মতোই পিস্তল-হাতে-যুবকের অস্পষ্ট ছায়া, মোলায়েম চুলগুলি বাতাসে ফুরফুর করে না উড়লে যাকে রক্তমাংসের মানুষ বলে মনে করাটাও দুঃসাধ্য হতো, স্থির দাঁড়িয়ে থেকে পিস্তলটা তাক করে আছে। অধ্যাপক যতই ঘুরুন, যেন পিস্তলের নলের সঙ্গে তার সহজ সরলরেখার সম্পর্কটা ঘুচবার নয়। অথচ এখানেই একটা ছেদ চাইছেন তিনি। এবং স্পষ্ট বুঝতে পারছেন, ভয়টা আর ভয় থাকছে না, আস্তে আস্তে দুঃসাহস মাথা চাড়া দিয়ে উঠছে। তলায় ট্র্যাক বদলে-বদলে গাড়িটা সত্যি মন্থর হয়ে আসছে। নিশ্চয়ই কোন স্টেশন। স্টেশন মানেই, রাতদুপুরের নিঝুম প্ল্যাটফরম সত্ত্বেও আর.পি.এফ, রেল-কর্তৃপক্ষ, সহযাত্রী কয়েক হাজার মানুষ। মৃত্যুটা যদি অবধারিতই হয়, তবে অন্তত শেষ চেষ্টা হিসেবে ঝাঁপিয়ে পড়া যায় একবার। হত্যা করার আর নিহত-না-হবার শেষ-লড়াই-এ যদি পিস্তলটা কেড়ে নেওয়া না-যায়, যদি হেরে যেতেই হয়, মেঝেতে-গড়ানো দুজন মানুষের ছুটোপাটিতে রেলের অ্যাটেনডেন্ট ভদ্রলোক জেগে যেতেও পারেন, আশপাশে আরও কিছু মানুষ ছুটে আসতে পারে। আততায়ী ধরা পড়বে। এবং পুরো ভাবনাটা চরম স্তরে চাগিয়ে ওঠার আগেই একমুহূর্তে ভয়েসন্ত্রাসে ভড়কে গিয়ে আর্তনাদ করে দু পা পিছিয়ে গেলেন অধ্যাপক। চোখের পলকে ছেলেটিও দু কদম লাফ মেরে এগিয়ে গেল। ভাঁজ-করা কনুইটা হঠাৎ টানটান করে একেবারে অধ্যাপকের বুকের উপর।

ছেলেটির কুঁচকে-আসা চোখজোড়ার দিকে স্থির পলকে তাকিয়ে থেকে আত্মরক্ষার ভাবনাগুলি হারিয়ে ফেললেন অধ্যাপক। আনকম্‌প্রোমাইজিং ইয়ুথ! গাড়িটা প্ল্যাটফরম ছুঁয়ে দাঁড়াবার মুখেই হয়তো, ঠিক বুকের উপর পিস্তলের নল রেখে পরপর তিনটে কি চারটে গুলি…রক্ত-ধোঁয়া-চিৎকার, মাঝ রাত্তিরের ঝিমনো স্টেশন তোলপাড় করে জনতা-পুলিশ-কুকুর, এবং ভিড়ের মানুষ আর অন্ধকারের মধ্যে দৌড়ে উধাও এই যুবক… হয়তো পালানোর সমস্ত পরিকল্পনা সে ভেবেই রেখেছে…সম্ভাব্য দৃশ্যগুলি ভাবতে ভাবতে অধ্যাপক যখন তার গোড়ালির উপর নিজের শরীরের ভার হারিয়ে টলে পড়ছিলেন, ঠিক তখনই পাশাপাশি…কলকাতা…বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে নতুন বাড়ি, সাজানো ড্রইং-রুম, স্টাডি লাইব্রেরি স্ত্রীপুত্র

কন্যা, দীর্ঘ সাত বছর পরে অক্সফোর্ড থেকে ফিরছে বড়োছেলে, তার প্রায়-ভুলে-যাওয়া মুখ…মেয়েটার 'মেরিকাযাত্রা প্রায় ঠিক, এ-বছরই ইঞ্জিনিয়ারিং কম্‌প্লিট করছে ছোটছেলে দীপু…দিল্লী…দিল্লী এম-পি কোয়ার্টারে বন্ধুর আতিথ্য, ইউ-জি-সি-র পাঁচতলা প্রসাদ, যোজনাভবন, প্রধানমন্ত্রীর খাসকামরা, সারা ভারতের বুদ্ধিজীবী মহল, সেমিনার কনফারেন্স কনভোকেশান-লেকচার কালচারাল-ইকনমিক মিশন…তালগোল পাকিয়ে সমস্ত স্মৃতিগুলি করাতের দাঁত দিয়ে তার মগজ চিড়ছিল।

এবং তখনই, অধ্যাপক বিশ্বাসই করতে পারছেন না, ছেলেটি তার বুকের উপর থেকে পিস্তলটা হঠাৎ তুলে নিয়ে, দু পা পিছিয়ে, দাঁতেজিবে অদ্ভুত এক শব্দ করে তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল—'বুঝতেই পারছেন, ইচ্ছে করলেই এর মধ্যে আপনাকে খুন করতে পারতাম…'

ঊর্ধ্ববাহু অধ্যাপক তখন ক্লান্তি অবসাদ বিহ্বলতায় ভগ্নপ্রায়।

'অ্যাণ্ড ইট্‌ ইজ মাই টাস্‌ক্…আই মাস্ট ডু ইট্‌…'হঠাৎ জুতোশুদ্ধ্ ডান পা-টা কোণের দিকে অধ্যাপকের বার্থের উপর, ঠিক যেখানে তাঁর বিখ্যাত থিসিসের একটা টাইপ কপি, যা তিনি দিল্লী থেকে সঙ্গে এনেছেন, প্রায় তারই উপর পা রেখে কোমর থেকে পিঠ পর্যন্ত বাঁকিয়ে হাঁটু থেকে মাঝারি-ঘেরের প্যান্টটা তুলতে তুলতে অনেকখানি তুলে, পিস্তলটা কোথায় যেন রেখে, প্যান্টটা আবার গুটিয়ে নিয়ে স্প্রিং-এর মতো লাফিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল—'হাত নামান…'

হাত! হাতদুটো আর নামাতে পারছেন না অধ্যাপক। অবশ। সামান্য চেষ্টাতেই কোমরের ডানদিক, বাঁদিক, পিঠের শিরদাঁড়া, দুটো কাঁধ একসঙ্গে টনটন করে উঠল। আশ্চর্য! চেষ্টা করছেন কিন্তু পারছেন না। শরীরের গিঁটে-গিঁটে যন্ত্রণা। অথচ বুঝতে পারছেন, পায়ের তলায় আর কোন লোহালক্কড়ের শব্দ নেই। বিরাট জংশন স্টেশনের শেডের তলায় গাড়িটা এসে দাঁড়িয়েছে। জানালা দিয়ে দেখা যায়, নির্জন প্ল্যাটফরম ভরে নীলচে আলো, দূরে দূরে মধ্যরাত্রির হকারদের ভূতুড়ে গোঙানি। জীবনে বাঁচতে হলে তাঁকে এক্ষুনি, এক্ষুনি একটা কিছু করতে হবে। কত পরে আবার স্টেশন! কিন্তু তার আগেই…ব্যথায়যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে, দাঁতমুখ খিঁচে শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে ঊর্ধ্ববাহু হাতদুটো নামাতে গিয়ে অধ্যাপক শুনছেন, দয়ামায়াহীন নিষ্ঠুর অর্বাচীন সেই যুবক

তখনও কানের কাছে মুখ এনে চাপাগলায় ফিসফিস করে বলছে—'আর একটা স্টেশন পর্যন্ত সময় দিলাম। ভেবেচিন্তে উত্তর দিন, গত ত্রিশ বছরে কম্প্রোমাইজ্ না করে কতবার প্রোটেস্ট করেছেন? ভাবুন, আদারওয়াইজ ইউ উইল এভার ফাইণ্ড মি এ শ্যাডো বিহাইণ্ড ইউ, অ্যাণ্ড নেভার আন্আর্মড...'

যুবকটি হঠাৎ গিয়ে ল্যাভেটরিতে ঢুকল। যেন অনেকক্ষণ ধরে প্রয়োজনটা জমা হচ্ছিল তার।

এবং বিহ্বল অধ্যাপক অভাবনীয়ভাবে হঠাৎ লটারির মতো জীবনটা বকশিশ পেয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ়তায় কিছুক্ষণ ঠিক বিশ্বাসই করতে পারলেন না, এ-রকম একটা কিছু ঘটতে পারে, বা আদৌ সম্ভব! অথচ বাঁচতে হলে এই সুযোগ। শরীরটা একটু টানতেই কনুই-এ, হাঁটুতে, মাজায়, পিঠে, কাঁধের দু-পাশে, দেহের গাঁটে-গাঁটে টনটন যন্ত্রণায় কাৎরে উঠলেন। মাথার মগজ করাতে চিড়ছে। থপ্থপ্ পা ফেলে, টলতে টলতে নিজের বার্থে ছড়ানো হোল্ডঅলের উপর আছড়ে পড়ে হাঁপাতে লাগলেন। ডানহাতে বুকের বাঁ-দিকটা চেপে ধরে দাঁতে দাঁত চেপে ঘন নিশ্বাসে একটু সামলাতে চাইলেন নিজেকে। বুকের ধড়ফড়ানিটা কি বাড়ছে! সর্বনাশ! মাথার কাছে বালিশের তলায় শিশিটা হাতড়ালেন। রেলে বা প্লেনে একা চলতে হলে রাখতেই হয় সঙ্গে। কিন্তু সময় নেই। গাড়ি দাঁড়াবে না বেশিক্ষণ। ভাবনাটা মাথায় টোকা দিতেই থাবলা দিয়ে ফোলিওব্যাগটা টেনে নিলেন। অনেক সরকারি নথিপত্র আছে এতে, ভীষণ জরুরি, আর...কৃষি অর্থনীতির উপর থিসিসটা!...অসম্ভব, মরে গেলেও যেটা সঙ্গে রাখতেই হবে তাকে। আর কিছু! হোল্ডঅল, বিছানা, বাঙ্কের উপর সুটকেশ, বেশ কয়েক সেট বিলিতি স্যুট্, ক্যামেরা, টাইপরাইটিং মেশিন...ভাবলেনও না একবার। সময় নেই ভাববার। ডালার ভিতর ভয়ঙ্কর সাপটা চাপা পড়ে আছে, আর যদি...দ্রুত একবার ল্যাভেটরির বন্ধ দরজাটার দিকে তাকালেন, যেন পিস্তলটার মতোই, যে কোন মুহূর্তে খুলে যেতে পারে, এবং খুললেই বিপদ। আর ভাবলেন না, শরীরের ব্যথা বেদনা-যন্ত্রণার কথাও না। মোমের মতো গলে-গলে ভিজেছেন এতক্ষণ, গায়ের চামড়ায় লেপটে আছে গেঞ্জি, আদ্দির পাঞ্জাবি, ঘামের দুর্গন্ধ। চপচপ করছে গা, অসহ্য বিরক্তি। দেহের আপত্তি সত্ত্বেও যতটা সম্ভব তাড়াহুড়ো করে ফোলিও ব্যাগ আর থিসিসের ফাইল গুটিয়ে নিয়ে টলতে টলতে হাতড়ে হাতড়ে দরজার কাছে এগিয়ে

এলেন। দরজাটা খুললেন। একবার শেষবারের মতো তাকাতে ইচ্ছে করল। অনেক কিছু ফেলে যেতে হচ্ছে, অনেক টাকার জিনিস। সবই তুচ্ছ। চমকে উঠলেন, ল্যাভেটরির দরজায় যেন শব্দ হলো একটা! দরজা ঠেলে দ্রুত প্ল্যাটফরমের উপর লাফিয়ে পড়লেন। যদিও আর ধকল সইতে না পেরে ক্লান্ত বিধ্বস্ত, হাঁপাচ্ছেন, তবু নির্জন ফাঁকা প্ল্যাটফরমটায় নেমেই বেশ একটু আরাম বোধ করলেন। অচল শরীরটা নিয়ে এগোতে যাবেন, আচমকা কোত্থেকে ছুটে এলো কতগুলি রাইফেলধারী পুলিশ, সি-আর-পি আর আর-পি-এফ-এর বড়োকর্তা, এস-আই, কালো-কোট-পরা স্টেশনের বড়োসাহেব এবং লম্বা-কাগজ-হাতে সেই অ্যাটেন্‌ডেন্ট ভদ্রলোক। চোখে ঘুম কাটেনি তখনও, তাকে ঘিরে ফেলল চারদিক থেকে। আচমকা এতগুলি ভারি জুতোর শব্দে বুকটা কেঁপে উঠলেও এবং প্রথম ধাক্কায় বেশ বিরক্তি সত্ত্বেও অধ্যাপক তার চারদিকে এতগুলি রাইফেল এবং অফিসার দেখে খুশিই হলেন। হাতের ব্যাগ আর ফাইলটা মেঝেতে নামিয়ে ধীরেসুস্থে একটু জিরোবার সময় পাওয়া গেল।

'এক্‌স্‌কিউজ্‌ মি স্যর, আপনি ডঃ দাশগুপ্ত? নাম্বার থার্টি-নাইন রিজার্ভ-বার্থের প্যাসেঞ্জার?'

'হুঁ...'

'নামলেন কেন?'

'আমার খুশি...' চোয়াল-থুতনি-গলার উপর লম্বা-লম্বা টানে রুমাল ঘষতে ঘষতে অধ্যাপক নিস্পৃহ উত্তর দিলেন—'এনিথিং মোর?'

'আজ্ঞে না, একটা ইনভেস্টিগেশনের জন্যে কিছু জানার ছিল।'

'বলুন।'

'আচ্ছা একটা ছোকরা...এই ধরুন, বছর কুড়ি-বাইশ বয়েস হবে, ফর্সা ছিপ্‌ছিপে গড়ন, অ্যাভারেজ হাইট, ফার্স্ট-ক্লাসের টিকিট কিন্তু রিজার্ভেশন নেই। এ-রকম কেউ আপনার কম্‌পার্টমেন্টে উঠেছিল?'

বিস্তীর্ণ কপাল থেকে হাতের রুমালটা সোজা মাথার-টাক পর্যন্ত উঠেছিল, ঠিক তালুতে গিয়ে আটকে গেল। ঝিম মেরে অফিসারের দিকে স্থির পলকে তাকিয়ে রইলেন অধ্যাপক।

'আমাদের কাছে রিলায়েব্‌ল্‌ খবর আছে স্যর, এ-ছোঁড়া এই গাড়িতেই আছে। আন্‌লাইসেন্‌স্‌ড্‌ আর্ম্‌স্‌ নিয়ে ঘুরছে।'

'এত জানেন ছেলেটার নাম জানেন না ?'

'সবই জানি…' পকেট থেকে একটা কাগজের তাড়া বের করে টর্চের আলো জেলে অনেক কষ্টে একটা নাম পড়লেন ইন্‌স্‌পেক্‌টার—'দীপায়ন দাশগুপ্ত…'

'কী বললেন ?' সারা শরীরে নাড়া খেয়ে চমকে উঠলেন অধ্যাপক—'ডাকনাম জানেন ?'

'না।'

'বাবার নাম ?'

'কয়েকটা নাম পেয়েছি। ঠিক স্যাঙ্গুইন হতে পারিনি এখনও।'

'ঠিকানা ?'

'স্যরি স্যর …'

ধাক্কার পর ধাক্কায় অধ্যাপক বুকের ভিতর আবার সেই যন্ত্রণা অনুভব করলেন। সেই মুখ, তীক্ষ্ণ চোখজোড়া এখনও বিভীষিকা। কিন্তু এই নাম কেন ? একটা নামের চমক ! অধ্যাপক আবার তার স্বাভাবিকতায় ফিরতে চাইলেন—'এখন কী করবেন আপনারা ?'

'গোটা ট্রেন আগাপাশতলা কুম্বিং চলবে।'

'ওকে ধরবেন ?'

'উই আর ডিটারমিন্‌ড্‌…'

'ফাঁসি দেবেন ?'

'সে কোর্ট জানে।'

মেঝে থেকে ব্যাগ আর থিসিসের ফাইলটা তুলে নিয়ে অধ্যাপক হাসলেন—'সে ছোঁড়া তো পালিয়েছে। খুঁজছেন কাকে ?'

সবগুলি মানুষ প্রায় একসঙ্গে চমকে উঠল—'মানে। আপনি দেখেছেন নাকি ?'

'আমার কম্‌পার্টমেন্টেই তো ছিল।'

'তারপর ?'

'গাড়িটা যখন ইন্ করছে, স্পিডটা কমে আসতেই, অধ্যাপক একে একে সবগুলি কুতকুতে চোখের দিকে তাকিয়ে নিজের পরিত্যক্ত কামরার দিকে ঘাড় ফেরালেন একবার—'দেখছেন না, সেই থেকে ঘামছি। হোআট এ ফ্র্যান্টিক

অ্যাণ্ড ডেস্‌পারেট অ্যাটেম্প্‌ট টু ইগ্‌নোর ডেথ্‌। রানিং ট্রেন থেকেই হঠাৎ অন্ধকারে লাফ…'

হঠাৎ একটা সশব্দ উত্তেজনা। একসঙ্গে সবগুলি চোখ তখন পিছনের দিকে। আর-পি-এফ-এর বড়োসাহেব উত্তেজনায় টুপি নামিয়ে মাথার চুল মুঠো করে ধরেছেন—'কোথায় বলুন তো? কত মিনিট আগে?'

'কোথায় কী করে বলব? ধরুন, প্রায় মিনিট পনের…'

হাতের পেন্‌সিল গালে ঘষছেন রেলের অফিসার। কব্জিতে হাতঘড়ি দেখছেন—'সাম্‌ হোয়ার নিআর সাউথ কেবিন। আপনি চেন টানলেন না·কেন?'

'আই ওঅজ বিওয়েল্‌ডারড্‌, কম্‌প্লিট্‌লি লস্ট…'

'আচ্ছা, কোন চিৎকার শুনেছেন? আই মিন্‌…'

'রান ওভার?'

'ইয়েস ইয়েস…'

অধ্যাপক হাসলেন—'মনে হয় না, ও ছোক্‌রা অত সহজে আপনাদের প্রমোশনের ব্যবস্থা করে দেবে।'

'হোআট ..'

মানুষগুলিকে নিঃশব্দে উপেক্ষা করে অধ্যাপক জটলা থেকে বেরোতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের আর-পি-এফ-এর প্রধান অফিসার বুক পকেট থেকে দড়ি-বাঁধা হুইস্‌ল্‌ খুলে কানের কাছে এমন জোরে বাজাতে শুরু করলেন যে, মধ্যরাত্রির নির্জন স্টেশনটায় তীব্র এবং কর্কশ বাঁশিটা চারদিকে অসম্ভব তোলপাড় তুলে দিলো এবং বিরাট ফাঁকা প্ল্যাটফর্মে আলোঅন্ধকার গলিঘুপচি থেকে পালে-পালে ঝাঁকে-ঝাঁকে রাইফেল-হাতে-পুলিশ, প্রায় শ-এর কাছাকাছি, এতক্ষণ যে ওরা কোথায় ছিল, ছুটে এসে, ভারি বুটজুতোর আওয়াজে রেলের কুলিপ্যাসেঞ্জার ঘুমন্ত-ভেণ্ডার সবাইকে সন্ত্রস্ত করে সারি বেঁধে ফল-ইন। দেখতে দেখতে পুলিশ লাইনটা অফিসারদের পঞ্চাশ ষাট গজ লম্বা হাত হয়ে উঠল, যে-হাত বাড়িয়ে অন্ধকার খাবলে খাবলে আলপিন খুঁজে আনা যায়। তারই একটা দল হাতে-হাতে রাইফেল উঁচিয়ে সোরগোল তুলে ঝাঁপিয়ে পড়ল প্ল্যাটফরমের বাইরে সাউথ-কেবিনের অন্ধকারে। বাকিরা হিংস্র নেকড়ের মতো রেলগাড়ির কামরায় কামরায় দরজায় দরজায় দলে মাড়িয়ে টেনেহিঁচড়ে হুলস্থূল বাধিয়ে দিতেই নারীশিশুবৃদ্ধযুবকের কান্নায়

চিৎকারে উত্তেজনায় তুলকালাম বীভৎস হট্টগোল। কুম্বিং! অসহায় স্থবির অধ্যাপক ব্যাগটা খুলে পাইপ বের করলেন। পাউচ আর দেশলাই। চমকে উঠলেন, সামনেই কতগুলি ছেলেকে পেটাতে পেটাতে টেনেহিঁচড়ে নিয়ে চলেছে পুলিশ। খোলা-রিভলবার-হাতে একজন ইন্‌স্‌পেক্‌টরের অকারণ লাথি। ওরা চিৎকার করছে, সবাই জোয়ান। বয়সই ওদের শত্রু। হুঙ্কারকান্নাচিৎকার সমুদ্রমন্থনের বীভৎসতায় থরথর কেঁপে উঠলেন অধ্যাপক। শিকারী কুকুরের ক্ষিপ্রতায় তাঁরই কামরায় ঢুকছে ওরা। উন্মুক্ত-পিস্তল-হাতে অফিসার, বন্দুক উঁচনো পুলিশ। তামাক-ভরা পাইপটা দাঁতেই আটকে থাকে, জ্বালতে ভুলে যান। পা থেকে মাথা পর্যন্ত দাউদাউ আগুন, দম বন্ধ হয়ে আসে। আর ভাবতে পারেন না। টলতে টলতে এগোন। কোথাও বিশ্রাম চাই। ওয়েটিং রুম, রিটায়ারিং রুম, অন্তত সামনের খালি বেঞ্চিটা। বন্দুকের কুঁদোয় ল্যাভেটরির বন্ধ দরজাটা ভাঙবে ওরা। ভাঙবেই। তারপর! অধ্যাপক টলছেন, এগোতে এগোতে বারবার ভেঙে ভেঙে পড়ছেন। দীপু! দীপু! দীপায়ন দাশগুপ্ত! একটা নাম! শুধু নামের মধ্যেই বিদ্যুৎ ঝলকায়। হি কুড্‌ হ্যাভ বিন্‌ মাই সান, হি ইজ··· চোখের পাতায় লেপটে আছে ক্রুদ্ধ ভয়ঙ্কর চোখজোড়া, নড়তে চায় না। দুহাতে জড়াতে চান, নাগালে নেই। এ ক্রুড্‌ প্রটেস্ট অব এ মাইটি ইয়ং, অ্যানার্কিক···আয়াম নট হিজ এনিমি, এ ফাদার ক্যান্‌ট্‌ বি···দূরে···স্টেশনের বাইরে হঠাৎ কয়েক রাউণ্ড গুলির শব্দ। হাজার হাজার মানুষের চিৎকারহল্লাহুটোপাটি মুহূর্তে শুরু হয়ে গেল। বুকের ভিতর আরও একটা ধাক্কা সামলাতে চোখ বুজে নড়বড়ে নোংরা কাঠের বেঞ্চিটায় টলে পড়লেন অধ্যাপক। অবশেষে গুলিবিদ্ধ হয়ে মরল কেউ। অসহায় নিরীহ কোন মানুষ। ওআন মোর ডেথ্‌ অ্যাণ্ড এ ডেথ্‌ উইদাউট প্রটেস্ট। দি প্রটেস্ট দে ওঅন্ট মি টু রেইজ··· নিষ্পলক তাকিয়ে থাকাও কঠিন। বৃহৎ অজগর রেলগাড়ি থেকে ঝাঁকে-ঝাঁকে বিপন্ন মানুষ এবার বেরিয়ে পড়ছে। বাচ্চা-কোলে-মা, ছেলেমেয়ে সামলাচ্ছে কেউ, ভয়ে কুঁকড়ে মেঝেতে নেমেই লুটিয়ে পড়েছে, থুরথুরে বুড়ি কাঁপতে কাঁপতে মরে যেতেও পারে, গলগল বমি করছে কে, আস্তে আস্তে প্ল্যাটফর্‌মটা ভরে যাচ্ছে—এই নারকীয় হট্টগোল থেকে চোখকানের রেহাই নেই, কিন্তু চোখ বুজলেন অধ্যাপক। বার্ধক্যে কত আর সয়! নোংরা বেঞ্চিটায় লুটিয়ে পড়তে পড়তে বিদঘুটে গা-গুলনো একটা

গন্ধে কিছু একটা উগড়ে উঠতে চাইল ভিতর থেকে। কিন্তু বিধ্বস্ত দেহে তখন বিশ্রামটাই খাঁটি। লুটিয়ে পড়লেন। দেখলেন, বেঞ্চের তলায় একটা ঘেয়ো কুকুর। এই বিপুল প্রলয়কাণ্ডে নির্বিবাদে ঘুমোচ্ছে, ঘুমোতে পারছে, হয়তো কুকুর বলেই।

ঘুমিয়েই পড়েছিলেন হয়তো, অথবা তন্দ্রার মতো। হঠাৎ কতগুলি ভারিবুটের প্রচণ্ড শব্দে হকচকিয়ে উঠে বসলেন অধ্যাপক। চমকে উঠলেন দেখে, আর-পি-এফ-এর সেই জাঁদরেল অফিসার, সি-আর-পি-র বড়োকর্তা, স্টেশনমাস্টার আরও কিছু বাঘা-বাঘা লোক। খোলা রিভলবার তুলে কথা বলছে সবাই—'হিয়ার ইউ আর, ডঃ দাশগুপ্ত...'

বিমূঢ় অধ্যাপক নির্বাক। পাঞ্জাবির কোণে কাচ মুছে নিয়ে শান্তভাবে চশমাটা চোখে তুললেন।

'ট্রেনটা আমরা ছেড়ে দেব। কিন্তু আপনাকে একটু কষ্ট করতে হবে।'

'রিজার্ভড্-বার্থ থার্টি-নাইন থেকে আপনার সব জিনিসপত্তর তুলে এনেছি। নাথিং ইজ লস্ট...'

'আপনি বলেছেন, সে ছোকরাকে আপনি দেখেছেন। আপনার কামরায় ছিল...'

'প্রায় সাড়ে চার শ বদমাশ ছোঁড়াকে স্ক্রিন করেছি। কাল সকালে আপনি আইডেন্টিফাই করবেন। আজ বিশ্রাম করুন...'

'ইউ আর আওয়ার ম্যান। ইউ উড হেল্প্ আস্...'

বিস্মিত হতবাক অধ্যাপক অসহায়ভাবে তাকালেন। কিছু বলতে চেয়ে যেন ভাবতেই পারলেন না, ওই রক্তাক্ত চোখগুলি মানুষের ভাষা বোঝে। পিস্তল-হাতে-মানুষের কোনো ভাষা আছে! তাই অসম্ভব ক্ষিপ্রতায় আর-পি-এফ-এর অফিসার যখন পকেটের দেশলাই জ্বেলে তাঁর পাইপটা ধরিয়ে দিলেন, এবং রাইফেল কাঁধে একজন পুলিশ মাটি থেকে ফোলিও-ব্যাগ আর থিসিসের ফাইলটা হাতে তুলে নিয়ে পিছনে আর্দালির মতো দাঁড়াল এবং দুজন এস-আই ডানে বাঁ-এ প্রহরীর মতো দাঁড়িয়ে এগোবার নির্দেশ দিলেন, হতবিহ্বল অধ্যাপক, যেন গ্রেপ্তার হলেন, নিঃশব্দে অনুসরণ করলেন তাদের। প্ল্যাটফর্ম্ ট্রেনভিড়জনতাকোলাহল সব কিছু ছাড়িয়ে, স্টেশনের দোতলায় সুন্দরভাবে সাজানো ফার্স্ট ক্লাশ ওয়েটিং রুমে পৌঁছে দিয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে ওরা চারজনই যখন পুরো কায়দায় স্যালুট ঠুকল, ঘটনার পর ঘটনায়, ধাক্কায় ধাক্কায়

ক্লান্ত অধ্যাপক ফিরেও তাকালেন না। এই নির্জন আর সুন্দর ঘরটাকে আশ্চর্য এক স্বপ্ন বলে মনে হচ্ছিল তাঁর। আরামকেদারা, সোফাসেট, ফুল-সাইজ -আরশি, ফুলদানিতে সত্যিকারের তাজা রজনীগন্ধা। গান্ধী-জওহরলালজির ফটো ছিল দেয়ালে, 'ভিজিট-ইণ্ডিয়া'র কাশ্মীরের ডাল-লেক, মাদুরাইর মীনাক্ষী মন্দির, দিল্লীর কুতুব, কোথাকার উপজাতি রমণীর লোকনৃত্য। যদিও রাত শেষ হয়ে আসছে। জানালায় ভেন্টিলেটারের কাছে অন্ধকার ফর্সা হয়ে উঠছে। ভোরের কাক ডাকছে কোথায়। ক্লান্ত অধ্যাপক বাথরুমের দিকে এগোলেন। বাথরুম! বন্ধ দরজার হাতলে হাত রাখতেই সারাশরীরে থর্‌থর্ করে কেঁপে উঠলেন আবার। এবং যেন মুহূর্তে চারদিকের সব দেয়াল সংকুচিত হতে হতে একেবারে তার গা ছুঁয়ে জেলখানার সেল হয়ে উঠল। কাঁপতে কাঁপতে একটা ইজিচেয়ারে ঢলে পড়লেন। এই ভয়ঙ্কর স্তব্ধতা এবার তার শত্রু। সামনেই নগ্নবক্ষ গান্ধীজির সহাস্য ছবি। বুকের পাশে আশ্বাসের বরাভয়। যেন অজান্তেই হাতটা বুকে উঠে আসে। বুক হাতড়ান। আঁৎকে উঠলেন। নিজের দৃষ্টিকে অবিশ্বাস করার মতো শক্তি তাঁর নেই। যেন আচ্ছন্নতার একটা ঘোর জড়িয়ে আছে মাথায়। চোখের ডগায় লেপটে থাকা সেই মুখ। দৃষ্টিভ্রম নয়, ভ্রান্তি নয়, যেন স্পষ্ট দেখছেন, মেঝেতে লম্বা দীর্ঘ ছায়া ফেলে সেই যুবক দরজায় স্থির দাঁড়িয়ে আছে। চোখের সেই ভীষণ দৃষ্টি।

'তুমি!' অধ্যাপক উঠলেন। গুটি গুটি এগিয়ে গিয়ে ফাইল আর থিসিস আঁকড়ে ধরলেন। যাকে তাঁর শনাক্ত করার কথা ছিল এই ভোরেই এবং যা তিনি কখনই পারতেন না হয়তো, সেই যুবক সোজাসুজি চোখ রেখে এখন তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। খট্‌-খট্ শব্দ তুলে পিস্তলের গুলি খুলে আবার একটি একটি করে ভরতে ভরতে সেই শব্দহীন যুবক এগিয়ে আসছে।

'তোমার নাম দীপায়ন, দীপু, আমি জানি···দীপু···' বড়ো গোলটেবিল, যার উপরে ফুলদানিতে তাজা রজনীগন্ধা, তার একদিকে অধ্যাপক, অন্যপ্রান্তে সেই যুবক—যেন কী এক দুর্লঙ্ঘ্য টানে আটকে গেছেন, যেন ঘুরতেই হবে, ঘুরে যেতেই হবে, যতক্ষণ এই যুবক চায়। কিন্তু আস্তে আস্তে যেন অবধারিত হয়ে উঠছে পিস্তলটা, আর ভয় করছে না। এক্ষুনি গর্জে উঠলে নিশ্চিত মৃত্যু। এবং যেহেতু মুক্তি নেই, সব কিছু মেনে নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন অধ্যাপক। থমকে দাঁড়ালেন। এক-পা দু-পা করে পিছুতে শুরু করলেন। তিনি জানেন, এক্ষুনি

অথবা যে-কোনো মুহূর্তে যুবকটি তার কাজ শেষ করে নিতে পারে। হঠাৎ, পিঠটা গিয়ে প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো দরজার কোণে। ব্যথাযন্ত্রণার কোনো অনুভূতি নয়, একটা মরিয়া চেষ্টা। ছিটকে লাফ দিলেন বাইরে। ছুটতে শুরু করলেন। বাঁ-হাতের বগলে থিসিসের ফাইলটা ছিঁড়ে গেল, শুধু কাগজগুলি কোনমতে চেপে, ডানহাতে শক্ত কব্জিতে আঁকড়ে ধরেছেন ব্যাগ। ব্যাগটা পড়ে গেল। পিছনে তাকাবার সাহস নেই। বিস্তীর্ণ বারান্দায় রেলের যে কুলিরা তখনও ঘুমোচ্ছিল, একে একে তাদের অনেককেই মাড়িয়ে ডিঙিয়ে ছুটতে ছুটতে ডানদিকের সিঁড়িতে গড়িয়ে নামতে লাগলেন। ভোরবেলার শান্ত নির্জন প্ল্যাটফর্ম্। এখন বিশ্বাসই করা যায় না আর, কাল রাতে রীতিমতো ঝড় বয়ে গেছে এখানে, এবং আজ এখন যার হাজতবাসের কথা, বোধ হয়, চাঁদ-সদাগরের লোহার দুর্গে ফুটোটাই সত্যি, সেই যুবক···একবার মাত্র পিছনের দিকে তাকালেন অধ্যাপক, প্যান্টের পকেটে দু-হাত রেখে অত্যন্ত শান্তভাবে এগিয়ে আসছে। যেন 'কোথায় পালাবে?' ভঙ্গিতে উপেক্ষা। অধ্যাপক ছুটতে লাগলেন। উত্তেজনাহীন যুবকের মন্থর হাঁটার সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন বৃদ্ধের দৌড়। প্ল্যাটফরম্ পেরিয়ে রেলের ইয়ার্ড, অসংখ্য লাইন, স্লেটের উপর নিরক্ষর শিশুর আঁকিবুকির মতো লাইনের পর লাইন, যেন দুর্লঙ্ঘ্য নিয়তির মতো টানছে। ঝাঁপিয়ে পড়লেন অধ্যাপক, গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে থাকা মালগাড়ি, মস্ত ডিজেল ইঞ্জিনের গর্জন, পায়ের তলায় কাঠের পাটাতন, পাথরের কুচি, পায়ে পায়ে হোঁচট, অনিদ্রার ক্লান্তি, আর ঘুম। তবু জীবনের টানে, বাঁচার তাগিদে ছুট, ছুটতেই হয়, হাঁপ ধরে দাঁড়াবার সুযোগ নেই, আর ধরে রাখা যাচ্ছে না বগলের কাগজগুলি, সুতো ছিঁড়ে গড়িয়ে পড়ছে, ভারতের কৃষি-অর্থনীতির উপর জ্ঞানগর্ভ গবেষণা, অনেক নিষ্ঠা অনেক সাধনার সম্পদ, যা হয়তো দরিদ্র ভারতবর্ষের চেহারাই বদলে দিতে পারত, একটি একটি করে টাইপ-করা-সাদা-কাগজ খসে-খসে পড়ে ভোরের বাতাসে উড়তে লাগল এবং ছাইগাদায় কয়লা-কুড়োনি ন্যাংটো শিশুরা হঠাৎ কাগজ-কুড়োনি হয়ে ছুটে এসে হুমড়ি খেয়ে তাড়া করল। পিছনের সেই শব্দহীন যুবক আর অসংখ্য শিশুর কলরবের মধ্যে অসহায়ভাবে যেন কাকে খুঁজলেন অধ্যাপক। কোনো মুখ! দীর্ঘ ত্রিশ বছরে হাজার যৌবনের মধ্যবর্তী পথ দিয়ে কনভোকেশানের আনুষ্ঠানিক প্যারেডের মতো অনেক পথ পেরিয়ে এখন যেন অন্য কোনো উপায় নেই বলেই ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুট। চারদিক

থেকে রেল-ইয়ার্ডের কুলি-পয়েন্ট্‌স্‌ম্যান আরও সব মানুষের চিৎকার। কোনদিকে তাকাবার অবসর নেই, ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে একেবারে শেষ প্রান্তে, যেখানে ইয়ার্ড ফুরিয়ে গিয়ে সোজা সমান্তরাল রেখায় দু-জোড়া রেললাইন কোথায় সুদূরে অচেনা ভারতবর্ষে গিয়ে মিশেছে, যেন অনিশ্চিত ভবিষ্যতের মতোই রেললাইনের সরলরেখায় ছুটে আর লাভ নেই মনে করে, উঁচু থেকে বাঁ-পাশের খাদে, ঝোপজঙ্গল বনবাদাড়ের ভিতর দিয়ে, দু-হাত দু-দিকে ছড়িয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে, যেন বেহুঁস হয়ে গড়িয়ে নামতে লাগলেন। ইঁটের টুকরো, পাথরের কুচি, ভাঙা কাচ আর বুনো জঙ্গলের কাঁটায় কাঁটায় পায়জামা ছিঁড়ে কুচিকুচি, পায়ে হাঁটুতে রক্ত, মুখে রক্ত আর গ্যাঁজলা, যখন মৃতপ্রায়, যখন গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হওয়া বরং ভালো ছিল বলে ভ্রম, ঠিক তখনই সমতলে জলকাদায় ধানের ক্ষেতে মুখ থুবড়ে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন। কৃষি-অর্থনীতির থিসিসের সেই মূল্যবান পরিশিষ্ট অংশটা, যেটুকু তখনও বগলে ছিল, ধানের ক্ষেতের কাদায় পড়ল, হাতের চাপে গেঁথে গেল। প্রান্তর প্রান্তর জুড়ে সবুজ কচি ধানের ডগায় ভোরের বাতাস আর মাথার উপরে শূন্যতা জুড়ে বিশাল আকাশ। কাদামাটির পচা-গন্ধ, সারা মুখে পিল্‌পিল্‌ করে ধানগাছের কচি সবুজ। হাতঘড়ি সমেত দুহাতের কনুই অব্দি ডুবে গেছে মাটিতে। যেন কুমিরের দাঁতে আঁকড়ে ধরেছে মাটি। আর কোন উপায় নেই। এবার মৃত্যু—ধুঁকতে ধুঁকতে রুদ্ধশ্বাসে প্রতীক্ষা শুধু, এবার পিস্তলটা গর্জে উঠলেই মরতে হবে। বুকে ধড়ফড়্‌ বাড়ছে, নিশ্বাসে কষ্ট, চোখ ঘোলাটে হয়ে আসছে…ঢলে পড়ছেন, আস্তে আস্তে শিথিল শরীরটা নেতিয়ে পড়ছে কাদায়, কাদামাটিতে মাখামাখি…এবং ঠিক তখনই কারা যেন ছুটে এলো, জড়াজড়ি করে ধরে তুলল। ঠিক শেষমুহূর্তে ঝাপসা চোখে দেখে নিতে চাইলেন অধ্যাপক…এই ভোরবেলায় মাঠের কাজে এসেছিল যারা, নেংটি-পরা রোগা রোগা কালো-মানুষগুলি ধরাধরি করে তাঁকে কাঁধে তুলে নিয়ে আল ধরে ধরে এঁকেবেঁকে আরও গভীর গভীর মাঠের দিকে চলল—এবং নিজের শবযাত্রায় শুয়ে যেন স্পষ্ট অনুভব করলেন, আততায়ী যুবক ফিরে যাচ্ছে নিঃশব্দে, যেন তার প্রয়োজন ফুরিয়েছে।

আবার দেয়ালে-টাঙানো গান্ধীজি। বুকে বরাভয় তুলে আততায়ীকেই সহাস্যে কিছু বলতে চাইছেন। থাবলা দিয়ে নিজের বুক চেপে ধরলেন অধ্যাপক। দুঃস্বপ্নের ক্লান্তিতে তিনি তখনও ঘামছেন। বুক কাঁপছে। তাঁকে

ঘিরে তখন অনেক মানুষ। পরিচিত মুখগুলি। যেন তিনি নিজেই এক নিকৃষ্ট অপরাধী, ইন্‌টারোগেশান চেম্বারে লাইট-ট্রিট্‌মেণ্ট আর জেরা চলবে তাঁকে ঘিরে। একরাশ বিরক্তিতে ঝাপসা-চোখে তাকালেন চারদিকে। সেই ফার্স্ট-ক্লাশ ওয়েটিংরুম। শকুনের মতো হিংস্র পিস্তল-হাতে মানুষগুলির মধ্যে… একেবারে মুখোমুখি, সামনের সোফায়…ভালো করে লক্ষ করলেন, ভুল নয়, দীপু…সত্যি দীপু…আর-পি-এফ-এর অফিসার আর সি-আর-পির বড়োকর্তার ঠিক মাঝখানে। ওর শাণিত তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি তাঁকে বিঁধছে। অধ্যাপক বিস্মিত হলেন না। চোখ বুজে গা এলিয়ে দিলেন। যেন যে-কোনো কিছুই ঘটে যেতে পারে এখন, কিছুই অসম্ভব নয়।

'ডু ইউ রিকগ্‌নাইজ হিম্, স্যর!'

অধ্যাপক সাড়া দিলেন না। বাঁ-হাতের অসহ্য যন্ত্রণাটা উঠে এসে সমস্ত বুককে কুঁচকে দিচ্ছে।

'হি ক্লেম্‌স্‌ ইউ টু বি হিজ্‌ ফাদার…'

যন্ত্রণা তীব্র হয়ে উঠছে। দি বয়, আই এনকাউণ্টারড লাস্ট নাইট হ্যাড্‌ এ ডিফারেণ্ট ফেস্‌… বলতে চাইলেন। পারলেন না। ঠোঁট কাঁপল শুধু। জল! তেষ্টা! শেষ-তৃষ্ণার জল, সন্তানের হাতে…

'হি ওয়াজ ক্যারিং আন্‌লাইসেন্‌স্‌ড্‌ রিভলবার অ্যাণ্ড সাম্…'

কম্পিত হাতদুটি বাড়িয়ে অধ্যাপক অসহায়ভাবে কিছু যেন ধরতে চাইলেন। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। কাঁপতে কাঁপতে হঠাৎ, একেবারে অতর্কিতে লুটিয়ে পড়লেন। ছুটে এলো মানুষগুলি। চারদিকে তখন অসংখ্য পিস্তল। কেউ দয়া করল না। হাত-পা-ছুঁড়ে দাপাতে দাপাতে অধ্যাপক, একবার, শুধু একবার চোখে চোখ রেখে তাকাতে চাইলেন। সন্তানের মুখ। গত ত্রিশ বছরে নিজের সুস্থতা দিয়ে যে সন্তানকে তিনি সুস্থ রাখতে পারেননি।

যখন অন্ধকার

জয়চণ্ডীতলার ধারে বুড়ো-অশ্বত্থতলার চত্বরে খলখল খলখল করে ঝলকে উঠল অমন ঘুটঘুটে অন্ধকার। তখনও সূর্য্য ডুবল না ভালো করে, গেরস্তদের ঘরে শাঁখ বাজল না, তুলসীতলায় পিদিম জ্বলল না, হাটের দোকানগুলিতে ধুনো পড়ল না, বুড়ো সাধু ঘোষের দোকানের দাওয়ায় তাসের আড্ডা বসল না, রাসমন্দিরের নাটমণ্ডপে কেত্তনের আসর জমেনি তখনও, এমন কি, ছ-টার রেলগাড়িও ইস্টিশান ছেড়ে যায় নি, সাইকেলের মিছিল করে সারি সারি রোজকার আপিস-ফেরতা বাবুরা হাটে এসে পৌঁছয় নি, শুধু ইস্কুলের ছেলেছোকরারা মাঠ থেকে ফুটবল খেলে ঘরে ফেরার পথে অমাবস্যের সাঁঝে অমন চাঁদনী-রাতের ঝিলিক দেখে হুল্লোড় করে উঠল, ম্যাচের শীল্ড জিতে এলে যেমন হুররে করে। আনন্দে মাতোয়ারা পায়ে-খেলার বলটাকে হাতে-হাতে লোফালুফি করে কোমর দুলিয়ে নাচল সবাই, যেমন ভাসানের মিছিলে তাসা আর ঢাকের বাজনায় নাচে। যেন অন্ধকারকে জয় করেছে ওরা। দাসপাড়ায় বড়োপুকুরের ধারে ঝাঁকড়া-মাথা তেঁতুলতলায় শাঁকচুন্নি, ভূতপেত্নির ভয় রইল না আর, শেষ ট্রেনে কলেজ থেকে অথবা সিনেমা দেখে বাড়ি ফিরতে রাত একটায় আর খানাখন্দে মুখ থুবড়ে পড়তে হবে না কাউকে, শিবু পালের অমন জোয়ানমরদ সেজোছেলেটার মতো আর সাপের ছোবলে মরতে হবে না উনিশ বছর বয়সে। বরং অনেক ঘটা করে সামনের বছর সরস্বতী পুজো করা যাবে গাঙপুরের মাঠের ধারে, লেবেল-ক্রসিং-এর পাশে। কলকাতা থেকে ইলেক-ট্রিকের মিস্তিরি আসবে। কতো আলোর খেলা, প্রতিমার পিছনে রঙীন চক্করবক্কর। ব্যাটারির জোলো মাইক নয়, ইলেকট্রিকের মাইক।

দেখতে দেখতে ভিড় বাড়ল। কারও বাড়িতে আগুন-লাগার ভিড় নয়, কারও ঘরে মড়াকান্নার হুল্লোড় শুনেও বেরিয়ে আসেনি কেউ, নেহাতই নানান কাজের তাড়ায় যারা হাটে এসেছিল সওদাপত্তর করতে, ডাক্তারবাবুর

কাছে ওষুধ নিতে, মনা-ছুতোরের কাছে লাঙ্গলের ঈশ জুড়তে, বিশুর দোকানে কাটারিকোদাল শানাতে, ঘরে-ফেরার পথে তারাই থমকে দাঁড়াল। ছ-টার ট্রেন চলে যাবার পর কলকাতা-ফেরতা ডেলিপ্যাসেঞ্জার বাবুরা সাইকেল থেকে নেমে দুলে বাগদী বাউড়ি সাঁওতালদের শামিল হলো। কিন্তু অবাক-বিস্ময়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল না কেউ, এমনকি, চাষাভুষারাও না। অবিশ্যি বিজলি-বাতি তারা দেখেছে অনেকদিন। আগের সেই পুরনো রেলগাড়িগুলো পোয়াতী চন্দ্রবোড়ার মতো ধোঁয়ার টেঁকুর তুলে ঢুকঢুক করে গাঁ-এর পাশ দিয়ে যেত, তার বদলে যেদিন ইলেকট্রিকের রেলগাড়ি হু-হু করে ছুটতে শুরু করল, সেদিন থেকেই তো ইস্টিশানের ঘরে, প্লাটফর্মে বিজলিবাতি জ্বলতে শুরু করেছে। তারপর যেদিন পুবদিকে লক্ষ্মীপুরের মাঠে আউশআমন ক্ষেতের উপর হে-ই উঁচু উঁচু চাঁদিরুপোর মতো সব লোহার মিনার বসতে লাগল, তলায় লালটিনের উপর মাথার-খুলি আর আড়াআড়ি মানুষের-হাড আঁকা, আকাশে মেঘ ছুঁয়ে টানা-সুতোর মতো ঝলমলানো তামার তার, লক্ষ্মীপুর, হেতমগড়, পালুনীর মাঠ ছাড়িয়ে ক্রোশ ক্রোশ দূরে সূয্যিঠাকুরের দেশ কোত্থেকে যে চলে পড়েছে তারগুলি কেউ জানে না, সেদিন সত্যি অবাক হয়ে দেখেছে সাত গাঁয়ের মানুষ, বাবুরা বলেছে,—আলো আসবে, আলো…অমাবস্যের আঁধার রাতে চাঁদের আলোয় ভেসে যাবে গোটা গ্রাম।

ডেলিপ্যাসেঞ্জার বাবুরা সাইকেল থেকে নেমে ভিড় জমিয়েছে ওদিকটায়। অঞ্চল-প্রধান শিবনাথ বাঁড়ুজ্যে সবাইকে শুনিয়ে বুক ঠুকে বলছিলেন—গ্রামে এই বিজলি আনার জন্য তিন-চার বছর ধরে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে কী হন্যে হয়েই না এতদিন ঘুরেছেন তিনি।

আরেক কোণে নিজের মতো লোকজনদের জড়ো করে গ্রামের বি-এ পাশ জগবন্ধু নাগ চোখের জলে বুক ভাসিয়ে শোনাচ্ছিলেন—গাঁ-এর পোস্টাপিস, মাতৃসদন, ইস্কুল আর পল্লীকল্যাণ সমিতির জন্যে তিনি সারা জীবন ধরে কী না করেছেন। প্রাণপাত করেছেন। এই বিজলিবাতির জন্যেও কী কম লেখালেখি করেছেন উপরে। কোন এক মন্ত্রীর ভাগ্নের সঙ্গে চেনা ছিল, শেষে তাকে ধরে…আর 'কনা নেমকহারাম গাঁ-এর মানুষগুলি আজ শুনতেই চায় না তাঁর কথা…

সমবয়সী বন্ধুদের সঙ্গে মাধব ঘোষও এসে সেখানে পৌঁছোলেন। ত্রিশ-

বত্রিশ বয়স, কোন একটা ব্যাঙ্কে কাজ করেন। গোটাছপুর আপিশ করে বিকেলে কলকাতার রাস্তায় মিছিল, সন্ধ্যায় দেড় ঘন্টার রেল চেপে, এখন স্টেশন থেকে এতদূর সাইকেল চালিয়ে ক্লান্ত। হঠাৎ বাঁ পা-টা প্যাডেলে চাপিয়ে ডান পা-টা চলতি সাইকেলে তুলতে তুলতেই চেঁচিয়ে বললেন—'ধ্যাঃ শালা, আলো এলো তো এখন ফ্যাঁচফ্যাঁচ কান্নাকাটি আর কেলোর কিত্তি শোনো। চ চ, হয়েছে। যত্তোসব...'

হায়ার সেকেণ্ডারি ইশ্‌কুলের ক্লাস টেনের ফার্স্ট'বয় সুধন্য বসাকের ছোটছেলে ভোম্বলটা ফিজিক্স-এর 'লাইট' পরিচ্ছেদ থেকে মুখস্থ শোনাচ্ছিল কয়েকজনকে। ইস্টিশানে আলো আসার আগে যদিও সে জীবনে কখনও ইলেকট্রিকের আলো দেখেনি, কিন্তু বই-এর পাতা তার অনেক আগে থেকেই কণ্ঠস্থ। গত বছর বার্ষিক পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল। হঠাৎ ছেলেটির সঙ্গে তর্ক বেধে গেল গোপাল আদকের। গোপাল আদক বয়স্ক লোক, বিষয়ী মানুষ। জীবনে অনেক ঘাটে ঘুরে, অনেক জল খেয়ে বছর তিনেক স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডে চাকরি জুটিয়েছে। হোক আর্দালি পিওন, তবু, বই-এর কিছু কিছু কথা সত্যি হলেও, এ-লাইনে চাকরি করে বলে তার কথাটাও সবাইকে একটু-আধটু মানতে হবে বৈকি।

নানাধরনের মানুষের ছোটখাটো জটলা, টুকিটাকি কথাবার্তা, হল্লা-চিৎকারের মধ্যে ছোট নাতনীর কাঁধে হাত রেখে পথ খুঁজে খুঁজে এগোচ্ছিল রতন বাউড়ি। রোগা হাড়-গিলগিলে মেয়েটার এক হাতে দাতব্য চিকিৎসালয়ের লাল অষুধের শিশি, আরেক হাতে গেরস্থের ঘর থেকে চেয়ে-আনা দুটো বেগুন, গলায়-দড়ি-বাঁধা তেলের শিশি, পয়সা দশেকের সরষের তেল। বয়সকালে খুনে-দস্যি ছিল রতন বাউড়ি। সেই আকালের বছর, যেবারে যুদ্ধের বোমা পড়ল কলকাতা শহরে, বাবুরা সব গাঁ-এ আসতে লাগল ভয়ে, আর গাঁ-এর মানুষগুলি ঘটিবাটি ভিটেমাটি জমিজমা বেচে, পেটের জ্বালায় দেশ-গাঁ ছেড়ে ছুটতে লাগল শহরে লঙরখানায়, সে বছর এই মানুষটাই নাকি রাঙাছপুরে নটবর পালের রাক্ষুসে বাপ সীতানাথ পালকে খুন করেছিল বড়োপুকুরের পাড়ে। লোকটা বন্দুক হাতে নিয়ে ধানের বস্তা তুলছিল গরুর গাড়িতে। দশ বছরের কয়েদ হয়েছিল বাউড়ির। হাজত থেকে ফিরে কী যে হলো, সেই তাগদ আর নেই, লোকটা বুড়ো হয়ে গেল। পিঁচিটিকিচ্ছের চোখদুটো একেবারে অকেজোই হয়ে গেছে বোধ

হয়। হাসপাতালে এসেছিল বুড়ো রতন বাউড়ি, ডাক্তারবাবুর কাছে অষুধ নিতে।

'কী গ খুড়ো, দেখছ নি কী কইরেচে বাবুরা, দেখলে চোখে ধাধা লাইগবে গ, ধাধা...' দুলেবাউড়ি ছোকরাবুড়োরা ছিল একদিকে। একজন গলা বাড়িয়ে চেঁচিয়ে উঠল—'দেইখবে কী গ, তুমি তো শালা অন্ধা...'

'অ—' বুড়ো রতন বাউড়ি মাথা তুলে চোখ পিটপিট করে। চারদিকেই অন্ধকার। কাঁপা গলায় বলল—'অনেক মানষে কতা বইলচে শুনি, কী হয়েচে। বলি, হলটা কী ?'

'আলো গ, আলো, কেমন বিজলিবাতি এইনেচেন বাবুরা, জয়চণ্ডীতলায় মায়ের থানে জ্বইলতে নাগচে, বাবুদের ঘরে ঘরে পুন্যিমের আলো গ খুড়ো, তুমি তো দেখতে পাও না...একেবারে নগর বাইনে দেচে...'

'অ, দেখি না বটে, ভগমান আমার আঁধার দেচেন...'কফের টানে কাঁপতে কাঁপতে একটু স্বর চড়িয়েই বলল রতন বাউড়ি—'বাবুদের ঘরে আলো জ্বইলবে ত তুদের কী র‍্যা বাউড়ির ব্যাটা, তুদের ঘরে আঁধার, তুরাও অন্ধা...'

অসাবধানে কেমন খোঁচা লাগল পাঁজরায়। লোকগুলি এ ওর দিকে তাকায়। লাফিয়ে উঠল তামলিপাড়ার নিতাই—'হুঁ, হুঁ, লাখ কতার এক কতা বইলেচ গ বাউড়ি। সত্যি তো, ওই যে কতায় বলে না, অযোধ্যায় রাম রাজা হবে ত খুশিতে খলবল কইরচে বনের হরিণী। হরিণ বইলল—কি লো, অমন খুশিতে নাচন লাইগচে কেনে তুর। রামই রাজা হোক কি ভরতই হোক, বনে মেগয়ায় আইসবেন তো তুকে রামও মাইরবেন, ভরতও মাইরবেন।'

'হুঁ, হক কতা বইলেচ তুমরা...' পকেট থেকে বিড়ির কৌটো বের করল বাসেদ আলি। জনে জনে বিলোল—'আমাদের তো সেই লণ্ঠনই জ্বালতে হবে গ, সেই নটবর পালের দুকান থেকে কিরসিন কিনতে হবে। শালা হারামি, দু-কুড়ি পয়সা গুইনে লেবে তবু এক বোতল তেল দিবেনি গ। অ বাউড়ি উ বাঞ্চোতের বাপটার ধড় লাইমেছেল ত উ শালার পেটটা ফাঁসাতি পারে না কেউ।'

একরাশ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ঘাড় নাড়ল কিংবদন্তির নায়ক রতন বাউড়ি। জোয়ানবয়সে একটা কাজ করে গোটা জীবনটাই দেউলে হয়ে গেছে। জেলে হাড়ভাঙ্গা খাটুনিতে শরীরগতর গেল, বুড়ো বয়সে চোখ গেল,

ভিটেমাটি গেল। এখন ভিপ্ মেপে দিন কাটে, কিন্তু কী আর হলো? সীতেনাথ পালের ধড় নামল তো নটবর পালের ধড় গজাল। রাবণের জাত পালায়া। বলল—'অ, আমি বুড়ো-অন্ধা, জোয়ানমরদ বয়স তুদের, তুদের সাহস নাই?'

নটবর পালের গর্দান নেবার সাহস। শুধু বুড়োরা নয়, তাগড়াই জোয়ান দুলেবাগদীবাউড়ি ছোকরাগুলিও চোখে চোখে তাকাল। কেমন একটা খিঁচুনি ধরল পাঁজরার ভিতরটায়। ঘরে-ফেরার কথা ভাবছে সবাই। অমাবস্যের আঁধার ডিঙিয়ে ঘরে ফিরতে হবে—রেলের লেবেলক্রশিং পেরিয়ে মোহনতলার আল ধরে, অথবা ঝোপজঙ্গলবনবাদাড়ের মাঝখান দিয়ে বিশেলাক্ষী মায়ের থান পেরিয়ে, হালদারদের সোনাপুকুরের ধারে ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের পাশ ঘেঁষে সবই তো আঁধার। সবাই কেমন একটু মুখ ভার করে নড়েচড়ে উঠল। শুধু রতন বাউড়ির ছোট নাতনী, আট-ন বছরের মেয়েটা হাঁ করে তাকিয়ে ছিল উপরের দিকে। বাতাসের মাতন লেগেছে অশথ গাছটায়। পাতাগুলির শব্দ হচ্ছে, বাতাসে কাঁপছে, ও পাশের বিজলি-আলোয় ঝলমল ঝলমল করছে। যেন বায়োস্কোপের ছবি।

তারপর যখন রাত বাড়ে, জয়চণ্ডীতলার ভিড়ের মানুষগুলি একে একে ঘরের দিকে পা বাড়ায়। ভাতের থালা সাজিয়ে বসে বসে ঝিমুচ্ছে বৌ-ঝিরা, কতক্ষণ আর বাইরে থাকা যায়! একে একে মানুষগুলি চলে যাবার পরও, বাজারের দোকানগুলির ঝাঁপ বন্ধ করে ভিতরে আলো জ্বেলে হিসেব পত্তর করছিল যারা, যারা তাসপাশাদাবায় মেতে ছিল, রাত দশটার রেলগাড়ি চলে যাবার পর সবাই গুটি গুটি উঠে গেলে জয়চণ্ডীতলা, বাজার আর গোয়ালাপাড়ার পুরো চৌহদ্দি জুড়ে নিশুতি নামে। হাটের দোচালার তলায় মাছের আঁশটে গন্ধে চারদিকে কুকুরগুলির তারস্বরে দলবদ্ধ চিৎকার বাড়ে। বেশ দু-চার পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে বিকেলের আগে, ঝিঁ-ঝিঁ আর ব্যাঙের ডাকে রাতনিশুতির হাটের স্তব্ধতা আরও থমথম করছে। কখনও কখনও দমকা বাতাসে গাছপালার পাতায় পাতায় ঝিরঝির শব্দ। এই ভয়াবহ ভূতুরে নীরবতায়, প্রায় মধ্যরাতে নটবর পালের আড়তে বন্ধ-ঝাঁপের ফাঁকেফোকরে ভিতরের আলোগুলি অন্ধকারে বিড়ালের চোখের মতো জ্বলছিল তখনও। সেই আটটায় কেনাবেচা বন্ধ হয়েছে, হিসেব বুঝে নিয়ে কর্মচারীদের বিদেয় দেবার পর এতরাত পর্যন্ত ভিতরে বসে বসে কী সব করছে মানুষটা! জয়চণ্ডীতলায় সোরগোল শুনেছে, বাজারের দোকানগুলিতে

বিজলিবাতির ঝিলিক দেখেছে, লোকের মুখে আলোর গল্প শুনেছে, কিন্তু গদি ছেড়ে ওঠার সময় হয়নি। লোক পাঠিয়ে খবর দিয়েছে বাড়িতে— ফিরতে রাত হবে।

তারপর ঝক্করঝক্কর বেশ কতগুলি মালগাড়ি চলে যাবার পর রাতদুপুরে কলকাতা থেকে যখন শেষ রেলগাড়িটাও চলে গেল, গোটা গাঁ-এ কেউ যখন রাত জেগে বসে নেই, নিশ্চিন্ত হয়ে আড়তে লণ্ঠন নিভিয়ে মা লক্ষ্মী, মা কালী, মা চণ্ডী, মা বিশালাক্ষী, বাবা তারকেশ্বর, সিদ্ধিদাতা গণেশকে প্রণাম করে, হাঁটু ভেঙ্গে চোখ বুজে কান মলে ধ্যান শেষ করে পিছনের দরজায় পাঁচ পাঁচটা তালা এঁটে, কাগজ পুড়িয়ে আড়তের দরজায় আরতির পর শ্রীশ্রীগুরুর নাম স্মরণ করে বেরিয়ে এলেন বাইরে। হাঁটু পর্যন্ত ধুতি, গায়ে ফতুয়া, একহাতে একটা থলি, অন্যহাতে ছাতা। মেদ আর ভুঁড়ির ভারে বিশাল শরীরটা চলতেই চায় না, থপথপ করে পা ফেলতে শব্দ হয়। খুব সন্তর্পণে জয়চণ্ডীতলার চত্বরে এসে চারপাশের ফাঁকা জায়গাটায় একা স্থির হয়ে দাঁড়ালেন, এদিক ওদিক তাকিয়ে লক্ষ করলেন—কেউ নেই। অশত্থের ছায়ার পাশে নিজেরই বিশাল ছায়া। মন্দিরের বন্ধ-দরজায় চোখ পড়ল, কিন্তু মাকে প্রণাম করতে ভুলে গেলেন। সর্বাঙ্গ জ্বলছে আগুনে। সোজাসুজি তাকালেন, ভালো করে চাইতে পারলেন না, ঝাঁ ঝাঁ করে মাথা ঘুরে গেল। এত তেজ! শক্ত, মোটা, উঁচু শালকাঠের ডগায় বিজলির ডুম। তাকাতেই আলোর চারদিকে রামধনু দেখলেন, হরেক রঙ। শত্তুর, শত্তুর, শত্তুর! মধ্যরাতে একটা ফাঁকা জায়গায় একজন একা-মানুষ—দুটো কুকুর ছুটে এসেছিল, নটবর পাল ছাতার বাঁট উঁচিয়ে তেড়ে গেলেন, তাড়া খেয়ে কিছুদূর গিয়েই মুখোমুখি ওরা থমকে দাঁড়িয়ে রাতকাঁপানো ঘেউ ঘেউ শুরু করে দিলো। ওদের হল্লায় চারদিকের অদৃশ্য জগৎ থেকে আরও অসংখ্য কুকুর সজাগ হয়ে উঠছে, গোটা গাঁ-এ দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে……নটবর ভয় পেলেন। নিশুতি রাতে কুকুরের ডাকে গেরস্তরা জেগে উঠবে এবং জেগে উঠলেই চারদিকে মানুষ, মানুষকেই এখন সবচেয়ে ভয়। পালাতে চাইলেন। একটা বড়োসড়ো ঝোড়োবাতাসের ঝাপটা এসে উথালপাথাল করে তুলল অশ্বত্থের ডালপালা। মাথার উপর টাক ছুঁয়ে লম্বা-ডানার কালো ছায়ায় পাকসাট দিয়ে উড়ে গেল কয়েকটা বাদুড়। ঝড়ের ঝাপটায় কাঁপছে বিজলির ডুম, দুলছে এদিক ওদিক। অশ্বত্থগাছের ঝাঁকড়া মাথার ছায়া তোলপাড় করে দোল খাচ্ছে জলমাটির

কাদায়। দশমুণ্ডওলা রাবণের মাথা ক্রোধে ফুঁসছে যেন। আছড়ে মরছে ঘুঁটে-শুকনোর দেয়ালে, শরৎ ঘোষের খড়ের পালুই-এ, জয়চণ্ডী-মার নাট মণ্ডপে, বিশু দেওয়ানের খড়ের ছাউনিতে। উথালপাথাল সন্নেসির মাগুন। থরথর থরথর কাঁপতে কাঁপতে নটবর পালাতে চাইলেন, ছুটতে গিয়ে হোঁচট খেলেন। সত্তর বছরের বুড়ো হাড়পাঁজরে ধকল সইতে গিয়ে ঘোলাটে দেখলেন চারদিক। ধাঁধা! চোখ দগ্ধে দেয় আলোর তেজ! হুমড়ি খেয়ে, জলে কাদায় পিছলে পড়ে ছুটতে ছুটতে নিজেরই বিশাল রাক্ষুসে ছায়া দেখে চমকে উঠলেন, নিজেরই পায়ের শব্দে বুকটা ধড়াস করে ওঠে। বিজলি আলোর বাহার ছাড়িয়ে অন্ধকারের আশ্রয়ে এসে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আঁধারই ভালো। নিজের ছায়া পড়ে না।

যার বাড়িতে চল্লিশ পঞ্চাশটা পাতা পড়ে একবেলায়, বসতবাড়ি সদরঘর আড়তখামারদোকান নিয়ে রাতের বেলা ষাটটা লণ্ঠন জ্বলে, বিরাট একান্নবর্তী যৌথ পরিবারের দেড়শ একর ধানিজমি, খামারে ত্রিশচল্লিশটা গাইবলদবাছুর, নিজেরই হাললাঙলের বাঁধা-কিষেন, পাশাপাশি তিনটে গ্রামে তিনটে ধানকল-হাসকিন মেশিন, তিনটে আড়ত, সারের এজেন্সি চারটে মনোহারী আর মুদির দোকান, কোল্ডস্টোরেজে দেড়শ' কুইন্টাল আলু ফেলে রেখে কার্তিকমাসে যে নতুন আলু ভোল দেয়, দশ হাজার টাকা পাটে লোকসান দিয়ে ধানের দরে চল্লিশ হাজার টাকা তুলে নেবার মুরদ যার, সেই নটবর পাল আজ নিজেরই গাঁ-এ অমাবস্যার নিশুতি রাতে চোরের মতো ঝোপঝাড়ে বনেবাদাড়ে লুকিয়ে লুকিয়ে হাঁপাতে হাঁপাতে শেয়ালকাঁটায় বেংচিকাঁটায়, শেয়ালকুলে পা কেটে, মুখে গ্যাজলা তুলে অশ্বিনী মুখুজ্জের নতুন বাড়ির দরজায় এসে আছাড় খেয়ে পড়লেন। কুমড়োর ফালির মতো দু-ফাঁক ফতুয়ার তলায় ভুঁড়িটা উঠছে নামছে, বুকে হাঁপর, নাকেমুখে নাভিশ্বাস। দরদর ঘাম ঝরছে কপালে গালে ঘাড়ে গর্দানে বগলে বুকের লোমে। একসার ভিজে যাচ্ছে শরীর। হাত দিয়ে দু-চোখ ঢেকে দুটো মৃদু টোকা দিলেন দরজায়। আটকুড়ে ব্যাটারা সদর দরজার উপর বিজলির ডুম ঝুলিয়ে রেখেছে, রাত চার প্রহর জ্বলবে। সরকারি টাকার শালা বাপ মা নেই। খানকির দল। বর্ষার থকথক ভেজা কাদায় মানুষের ছাপে, গোষ্পদে, গরুর গাড়ির লাইনটানা লিকে চিক্‌চিক করছে আলো। সর্ষে আর পোস্তদানা হারিয়ে খুঁজে পাওয়া যায়। শালাদের আলোতেও সুযির ঝাঁঝ।

দ্বিতীয়বার টোকা দিতেই নটবর শব্দের ধাক্কায় ঘাবড়ে গেলেন। রাতদুপুরে শব্দটা ভীষণ। গেরস্তরা জেগে উঠবে। জেগে উঠলেই এত রাতে তাকে এখানে দেখলে কুকথা কইবে। সব ফাঁস হবে যাবে। কিন্তু নিরাশ হলে চলবে না। দেখা তাকে করতেই হবে। আজই, আজ রাতে। দরজায় মৃদু টোকা, সে সঙ্গে দেয়ালে কান পেতে ফ্যাসফেসে গলায় ডাকলেন — 'মশাই, ও মশাই শুনচেন…'

হঠাৎ ভিতর থেকে ভীতত্রস্ত গলা শোনা গেল— 'কে ?'

'আস্তে, আস্তে গো মশাই, আমি…' চতুর নটবর বুঝলেন, দেশ গাঁ-এ শহরের নতুন মানুষ। এই রাতবিরেতে দরজা-ধাক্কায় ভয় পাবারই কথা। খাটো গলায় অভয় দিলেন এবার—'আমি নটবর পাল…'

স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের স্থানীয় আপিশের বড়োবাবু ভাড়া নিয়েছেন অশ্বিনী মুখুজ্জের নতুন পাকাবাড়। কাঁচা-ঘুম থেকে উঠে-আসা মানুষ, তখনও স্বাভাবিক নন। দরজা খুলেই চমকে উঠলেন—'আপনি! এত রাতে ?'

'আজ্ঞে, পেন্নাম হই…' বিগলিত হাসি নটবরের মুখেচোখে—'এট্টা কতা ছেল গো আপনার সনে, তাই বুড়োহাড়ে রাত করেই আসতি হল। এত তাড়া করি আলোটা দে দিলেন গো আপনারা ?'

'মানে ?'

'হপ্তা দেড়েক আগে শুনলাম, মাস ছয়েক দেরি হবে।'

'সে রকমই কথা ছিল। অর্ডার এলো, কানেক্শান এলো, দিয়ে দিলাম.. '

সুরুৎ করে আলো থেকে অন্ধকারে এসে গা ঢাকলেন নটবর—'এই অমাবস্যের কটা দিন এট্টু বন্ধ রাখতে পারেন না গো বাবু…'

হাই তুলে, পিঠকোমর বাঁকিয়ে হাড়গোড়ে মোচড় দিয়ে শরীরটাকে চাঙা করছিলেন বড়োবাবু, যেন ইলেক্ট্রিকের শকেই চমকে উঠলেন—'কী বলতে চান আপনি! অদ্ভুত রসিকতা তো মশাই, সাতাত্তরটা মিটার বসিয়েছি আপনাদের গাঁ-এ। আরও তেইশটা…'

'বটেই ত, বটেই ত…হবে, আরও হবে, আপনারা হলেন গে নেকাপড়া-জানা নোক, মান্যিজন, হেঁ… হেঁ.. '

ফতুয়ার তলায় ঘর্মাক্ত বুকের লোমে হাত বুলোতে বুলোতে চিঁ চিঁ হাসলেন নটবর। পোয়াতী গাই-এর হাঁচির মতো শব্দটা অদ্ভুত। কোমর

থেকে ধারালো ছুরি টেনে আনার মতোই প্রসারিত হাতের মুঠোটা তুলে ধরলেন বিজলি আলোয়।

বড়োবাবু শিউরে উঠলেন। চকমক করছে চোখজোড়া, চনচন করছে বুকের ভিতরটা। দড়াম করে সজোরে দরজার কপাট দুটো বন্ধ করে, কপাটে পিঠ রেখে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলেন। এবার দুজনই অন্ধকারে।

'কিন্তু আমার চাকরি!'

'চাকরি বাঁচিয়েই তো সব করবেন গো বাবু, আপনারা কি মুখ্যু, বোকা?' শেয়ালের মতো জিবে থুতনি চেটে চেটে বড়োবাবুর হাতদুটো খুঁজে নিলেন নটবর, দু-জোড়া হাতের মাঝখানে উষ্ণ উত্তাপ। জিবে নোনতা স্বাদ। খুব চাপা গলায়, প্রায় শোনা-যায়-না এমনি কণ্ঠস্বরে, যেন অন্ধকারের উদ্দেশ্যেই বলে চললেন নটবর—'মাত্তর পাঁচদিন কি সাতদিন গো বাবু। আমার কাজ হাসিল হোক, আরও খুশি করে দেবো। আপনাদের খপরের-কাগজ বলেচে, কিরসিন তেলের আকাল পড়বে শিগগির, হু হু করে দর চড়চে কলকাতায়, দেশ-গাঁ-এ মাথা কুটেও এক লিটার মেলে না। আপনারা এই সেদিন বললেন, ছ-মাস বাদে বিজলি-আলো দিবেন, সবদিক ভেবে পুরনো দরে একশ পিপে মাল তুলে ফেললুম গুদোমে। দর চড়চে, দেড়া হয়েচে, ডবল হবে। এখনও ছাড়চিনি, আর হুট করে বেইমানি করলেন আপনারা বাবু! একশ পিপে মাল, হাজার টাকার বেশি। ভদ্দর গেরস্থর ঘরে বিজলি জ্বলবে ত দুলেবাউড়িস াঁওতাল চাষাভুষার দু-চার পয়সার বিক্রিতে আমার এই হাজার টাকার মাল ক-বছরে ফুরোবে গো বাবু···মাত্তর পাঁচ-সাতদিনের জন্যি গাঁ-টাকে আঁধার করে দিন, মাত্তর সাতদিন···'

সন্তর্পণে একটু একটু করে হাতটা সরিয়ে নিলেন নটবর, লক্ষ করতে লাগলেন, খুশি হলেন, নিজের হাতে ফিরে আসছে না, ফিরে আসছে না, ধপাস করে মাটিতেও লুটিয়ে পড়ছে না··· জয় মা বিশেলাক্ষী, জয় জয় মা গো···এক-পা, দু-পা করে পিছিয়ে এলেন, আরও একটু অপেক্ষা করলেন, টোপটা অন্ধকারে উধাও হয়ে গেল। খুশিতে ভরে উঠল বুক। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন।

এখন অনেক রাত, ঘরে ফিরতে হবে।

পরদিন সন্ধ্যাবেলা আবার বুড়ি বেশ্যা মাগীগুলির মতো খিলখিল করে

হেসে উঠল সারা গ্রাম। আবার নাচনকুঁদন শুরু হলো মানুষগুলির। নটবর তাঁর আড়তের গদিতে বসে দেখলেন, বাজারের আর সব দোকানগুলিতে বিজলির-ডুম জ্বলছে। হরি দেওয়ানের ছেলে বংশী ছোঁড়াটা ওর মনোহারী দোকানের সামনে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে কেমন বাহারের রঙীন আলোর খেলা লাগিয়েছে, লালনীলহলুদসবুজ কেমন ঘুরপাক খাচ্ছে সাইন-বোর্ডের চারপাশে। দুলেবাউড়ি চাষাভুষার ভিড় লেগে গেছে। হা-ভাতের ব্যাটারা দেখছে হাঁ করে। ওদিকে মুখুজ্জেদের পাকাবাড়ির দোতলার জানালা থেকে সার্কাসের ফোকাসের মতো আলো এসে পড়েছে সাধু ঘোষের মিষ্টির দোকানটার খড়ের ছাউনির উপর। আর নিজের আড়তের পেট্রোম্যাক্সের আলোর চারদিকে কিলবিল করছে বাদলা পোকা। আলোয় টাকটা চকচক করছিল পালমশাইর, এবার স্ফটিকের মতো ঘাম জমতে লাগল। বিজলিবাতির বড়োবাবু দু-দিন সময় চেয়েছেন, নিজে এসে দেখা করে গেছেন। মনে মনে একটু সান্ত্বনা খুঁজলেন। দু-দিনের বাদশা সব, এত নাচনকুঁদন ফুরোবে শালাদের। তিনি আঁধার আনবেন, অনেক খরচপত্তর করে সৃষ্টিছাড়া কাণ্ড বন্ধ করবেন সব। থরে থরে সাজানো পিপেগুলির দৃশ্য চোখে ভাসছে। অনেক দাম। এ আঁধার বেঁচে থাকলে কেনালের পাশে তিন চার বিঘে সরেস নতুন ধানিজমি কেনা যায় ফি বছর।

হঠাৎ একটা সোরগোলে নটবর কান পাতলেন। জয়চণ্ডীতলায় আবার হল্লোড়হল্লা করে চেঁচাচ্ছে ছেলেবুড়োমাগীমদ্দা একসঙ্গে। যেন কী একটা মহাকাণ্ড ঘটিয়ে ফেলেছে ব্যাটারা। সিদ্ধিদাতা গণেশের পায়ের তলায় বসে গামছাটা টেনে নিয়ে নাকমুখঘাড়গর্দানটাকবুকপেটের ঘাম মুছলেন নটবর। একটু ভাবনাই হলো এবার। হল্লাটা ক্রমশই বাড়ছে, বাজারের লোকগুলি কাছা খুলে ছুটছে। দোকানের কর্মচারী মন্মথ ঝোলানো বাটখারায় ডাল মাপছিল খদ্দেরের জন্যে, পাশে তারাপদর তেলের-হাত। নটবর হাঁকলেন—'দ্যাখ তো রে কেউ, কী হলো হোথা।'

অনুমতি পেয়েই তারাপদ এক লাফে বাইরে, কয়েক পা এগিয়েও গেল—'জয়চণ্ডী-মার থানে সব আঁধার হয়ে গেচে বাবু, লোকেরা ছুটচে...'

আঁধার! জয়চণ্ডীতলায় সব আঁধার! তবে কী! তাড়াতাড়ি হাতবাকশোটায় চাবি দিলেন নটবর, সিন্দুকটা বন্ধ করলেন। জয়, জয় মা

চণ্ডী। তোমার নাটমণ্ডপে অমাবস্তের আঁধারকে দিন করতে চায় গো ওরা, নাস্তিকের দল, পাষণ্ড। মা, মাগো…নটবর অনেক কষ্টে মাটির-উপর-পাতা হাতের তালুতে বিশাল শরীরের ভর রেখে উঠলেন। থপথপ পা ফেলে বাইরে এলেন। সওদা করতে তাঁর আড়তের দিকেই আসছিলেন প্রহ্লাদ দেওয়ান। নটবর ব্যগ্রতায় প্রশ্ন করলেন—'কী গো। কী হয়েছে উদিকে?'

'জয়চণ্ডীতলার বিজলিবাতিটা খারাপ হয়ে গেছে, আঁধারে চিল্লাচ্ছে সব।'

সিন্দুকের চাবিকাঠির থোক ফতুয়ার পকেটে বাজিয়ে পরখ করে দেখেই আড়ত ফেলে এগোলেন নটবর। দুপাশের দোকানগুলিতে বিজলি জ্বলছে। এবং ম্লেচ্ছদের চোখ-ধাঁধানো আলোয় চোখ কুতকুত করে, ডানহাতের চার-আঙুল তুলে ভ্রূতে ঝাঁপি ঢেকে এগোতে লাগলেন। সত্যি আঁধার, কালো কুচকুচে আঁধার জয়চণ্ডীতলার চত্বরে। অনেক লোকের ভিড় হল্লা চেঁচামেচি চিৎকার। কেউ কারও মুখ দেখছে না। ধাক্কা খাচ্ছে, চেঁচাচ্ছে, ছেলেছোকরারা ফুট কাটছে, গলা ফাটিয়ে ডাকছে, খিস্তি করছে, শিস দিচ্ছে, গান গাইছে। শালারা আলোতেও নাচে, অন্ধকারেও নাচে। একটা হুজুগ পেলেই হলো। নটবর আস্তে আস্তে অন্ধকারে ভিড়ের মধ্যে ঢুকলেন, এক কোণে, চুপচাপ। লক্ষ করলেন এলোপাথাড়ি কতগুলি টর্চের আলো ঘুরে ফিরে পড়ছে আঁধারে, ডাইনে বাঁয়ে, এপাশে-ওপাশে, উপরে নিচে, চারদিকে। ওদিকে মস্তো উঁচু একটা মই বেয়ে শালকাঠের খুঁটিটার উপর উঠেছে দুটো লোক, কী সব সারাচ্ছে। নিচে অশথগাছের তলায় লোকগুলি অস্থির।

'যা শ্‌ শালা, আলো নে কাল এমন ফুর্তি হল, আর আজ…'

'দুঃ যত্তো ফোর টুয়েন্টি।'

'না রে, না, অমনটা হয়, যাসনি তো কলকাতায়, অত্তো বড়ো যে শহর—সেখেনেও, সেই সেবারে পিসিমার বাড়িতে রাত্তিরে খেতে বসেছি, ব্যস…গেল শালা সব আঁধার হয়ে। শহরের মানুষ, লণ্ঠনফণ্ঠন নেই, মোমবাতি নে এলো। সেই আধঘন্টা ধরে ঠায় বসে রইলুম…'

'দেখবি শালা, দুদিন একদিন পরে পরেই খারাপ হয়ে থাকবে, সেই মান্ধাতার আঁধার, এট্টু-আধটু ফুচুংকাচুং করে যাবে, সারাবে না ঘেঁচু…সব পয়সা, পয়সার জন্যি সব পারে মানুষ…'

'আরে রাখ, অশ্বিনী মুখুজ্জের বাড়িতে ওই কটা তো লোক, বেশি পাঁয়তারা কষবে তো দেবো শালাদের থুতনি কটা উড়িয়ে...'

অন্ধকারে অাঁৎকে উঠলেন নটবর। মানুষগুলিকে দেখলেন না, কণ্ঠস্বরেও চেনা মুস্কিল। ভিড়ের মধ্যে আরও একটু প্রবেশ করলেন। ওরা জানে না, সত্যি সত্যি অাঁধার আসছে গাঁ-এ, মান্ধাতার অাঁধার। অমাবস্তের অাঁধার নিয়ে খেলা করবি তোরা, ভগমানের নিয়ম ভাঙবি, এত সাহস! শ্মশান-কালীকে মা-সরস্বতী করে সাজালে কী পুজো হয় রে হা-ভাতের ব্যাটারা। এ তো সবে শুরু...নটবর আরও একটু এগোলেন...আজ জয়চণ্ডীতলা, কাল থেকে গোটা গ্রাম অাঁধারে ডুববে।

'আলো যখন এয়েছে একবার, আর অাঁধার হতে দেবো না আমরা...' কে যেন বলল জটলার মধ্যে।

নটবর থামলেন।

'কেন গো, মনে নেই! সেই সেবারে বিপিন ঘোষের বউটা মল সাপের দংশনে...তেঁতুলে-গোখরো, পালুই থেকে খড় টানছেল রেতের অাঁধারে, আর অমনি তলা থেকে...'

'সেই যদি বলো তো শিবু পালের অমন জোয়ানমরদ ছেলেটা, আহা কী লক্ষ্মী ছেলে গো, এই তো সিদিন, দু-হপ্তাও হবে না, কলেজ থেকে ফিরছেল, বেলতলার ধারে...'

'অাঁধারেই মরণ থাকে গো, সাপখোপ, খানাখন্দ, ভূতপেত্নী, চোর-ডাকাত...'

'ওরে বাপস, চোরডাকাতের কথা বলোনি গ, ডর নাগে।'

'ওরে আমার কে রে, তুর আবার চোরডাকাতের ভয় নাকি? উরা কেনে আসবে তুর ঘরে? তুর বৌর নাকের নোলক কাড়তে...' একটা হাসির হুল্লোড় বইল অন্ধকারে—'উরা আসবে নটবর পালের আড়তে, মনে নেই তুর, সেই সে বছর কী কাণ্ডটা হল, আসবে মুখুজ্জেদের বাড়িতে, ধানের গোলায়। যাদের বাড়ি বন্দুক আছে, উয়াদের সম্বন্ধী তো ডাকাতরা রে...'

ভিড়জটলাহল্লাচেঁচামেচির মধ্যে অন্ধকারে কাঁপতে থাকেন নটবর। সত্যি তো, ভীষণভাবে মনে পড়ল তাঁর, বছর দেড়েক আগে হাসানপুরের আড়তটায় একরাতে হাজার ছয়েক টাকা আর হাজার পাঁচেক টাকার মাল নিয়ে চম্পট দেয় ডাকাতরা। আড়তে ঘুমোচ্ছিল রাখু দুলে, ওকে দড়ি দিয়ে

আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখে যায়। নটবর ঘেমে উঠলেন, কাঁধের গামছা দিয়ে নাকমুখটাক মুছলেন। ধানের মরাই, খড়ের পালুই, দরদালান, মাটির ঘরের খোপেখপ্পরে সাপ, বিষধর জাতসাপ সব। নটবর ভিতরে ভিতরে অস্থির হয়ে ওঠেন। ছোটমেয়ে গিরিবালাটা তো সাপের কামড়েই মরেছে, গ্যাটার মা-ও তো তিনবার কপাল গুণে রক্ষা পেল। সত্যি, মাথা ঘুরছে, ঝিমঝিম করছে, সেঁধিয়ে যাচ্ছে শরীর। নটবর টলতে টলতে এগোলেন।

'এই অাঁধারেই নটবর পালের বাপ সীতেনাথ পালকে খুন করেছিল রতন বাউড়ি…' কে যেন চিৎকার করে বলল অন্ধকারে। নটবর থমকে দাঁড়ালেন। কণ্ঠস্বরটা চেনার চেষ্টা করলেন। নিধু বাগদী। গাঁ-এর পুরানো লোক। মাথাটা পাক খাচ্ছে, টলছে। কোণাকুণি চণ্ডী-মার নাটমণ্ডপের দিকে এগোলেন। একটু বিশ্রাম দরকার, একটু জিরোবেন—আর এক পাও চলতে পারছেন না। নাটমণ্ডপের এক কোণে ঝুপ করে বসে পড়লেন। এগোলেই গায়ে গায়ে ধাক্কা, ধাক্কায় লণ্ঠন উঁচিয়ে ধরবে মানুষ, টর্চের আলো ফেলবে। মানুষ! মানুষকেই এখন ভয়। আলোর নেশা লেগেছে ওদের। আঁধারে ক্ষেপে উঠেছে। জটলা বাঁধছে। অন্ধকারে গা ঢেকে নাটমণ্ডপের খিলানে হেলান দিয়ে হাঁপাতে লাগলেন। অাঁধার, অাঁধার! শ্মশানকালীর উদোম পিঠে এলোচুল। গোটা গ্রাম অাঁধার হবে কাল, মানুষগুলি ক্ষেপে উঠবে, তখন, তখন যদি একবার জানতে পারে? ওদের চোখের মণি অাঁধার হয়ে যাবে! অন্ধ মানুষগুলি দল বেঁধে তার চোখজোড়া উপড়ে ফেলতে চাইবে। ভাগাড়ের শকুনের মতো। শরীরটা এমন হচ্ছে কেন, মাথাটা ভিমড়ি খেয়ে দোল খাচ্ছে, ঢলে পড়ছে, খিঁচুনি ধরছে পেটে আর বুকে। খিলানে পিঠ ঠেসে একটু শক্ত হতে চেষ্টা করলেন, চোখ বুজে দম বন্ধ করে ঝিম মেরে রইলেন। এত অাঁধার, জগত জুড়ে এত অাঁধার! ক্ষণে ক্ষণে বিজলি ঝলসাচ্ছে, মেঘ ডাকছে, আকাশ ছেয়ে বৃষ্টি, শ্রাবণ মাস…মা বিশেলাক্ষী, মা বাশুলী, মা মা-গো…অমাবস্যের বাদলারাতে চারদিক থেকে এত মানুষ ছুটে আসছে কেন মা? ওরা আলো চায়, তেল চায়, তেল, লণ্ঠনের তেল, আড়তের ঝাঁপের পাশে তেলের পিপে নিয়ে বসে গেছে তারাপদ, এক হাতে পারছে না, হুমড়ি খেয়ে পড়েছে মানুষগুলি, মাথায় টানা বৃষ্টি নিয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে,

মাথায় তালপাতার টোকা, চটের বস্তা, ছাতা—সব ভিজে হাপুইসুটি, বাচ্চার মুখে মাই দিয়ে এসেছিল চাষী-বৌরা, বাচ্চাকে বুকে জড়িয়ে পিঠে আকাশ ঢেকে, শক্ত মুঠিতে বোতল চেপে…ভিড়ের জায়গা ছাড়ল না কেউ, শিশুদের কান্না, বড়োদের হল্লাচিৎকারকাড়াকাড়িঠেলাঠেলিতে বৃষ্টির একটানা ঝমঝম শব্দ কোথায় ডুবে যাচ্ছে, ভিড়ের চাপে দোকানের ঝাঁপের বাঁশ ভেঙে পড়ছে, নিজেও আর পারছেন না নটবর, গলদঘর্ম…মাথার কাছে পেট্রোম্যাকসের শোঁ শোঁ শব্দে বাদলা পোকার কিলবিল, হট্টগোলে হিসেবের ভুল হয়ে যাচ্ছে, চোখের পলকে পিপের পর পিপে ফুরিয়ে যাচ্ছে, এক নাগাড়ে পয়সা গুণতে গুণতে হাত ধরে গেল, চাঁদি-টুকরোয় ভরে যাচ্ছে বাকশোর গর্তগুলি, নোট আসছে, যন্ত্রের মতো একের পর এক খুচরো গুণতে গুণতে চল্লিশ বছরের পুরানো অভ্যাসেও কেমন ভুল হয়ে যায়… হঠাৎ, একেবারেই হঠাৎ, একটা লকলকে আগুনের হলকা চোখ ঝলসে দিতেই প্রচণ্ড এক আগুনের গোল্লা ত্বরিতে ছিটকে গিয়ে চারদিকের ঘরবাড়িগাছপালা ফর্সা করে, চোখের মণি পুড়িয়ে দিয়ে আবার সেই নিশুতির অন্ধকারে থরথর করে ব্রহ্মাণ্ড কাঁপিয়ে, কানকে বধির করে, সব আলো, সব শব্দ, স্তব্ধ করে…পলকের মধ্যেই ঘটল সব কিছু, সমস্ত জনতা, চাষিজোতদার, বামুনকায়েতদুলেবাগদি, মাগীমদ্দা সব একাকার দলা পাকিয়ে প্রচণ্ড আর্তনাদে হুড়মুড় করে দোকানের ঝাঁপ ভেঙে দুমড়ে মুচড়ে, পাল্লাবাটখারা, তেলনুনচালডালমশলার সব কিছু পায়ের তলায় মিশিয়ে গুঁড়িয়ে ভেজা কাপড়ের জলে বান ভাসিয়ে ঢুকতে লাগল…সব গেল, সব ভেসে গেল মা, বাপঠাকুরদ্দার ব্যবসাপত্তর, বিষয়সম্পত্তি, পুঁজি, রক্ত চিড়মিড় করে ফুটছে মাথায়, নটবর পালের সাধ্যি নেই এ জনস্রোতকে রুখে দাঁড়ায়, কোনোমতে উঠে দাঁড়িয়ে, দেওয়ালে পিঠ ঠেসে, সত্তর বছরের বুড়ো শরীরটায় যতদূর সম্ভব শক্তি দিয়ে ভিড়ের চাপ রুখতে রুখতে হঠাৎ অনুভব করলেন, বাচ্চা-কোলে একটা মেয়েছেলের নরম শরীর তাঁর বুকে আছড়ে পড়ছে, বুড়ো রক্তে চনমন লাগল, হাত বাড়িয়ে জড়াতে গেলেন, ভেজাশরীর পিছলে গেল, শুধু বুঝলেন, স্পষ্ট অনুভব করলেন, একটা শিশু তাঁর শরীর বেয়ে গড়াতে গড়াতে, মানুষের ধাক্কায় একটু একটু করে নামতে নামতে, একেবারে পায়ের কাছে, পায়ের পাতার তলায়…একটু ঝুঁকতে চেষ্টা করলেন, পারলেন না, ভিড়ের চাপ তাঁকে সোজা করে রেখেছে,

পায়ের তলায় একরত্তি তুলতুলে শরীর, মেঘ গজরাচ্ছে আকাশে, সারা গ্রাম জুড়ে চেঁচাচ্ছে মানুষ, পেট্রোম্যাক্সের উপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে ভিড়…কে যেন হঠাৎ শিকে থেকে আলোটা খুলে নিয়ে ভিড়ের উল্টো টানে ছুটে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলো রাস্তায়, শেষ আলোটা নিভে যাবার পর অাঁধার…মা বিশেলাক্ষী, মা-গো…চারদিকের তুমুল চিৎকারে নটবরের বুকভাঙা কান্নার ধ্বনি ডুবে গেল, এমন শ্মশানকালীর করাল অাঁধার দেখেনি কেউ কোনদিন…মোচড় দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার চেষ্টা করলেন বারবার, ভিড়ের চাপে থেঁতলে যাচ্ছেন, নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে, হাঁপ ধরছে বুকে, হল্লা চিৎকার আর আর্তনাদের মধ্যে দু-হাতে ভিড় ঠেলে কোনোমতে বুড়ো হাড়ের সব শক্তি নিঃশেষ করে এগোতে এগোতে হাঁপাতে হাঁপাতে এক সময়ে অকস্মাৎ ছিটকে পড়লেন বাইরে, আঁধারে, হাঁটু-ডোবা কাদায় মুখ থুবড়ে হুমড়ি খেলেন…জল, জল, আকাশ ভেঙে জল, ক্ষণে ক্ষণে বিজলির ঝিলিক, কী ভয়ঙ্কর মেঘের ডাক, থরথর থরথর করে কাঁপছে চারদিক, একটু আগে বাজ পড়ছে কোথায়, এখানে, এ গাঁয়েই, খিঁচুনি ধরল পাঁজরাটায়— ভয়ে কাদায়-মুখ-থুবড়নো মাথাটা তুললেন, দেহ উঠল না, ভেঙে পড়ছে ভারে, কনুই কামড়ে ধরছে কাদা, হাঁটুকোমর লেপটে যাচ্ছে, পিছনে আড়ত ভেঙে তছনছ করছে হা-ভাতের ব্যাটারা, নটবর এগোতে লাগলেন, হামাগুড়ি দিয়ে, মাটিকে জড়িয়ে…পিঠের উপর লাফিয়ে উঠছে ব্যাঙ, বড়ো বড়ো জলের ফোঁটায় সেঁধিয়ে যাচ্ছে পিঠ, নটবর থামলেন, অনেক কষ্টে হাঁটু ভেঙে বসে, হাঁটুতে হাতের ভর রেখে উঠে দাঁড়াতে চাইলেন, উঠতে চেষ্টা করলেন, আছড়ে পড়লেন, আবার চেষ্টা করলেন, উঠলেন, উঠে দম নিলেন, থপথপ পা টেনে এগোতে লাগলেন, আবার একটা লকলকে আগুনের হলকা, দু-হাতে কান ঢাকলেন, প্রচণ্ড বিস্ফোরণের শব্দে কান বধির হয়ে গেল, আকাশে গুড়গুড় গুড়গুড়, ধরণী কাঁপছে থরথর, থরথর, তারপর অাঁধার, অাঁধার—আকাশে বর্ণ নেই, ডানে বাঁয়ে, সামনে পিছনে দেয়াল নেই, তালসুপুরিখেজুরনারকেল খড়ের-ছাউনি আর দালানকোঠার চূড়োয় ভুতুড়ে ছবিগুলিও দেখা যায় না এ-অাঁধারে, মরণের ভয় লাগল…মার ছবি ভাসে, বুড়ি মা ঘরে শুয়েই হাগে, পেচ্ছাব করে, ন্যাটার-মা তেরটা বাচ্চা বিইয়ে লিকলিকে হাড়চিমসে শরীর, ছেলেমেয়ে গুলি…হাউমাউ করে কেঁদে উঠলেন নটবর, বৃষ্টি আর ঝড়ের ঝাপটায়

খড়ের ছাউনিতে জলে-কাদায় শব্দের বোল বাজছে...এ আঁধার ফুরোবে না গো, সুয্যি উঠবে না পিথিবীতে...নটবর প্রচণ্ড একটা ধাক্কা খেলেন, নাক আর থুতনিটা থেঁতলে গেল, মাথাটা হাতের তালুতে চেপে ধরলেন, এক নিমেষে ঝিম ধরে গেল শরীরে, পাক খেয়ে হেলে পড়তে পড়তে আবার সামলে নিয়ে জাপটে ধরলেন...গাছ, প্রকাণ্ড গাছ, দুহাত বাড়িয়েও বেড় পেলেন না, বিশাল গুঁড়ি, অশত্থ, সেই বুড়ো অশত্থ, জয়চণ্ডীতলা, জয় জয় মা-চণ্ডী...আচমকা শিউরে উঠলেন...কে, কে ওখানে? হাঁপানি আর কফের টানে সাড়া পেলেন, ব্রহ্মতালু থেকে পায়ের পাতা অবদি হলহল হলহল ঠাণ্ডা-ঝিমনো রক্তের ঢল—কে, রতন বাউড়ি, তুমি, তুমি হোথা। দু-হাতে কান ঢাকালেন নটবর, না, শুনবেন না, কিছুতেই না...কে লটবর, তুমি, তুমি হোথা, শুনি, মানষে নাকি আলো বাইনেচে লটবর, বাহারের জেদী আলো আমি তো শালা অন্ধা, ভগমান আমায় আঁধার দিচেন, তুমার তো দু-দুটো তাজা লয়ন আছে গ, তুমি দেক নাই, লটবর অ লটবর...ভয়ে আঁৎকে উঠে গাছের গুঁড়ি ছেড়ে ছিটকে পিছিয়ে এলেন নটবর, আবার হুমড়ি খেয়ে লেপটে পড়লেন কাদায়, শক্ত গাছের গুঁড়িতে বুকটা গিয়ে পড়ল, পাঁজরা দুটো ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল বুঝি, দম বন্ধ হয়ে আসছে, জলে জলে নিশ্বাস নিতে কষ্ট...হাঁটতে পারছেন না, পুবপশ্চিমউত্তরদক্ষিণ, কোথায় যাবেন, কোনদিকে...তুমরা নাকি আলো বাইনেচ গ লটবর, বাহারের আলো, বায়োস্কোপের ছবি, আমার লাতনিটাকে এট্টু খুঁজি দাও না গ, লটবর, অ লটবর, তুমার বাপেরে খুন কইরেচি আমি, বদলা নিয়োনি, শুন, লটবর, তুমার তো দুটো ডাগর ডাগর লয়ন আছে গ, শুন, আমার আলো নাই, দিন নাই, আমার সব আঁধার...পায়ের তলায় ধস নামল, হাঁটু পর্যন্ত কামড়ে ধরল মাটি, গড়িয়ে যাচ্ছে, গড়িয়ে নামছে শরীর, গড়িয়ে নামতে নামতে শেষবারের মতো একবার মাটিতে বুক ঘসে, দেহের সব শক্তি দিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বুনোঝোপের গোড়া ধরে বাঁচতে চাইলেন শেষবারের মতো, শেকড়শুদ্ধু উপড়ে এলো, গড়াতে গড়াতে, শেয়ালকাঁটা, কাঁটানটে, ফণিমনসা, বাবলা আর খেজুরচারায় ক্ষতবিক্ষত হয়ে, পরনের ধুতি আর গায়ের ফতুয়া ছিঁড়েখুঁড়ে ন্যাংটো হয়ে, উদোম ন্যাংটো, হঠাৎ আটকে গেলেন, মাটি খিমচে গাছের গোড়া ধরে উঠতে চেষ্টা করলেন, অসম্ভব, বাঁ...চা...ও...গলার শিরাগুলি ছিঁড়ে চিৎকার করে ডাকলেন, কানে

বিঁধছে—নটবর, অ নটবর, তুমার তো ডাগর ডাগর নয়ন আছে গ, কী বাহারের আলো বাইনেচে, তুমি দেকো না…খাঁাতলানো কাঁটানটের উপর বুক ঘেঁসড়ে কাতরাতে কাতরাতে উঠতে চেষ্টা করলেন, গড়িয়ে পড়লেন, আঁৎকে উঠলেন, এ কোথায় এসে পড়েছেন তিনি, কোথায় গো… সব্বোনাশ …মা বিশেলাক্ষী, মা বাশুলী, এ কী হলো, মা…গো …পায়ের পাতায় ঠাণ্ডা বরফের শীতল জল, ঘোষপাড়ার ঝাঁকড়া তেঁতুল গাছের তলায় তিন শ বছরের পুরনো দহ, জলজজলা মা-মনসার ঝিল, খেয়ো-গোখয়ো তেঁতুল-গোখরো চন্দ্রবোড়া কেউটে… আঁতুড়ঘরে শিশুর চিৎকার শুনলেন নটবর, বড়োছেলে ন্যাটার-বৌ বাচ্চা বিয়োবে, উঠোনে খেজুর-পাতার আঁতুড় ঘর, পেরথম নাতি…তুমার বাপেরে খুন কইরেচি আমি, বদলা নিয়ো নি, নটবর অ নটবর…বৃষ্টির জোর বাড়ছে, পিঠে বিঁধছে, শেষবারের মতো আর্তনাদে আকাশ ফাটালেন—করুণ আর্তনাদ, বিজলি ঠিকরলো, মেঘ ফেটে চৌচির হলো, সত্তর বছরের বুড়ো হাড়ে নেতিয়ে পড়লেন, ঝিমিয়ে আসছে, ঝিমিয়ে আসছে শরীর, পায়ের পাতায় অসহ্য যন্ত্রণা, পাকে পাকে জড়িয়ে ধরছে, রক্তের বানে বরফ গলছে, চোখ তুলে তাকালেন উপরের দিকে—আঁধার, ডানে-বাঁয়ে, উত্তরেদক্ষিণে পুবেপশ্চিমে, আঁধার, আঁধার, শ্মশানকালীর করাল আঁধার কিন্তু শেষ-মুহূর্তে, মাথাটা ঢলে পড়ার ঠিক আগে, একবার, শুধু বাঁচার তাগিদে বুক চিরে আর্তনাদ করে উঠতেই হঠাৎ চমকে উঠলেন নটবর—এক ঝলক তীব্র আলো এসে পড়েছে চোখেমুখে, ঘেমে নেয়ে উঠেছেন, হাঁপাচ্ছেন, আর চারপাশে কতগুলি জোড়া জোড়া চোখ, চেনামুখ, গাঁয়েরই মানুষ, বিজলি-ঠিকরনো চোখগুলি তাঁকে বিঁধছে।

'কী গো পালমশাই, অমন চেঁচিয়ে উঠলেন কেনে?'

চেতনায় ফিরে আসতে সময় লাগল। পাগলের মতো পেটেবুকেমুখে হাত বুলিয়ে নিজেকে খুঁজলেন। বিশ্বাস করতে পারছেন না নটবর। গামছা দিয়ে নাকমুখঘাড়গর্দান মুছেও ধরতে পারছেন না। এখনও একটা ভয়। বুকের পাঁজরা দুটো কুঁচকে যাচ্ছে ভয়ে। চারদিকে তাকালেন, এপাশে-ওপাশে, জয়চণ্ডীতলার বিজলি ডুমটা তেজী সূর্যের মতো জ্বলছে, অশত্থের কচি সবুজ পাতায় ঝলমল ঝলমল করছে আলো। মানুষজন চলে গেছে। ভিড় নেই। শুধু এই কটা লোক তার চারপাশে। গোলগোল ড্যাবডেবে

'অসহায় চোখ তুলে তাকালেন। এদিক ওদিক থেকে চোখে তীব্র আলোর ঝাঁঝ—শত্তুর। কিন্তু আঁধার আসবে কাল। নটবর আরো শিউরে উঠলেন ভয়ে। মানুষের কাঁধে ভর রেখে দাঁড়ালেন। রাত কত হলো? দু-পহর। তিন পহর। জয়চণ্ডীতলায় দশমুণ্ডওলা রাবণের ঝাঁকড়া-মাথা অশথের ছায়া পেরিয়ে টলতে টলতে আড়তের দিকে এগোলেন। আর ভাবতে পারছেন না কিছু, বুকটা টিপটিপ করছে এখনও। আলো শত্তুর, আঁধারে ভয়—কোথায় দাঁড়াবেন? রাত্তিরকে দু-ফালি করলে মাঝখানটা ফাঁকা।

কিংবদন্তি

বাঁশের মাচার এক কোণে জ্বলছিল হ্যাজাকের আলোটা। সেই সন্ধে থেকে একটানা ভঁস্-ভঁস্ করে ফুঁসছে। তেল পুড়ছে আর ঝাঁকে-ঝাঁকে পোকা এসে কিলবিল করে ঘুরছে চারদিকে, ঠোক্কর খেয়ে পুড়ে পুড়ে মরছে। জোয়ানবুড়ো মাগীমদ্দা মানুষগুলির মতো। ওষুধ নেই, পথ্যি নেই ডাক্তারবদ্যি কিছু নেই, যেন মরলেই হলো। অমাবস্যের রাত। আকাশ ছেপে আঁধার! ঘুটঘুটে আঁধার। তিন ক্রোশ, চার ক্রোশ দূরের-দূরের গ্রামগঞ্জ, খানাখন্দ, বুক-টান-করা মাঠের পর মাঠ সব কালো করে চারপাশে চাপ-চাপ অঁাধার। মরামানুষের পাঁজরার মতো ঠায় ঝিম মেরে দাঁড়িয়ে আছে গাছপালা, বাঁশবন, ঝোপজঙ্গল। একটু বাতাস নেই, নিশ্বেস নিতে কষ্ট হয়, বুকে টান ধরে। গায়েগতরে শুধু নোনতা ঘামের ঢল। চিমসে পেটে কালো মানুষগুলি ধুঁকতে ধুঁকতে আসে, হাঁটু ভেঙে বসে, মাটিতে লুটোয়—মা, মা গ, রক্ষে কর মা গ। মাঠ পুইড়ে খাক হল, হালনাঙল সব বিকোল, দেশ জুইড়ে ভাগাড়। স্বজনস্বজাতি শ্যালশকুনে খায়…

মায়ের-থানে তাকিয়ে থাকতেও ভয়।

ভয়। মায়ের-থান সাজিয়েছে জোয়ানমরদ বাউড়িরা, যারা এই আকালেও ঘরের বাপ্-মা, স্বজনস্বজাতিকে টেনে-হিঁচড়ে সোনাডাঙার মাঠের ভাগাড়ে শেয়াল-শকুনের মুখে ফেলে আসতে পারে। চারটে বাঁশ পুঁতে মাচা, বাহারের খেজুরপাতা আর কামিনীগাছের ডাল দিয়ে ঘিরেছে চারদিক। চার-চারটে ধুনুচি থেকে ধোঁয়ার-কুণ্ডলী উঠছে, সরু হয়ে উপরের ছাউনিতে গিয়ে ছড়িয়ে পড়ে পাকে পাকে মোচড় খেয়ে খেয়ে ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় আড়াল হয়ে যাচ্ছে শ্মশানকালীর মূর্তি। লাল-কাপড়-পরা কাপালিক ঠাকুর ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় মিশে গেলেন। আধ-বস্তা ধানের পেন্নামী দিয়ে দূরের গাঁ থেকে আনতে হয়েছে বামুনঠাকুরকে। এই আকালের দিনে কেউ আর চায় না মুখপানে। মানুষগুলি মানুষ নেই আর।

শুয়োরের মতো মাটি শোঁকে।' সুযোগ পেলেই হাড়মাস চিমসে নিতে চায়।

ড্যাং ড্যাং ড্যাং বাদ্যি বাজে। নিঝুম রাতের মাঠে মাঠে ছড়ায়। ধরাস ধরাস করে বুকগুলি, চোখের পলক পড়ে না। বাউড়িদের গাঁ-এ এমন বাদ্যি বাজেনি কোনদিন। কিন্তু কথা বলে না কেউ। চুপটি করে বসে থেকে আর বুকের ভিতর সিঁধিয়ে গিয়ে বাচ্চাবুড়ো সকলেই খিদেয় তেষ্টায় কাতরায়। ধোঁয়ার নাচন দেখে আর ভাবে—অমন সোনার-মাঠ ভাগাড় হলো কোন বিধাতার শাপে? সব জ্বলে-পুড়ে খাক। চোত-বোশেখের মাঠ, পোয়াতি বৌ-এর পেট খালাস হলে যেমনটা হয়, ফেটে ফেটে চৌচির। বড়ো বড়ো হা। লাঙল ফেললে ঈষ ডোবে না, মোষবলদের পা ডুবে যায়। তিন চার ক্রোশ ধরে ছড়ানো ।বশাল মাঠের মাঝখানে পঞ্চাশ-ষাট ঘরের বাউড়িদের ছোট গ্রাম। পিঠের আঁচিলের মতো। ইঁদারা নেই পঞ্চাইতের টেপা-কল ছিল একটা, গেল দু-সন ধরে পড়ে পড়ে মরচে ধরল। হাত দিলে শুধু খটাং খটাং করে। এঁদোডোবা, পানাপুকুর দু-একটা যা-ও ছিল, অগস্ত্যমুনি শুষে নিলেন। তলানির কাদাও শুকিয়ে কাঠ, পায়ে-পায়ে বেঁধে। রাতদুপুরে গোয়ালের দড়ি ছিঁড়ে গাইবলদ মাঠে মাঠে ছোটে। তেষ্টা। তেষ্টার টানে সারা মাঠ জুড়ে ডাকতে ডাকতে আঁধার রাতে কোথায় চলে যায়। সব ফেরে না। দু-চারটের খোঁজ মেলে—মাঠের মধ্যে হুমড়ি খেয়ে মরে পড়ে আছে। শেয়ালশকুনের মোচ্ছব। শিবঠাকুরের বাহন। চাষির ঘরে মা-বাপ। তেষ্টায় বুকের-ছাতি ফাটে। সইতে পারে না চাষি। চোখ ফেটে জল গড়ায়। চোখের কোল থেকে গাল বেয়ে ঠোঁটের দিকে নামে। জিবের ডগায় লোনাস্বাদ। বাপের গাল চাটে ছেলে। গলা ভেজে না। তেষ্টা। জগৎ জুড়ে ছেলেবুড়ো, মাগীমদ্দা সব মানুষের তেষ্টা। নির্দয় আকাশ। কুকুর বেড়ালের বাচ্চার মতো মানুষের বাচ্চাগুলি বাউড়ি বৌ-র বুক খাবলে ধরে, মাই কামড়ে রক্ত চোষে। যন্ত্রণায় কাতরায় বৌ। কিলচড়ঘুসিলাথিকান্না—কার বৌ, কার বাচ্চা! এক বাউড়ি বৌ-র দুধ-জমানো-বুকে বাউড়ি বাচ্চাদের মোচ্ছব। দুধেল গাই মুখ মুচড়ে আছড়ে পড়ে মাটিতে, ধুঁকতে ধুঁকতে মরে যায়। টেনে-হিঁচড়ে ভাগাড়ে টেনে নেবার মানুষ নেই। মরক। গাইবাছুরমোষবলদকুকুরবেড়ালের মরাশরীর পচেগলে দুর্গন্ধ ছড়ায়। ঝাঁকে ঝাঁকে শকুন ওড়ে গাঁয়ের আকাশে। মাটির

ঘরের চালে, বাড়ন্ত মরাই-এর উপর, তালখেঁজুরের ডগায়, শেতলা মায়ের থানে, ঘরের দাওয়ায়, নিকোন উঠোনে শকুন। দিনদুপুরে পরান বাউড়ির ন্যাংটো মেয়েটাকে উঠোন থেকে ছুঁচোল ঠোঁটের ডগায় গেঁথে উড়িয়ে নিয়ে গেল একটা শকুন। মেয়েটার কান্নায় পড়শীরা ছুটে এসে ভিড় করল। হাঁ করে ঘাড় উঁচিয়ে দেখল সবাই, সাতজন্মে এমন অলক্ষুণে কাণ্ড দেখেনি কেউ—চার মাসের একটা শিশুর বুক-চেরা কান্না সীতা মায়ের মতো উড়ে যাচ্ছে আকাশে, টপ্ টপ্ করে রক্ত ঝরছে মাটিতে। চিনে চিনে জোয়ানরা মাঠের দিকে অনেকদূর এগোল। বিশাল ডানার ছায়াটা মাঠের উপর দিয়ে হারিয়ে গেল কোথায়! সেই থেকে একটা ভয়, অমাবস্যের আঁধারে শকুনের ডানা-ঝাপটানির তলায় ভয় আর তরাসে বুক কাঁপতে থাকে। মুখ ভুলে কথা কইতে সাহস পায় না কেউ। কি সব্বোনেশে কাল গ। অমন ছিষ্টিছাড়া মরণ! জন্মো জন্মো পাপের ভোগান্তি গ। অকল্যেন। ঘরে ঘরে কান্না আর নাভিশ্বাস। বমি আর পায়খানায় মাখামাখি। মাগীমদ্দা ছেলেবুড়ো প্রাণপণে মাটি আঁচড়ায়। জল! তেষ্টার জল! এক ফোঁটা জলের আশ মেইটে দাও গ ভগমান। হেই মা রক্ষেকালী! মা শেতলা! মা গ…

সোনাডাঙা মাঠের ধারে একটা গভীর ডোবার তলায় কাদামাটির ঘোলাটে জল খুঁজে পেল বাউড়িরা। রাতদুপুরের তেষ্টায়, জলের নেশায় ছুটে এসেছে গাইবলদমানুষ, হুমড়ি খেয়ে মরে পড়েছে পাশাপাশি। সেই জলে বিষ। বিধাতার শাপ। সেই বিষেই মড়ক এলো। মরণ…

পালুই-এর তলায় অন্ধকার থেকে, ঝোপজঙ্গলের ফাঁকে চুকচুক করে জিব চাটতে চাটতে দিনদুপুরে বেরিয়ে আসে শেয়ালেরা। সোনা বাউড়ির বুড়ো বাপ হাড়-জিরজিরে নধর বাউড়িকে ঘরের ভিতর গিয়ে কামড়ে ধরল। তাড়া খেয়ে পালাল বটে, কিন্তু বুড়ো গল্‌গল্ বমি করতে করতে এবং ক্ষিধেয় তেষ্টায় সেই বমি চাটতে চাটতে ধুঁকে ধুঁকে মরল। মরণটা ছড়িয়ে পড়ল ঘরে ঘরে। বুক হাতড়ে, গলা ছিঁড়ে অসহায় কাতরানি। জোয়ানমরদ যারা তখনও ঘরের বাইরে এসে দাঁড়াতে পারে, বুঝতে পারে না, কি করবে! মাঠের মাঝে মাঝে ছেঁড়া ছেঁড়া গ্রাম—সুতাহাটি, জাগুলি, মাতালি কোমপুর, দুলেবাগদীবাউড়ি ক্ষেতমজুর গরিব কিষেণের বাস। দূর থেকেই দেখা যায় সব গাঁয়ের আকাশেই কাকচিলের মতো টান টান ডানা-মেলা শকুন, মাঠ ভরে ভাগাড়, আমকাঁঠালতেঁতুল বট-

অশ্বত্থের পাতা ঢেকে ডানা ঝাঁপটাচ্ছে শকুনের পাল। রক্ষে নেই। মা শেতলার শাপ। 'জন-মনিষ্যি আর বাঁইচবে না গ। মরণ।' ঘরে ঘরে কান্না। ডাক্তার-বদ্যি নেই। আসবে না কেউ। আসেও না। আড়াই ক্রোশ দূরে, সরকারি পাকারাস্তার ধারে বামুনকায়েত, মালিকজোতদার কত্তাবাবুদের গ্রাম। হাটবাজার, দোকানপাট, ডাক্তারবদ্যি, টেপাকল, ইঁদারা, শান-বাঁধান দীঘি সব আছে বাবুদের। শহর থেকে বাবুদের লোক এসেছিল, ছুঁচ ফুঁড়ে দিয়ে গেছে জনে জনে, মাঠ পেরিয়ে গরিবদের গাঁ-এ আসেনি অ্যান্দুর! গাঁ-এর বুড়ো মুরুব্বি ফকির বাউড়ি মদন, কানু, বিশে নন্দকে নিয়ে এই বোশেখ-মাসের আগুন মাথায় বয়ে ভরদুপুরে গিয়েছিল বাবুদের দোরে। সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারবাবু, যামিনী ডাক্তার, নলেন কবরেজ—সকলের পায়ে মাথা কুটে কান্নাকাটি করে ফিরে এলো। কেউ এলেন না। চারদিকে মড়ক, পোকামাকড়ের মতো মরছে মানুষ। পেটে দানা নেই কিন্তু ওরা পেট পুরে জল খেয়ে এলো, তিনটে মেটে-ঘড়ায় জল নিয়ে এলো গাঁ-এ। জল! এক দুপুর ধরে কয়েক হাজার মেয়েপুরুষের সঙ্গে লড়াই করে জল এনেছে। মাঠের আল ধরে ঘড়া-মাথায় ওদের আসতে দেখেই গাঁ-এর ছেলেবুড়োমাগীমদ্দা পিল্‌পিল্‌ করে ছুটে গেল লোভে, দু পা সোজা করে দাঁড়াতে পারে, এমন-যতোগুলি মানুষ ছিল, সবাই। সোরগোল তুলে হুমড়ি খেয়ে পড়তেই তিনটে ঘড়া মাটিতে পড়ে গুঁড়িয়ে গেল। গড়িয়ে গড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ল মাঠে। মাঠের তেষ্টা আকাশ ভেজায়! মানুষের সাধ্যি কি? দু-ঘড়া জল চোখের পলকে শুকিয়ে গেল আলুকেউটের গর্তে। নন্দ বাউড়ির মাথার ঘড়াটাও যাচ্ছিল। পড়ি-পড়ি করে হাত ফসকে যাবার আগেই লাফ মেরে হাত বাড়িয়ে ওটা ধরে, নিজের মাথায় কেড়ে নিয়ে ছুটতে শুরু করল সদা বাউড়ির মেয়ে টেঁপি। ভয়ঙ্কর মেয়ে। ঘড়াটাকে মাথায় বসিয়ে সোজা ছুটল গাঁ-এর দিকে। একঘড়া জল। অমন সাধের অমেত্ত। ও বেহায়া ছুঁড়ি একা লিবে কেনে? রোগা-আধমরা টিঙটিঙে মেয়েপুরুষ কাচ্চাবাচ্চা সবাই মিলে ওকে ছেঁকে ধরল আলের উপরই।

'ই আমার তরে লয় গ, তুদের দিব। জনে জনে ভাগ কইরে দিব… হা-পিত্যেশ করিস লাই…ই তুদের…'

কে শোনে। সবাই মিলে খামচে ধরল। কিলচড়খামচি আর কামড়,

মেয়েটা সামলাতে পারল না। মাথার উপরই ঘড়াটা ফাটল। গল্‌গল্‌ করে টেপাকলের ঠাণ্ডা-জল ওর দেহ ভিজিয়ে ওর জট-পাকানো লালচে দীঘল চুল, নাকমুখঘাড়গলাবুক, বুকের কাপড় সব ভিজিয়ে স্নান করিয়ে দিলো।

আহ, কি সুখ! যেন বর্ষার জলে কাদা-মাঠে ধান রুইতে নেমেছে মনে হয়। আরামে চোখ বোজে টেঁপি। আর তখন ওকে নিয়ে ছুটোপুটি। ওর শরীর চাটে জোয়ানবুড়ো মাগীমদ্দা। সোমত্তা মেয়েমানুষের টগবগে শরীর। পুরুষমানুষের জিবে শেয়ালের লালা। সর্ব অঙ্গ জ্বলে। যৈবন! যৈবন! সোমত্তা মেয়েমানুষের শরীলটাই যে মরণের পোকা গ। আকালেমড়কে বাঁচি যদি, শরীল রাখি কুথা! মেয়েটা বাঁচতে চায়। চারদিকে মারধোর করে বেরোতে চেষ্টা করে। কিন্তু ওর ভেজা-শাড়ির আঁচল ধরে টান। টেঁপি চিৎকার করে ডাকে, দু-হাতে প্রতিরোধেরচেষ্টা—'লজ্জা গ, মেয়েমানষের এজ্জত...' ভেজাশাড়ির আঁচল টেনে দাঁতে কামড়ে, চুষে চুষে গলা ভেজায় দেশ-গাঁয়ের চেনা-মানুষেরা। সব জানোয়ার বনে গেছে, শেয়াল-কুকুর। মেয়েটা ভয় পায়, দু-হাতে বুকের মাই চেপে তাকিয়ে দেখে, নিজেও ঘাবড়ে যায়—মানুষগুলি মানুষ নয় আর, ওরা এবার মানুষের রক্ত চুষে খাবে। ছেঁড়া তালিমারা ডুরিকাটা পুরানো শাড়িটা মাঠের মাঝখানে ঘরের মানুষের হাতে চলে যেতেই সম্পূর্ণ ন্যাংটো হয়ে, এক-কুড়ি বয়সের তাজা মেয়েটা অমন কাঁচা বয়সের ডাগর শরীরটা নাচাতে নাচাতে আলের পথ ধরে মেয়েমানুষের লাজলজ্জা, ভয়ডর সবকিছুর মাথা খেয়ে, ছুটতে ছুটতে, হাঁপাতে হাঁপাতে ঘরের দিকে ছোটে। সুপুষ্ট শরীরটা নেশা ছড়ায়, উদোম বুক লাফায়। উপায় নেই। ঘরের মানুষ লজ্জা কাড়লে, তামাম দুনিয়ার বেবাক মানুষই যে জানোয়ার বনে যায় গ।

মানুষ নয়, যেন একরাশ শেয়াল-শকুনের ভিড় ঠেলে গাঁ-এর উপর উঠে টেঁপি ঘরের দিকে ছোটে। তেঁতুলতলায় গাছের গুঁড়ি আঁকড়ে মরে পড়ে আছে একটা মানুষ। একপাল শকুন বসে মোচ্ছব করছে। সোনা বাউড়ির ঘরের ভিতর মেয়েমানুষের গোঙানি, মা-শেতলার থানে তিনটে শেয়াল গন্ধ শুঁকছে, গাঁয়ের পাশে সোনাডাঙ্গার মাঠে ভাগাড়, গাইবলদের সঙ্গে স্বজনস্বজাতিকে টেনে টেনে ফেলা হচ্ছে ভাগাড়ে, শেয়ালশকুনের কাড়াকাড়ি, সারা গ্রাম জুড়ে মরামানুষের পচা দুর্গন্ধ। মেয়েটা কোন দিকে তাকায় না, প্রায় নির্জন শ্মশান-গ্রামের উপর দিয়ে দৌড়ে এসে নিজের

মাটির ঘরে ঢুকে নিশ্বেস নেয় আর হাঁপায়। এই মড়কেই দুদিন আগে মরেছে মা-টা, বমিপেচ্ছাবপায়খানায় সারা শরীরে পচা গন্ধ মেখে ধুঁকছে বুড়ো-বাপ। কথা কইতে পারে না, ভাঙা-চোয়ালে শুকনো জিব দিয়ে ঠোঁট চাটে। চোখে জল। মেয়ে সামনে এসে দাঁড়াতেই যেন মাটিতে-লেপ্‌টে -থাকা রুগ্ন শরীরে একটা কাঁপুনি লাগল হঠাৎ। পলক না-ফেলে ঘোলাটে চোখে তাকিয়ে থাকে সদা বাউড়ি। নড়ে না টেঁপি। শ্মশানকালীর ভয়াল -মূর্তিতে বাপের উপর চোখ রেখে ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে। অক্ষম হাত দুটো তুলে কি যেন বলতে চেয়ে, বলতে পারে না সদা বাউড়ি। খড়-পচে-যাওয়া ভাঙা-চালে শকুন ডাকে। চোখের উপর বমি করতে করতে পাঁজরা ছিঁড়ে বুড়ো-বাপ মরে যায় এবং এত যন্তরনা দেখেও হাত বাড়িয়ে বুড়ো-বাপকে ধরে না মেয়েটা। মাটিতে আছড়ে পড়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদে—'কেউ বাঁইচবে না বাপ্‌। সোদর ভাই আমার বুক চেইটেচে, সোদর বোন বুকের-কাপড় টেইনে আমায় ন্যাংটো কইরেচে। দেশ-গাঁ-এ আর মনিষ্যি নেই গ বাপ্‌, শ্যাল্‌-কুত্তা...'

এবং তখনই গাঁয়ের আর দশজনকে নিয়ে এসে ছেদাম বাউড়ি ঘিরে ধরল ঘর—'ডাইনি মাগী, ই মাগী রাক্‌কুসী গ। সোয়ামীর ঘর কইরবে নি মাগী, পাছা নাইচে বেড়াবে দিনভর। ব্যাটাছেইলের চরিত্তির খুইবে। রেতের বেলা পেট খসাবি দিনের বেলায় চোখ লাচাবি। মর, মর...থুঃ... ওয়াক থুঃ ..পাপ, পাপে ভইরল দেশ, ভাগাড় হল গাঁ...দূর কর, দূর কর, উ মাগীকে জ্যান্ত ভাগাড়ে দে আয় সব.. '

টেঁপি মাটিতে মুখ থুবড়ে কাঁদে। চোখের উপর জোয়ানমরদ বাউড়িরা বুড়ো বাপ্‌কে পা ধরে মাটি ঘসে হিঁচড়ে বাইরে নিয়ে যায়। ভাগাড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। শেয়ালশকুনে খাবে। টেঁপি কাঁদে—'আমার দুখ লাই গ বাপ্‌। দুখ লাই...'

যমেরও অরুচি গ। সেই কতো সন আগে একরত্তি বয়সে বিয়ে হয়েছিল অনেক দূরে। বাসে চেপে যেতে হয়। ন্যাদামখালি গাঁ-এর খুনে-ডাকাত প্যালা বাউড়ির সঙ্গে। ক-বছর আর ঘর করেছিল। একদিন রাতে হাতকড়া বেঁধে মরদটাকে ধরে নিয়ে গেল হাজতে। আর ফিরল না কোনদিন। রাগে ফুঁসতে ফুঁসতে কুড়ুল নিয়ে কোপাতে এল শ্বশুর, বঁটি নিয়ে তেড়ে এলো বুড়ি শাশুড়ি। সেখানেও শাপান্তি—'ডাইনি।' সেই থেকে বাপের

ঘরে পালিয়ে এলো টেঁপি। আর ফেরেনি। শরীল। টেঁপি বোঝে না সেই দোষ কার? গায়েগতরে, হাড়েমাসে সোমত্ত বয়সের শরীরটা যদি ধেই-ধেই করে বেড়ে ওঠে, তবে লোকে দুষবে কেনে? ওর শরীরের পাপে মড়ক? টেঁপি পিঠ টান করে উঠে দাঁড়ায়। জট-বাঁধা এলোচুলে খোঁপা বাঁধে। আরেকটা পুরনো ছেঁড়া-শাড়ি গায়ে জড়িয়ে আবার রাস্তায় নামে। কারও ঘরের বাঁধা-মেয়েমানুষ নয় সে, কোনো ব্যাটাছেলের পুষ্যি নয়। গায়েগতরে খেটে খায়, ঘরামির কাজ করে, তিন ক্রোশ হেঁটে গিয়ে বেড়াবনীর হাটে বসে লাউটা-কুমড়োটা বিকিয়ে আসে। আবাদের দিনে জোতদার ধান-রুইবার আগাম দিতে চাইলে টেঁপির জন্য আলাদা দর। তিন তিনটে মেয়েছেলের কাজ সে একা করে। সেই টেঁপি মড়কের মুখে ধন্বন্তরী। পেটে দানা নেই, পথ্যি নেই। আকাল। পেটে খিদে, গলায় তেষ্টা। শরীর আর সয় না। তবু কার ঘরে কে মরল, পায়খানাপেচ্ছাববমিতে কে মাখামাখি, কাকে ভাগাড়ে ফেলতে হবে—মেয়েটার ভয়-ডর নেই, ক্লান্তি নেই, সারা গাঁ-এ লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ায়।

কিন্তু সেদিন রাতের বেলায়, গোটা গাঁ-এ সবাই যখন ঘরে ঘরে ঘাপ্‌টি মেরে ছিল, খিদের জ্বালায় তিষ্টোতে না পেরে বুড়ো ন্যাড়া বাউড়ি বৌ-ছেলেকে ঘরের ভিতর কুপিয়ে মারল। চিৎকার শুনে ছুটে এলো সবাই। বীভৎস দৃশ্য। রক্তের বান ছুটছে মেঝের উপর। দাবড়াতে দাবড়াতে নিঃসাড় পড়ে আছে শরীরগুলি। রক্তমাখা কুড়ুল ধরে হাঁটু ভেঙে বসে বেহুঁসের মতো ঢলে পড়েছে ন্যাড়া বাউড়ি। পড়শীদের দেখেই ভেউ-ভেউ করে তারস্বরে কান্না। মুখের রা নেই কারও। ভয়ে সিঁটিয়ে গেছে সব। এ ওর মুখের দিকে চায়। কথা কয় না কেউ। গাছের এঁচোড় আর কাঁঠাল হলো না, কলার কাঁদি পাকল না, কাড়াকাড়ি ছুটোপুটিতে সব সাবাড় করে, পুঁইপালং চিবোনোর পরও যারা ঘাস খেয়ে টিঁকে ছিল, ন্যাড়া বাউড়ির কাণ্ড দেখে সবাই কেমন বোবা বনে গেল। অবিশ্বেস। খিদের জ্বালায় মানুষ এখন মানুষ খাবে। সবাই সবাইকে মুখ খিঁচোয়, চোখে চোখ শানায়। জোয়ানমরদ বাউড়িরাও কেমন যেন মুষড়ে পড়ল এবার। তাগদ গেছে, দম ফুরিয়েছে, কোন উৎসাহ নেই। সবাই আকাশের দিকে ঘাড় উঁচিয়ে তাকায়। নির্দয় আকাশ। ওরা ভাবে, বাবুদের কারচুপি। গরিব-মারার ফাঁদ। ও বাবুরা সব পারে, চাষিকে জল দিতে পারে না?

জমির মাটি কুপিয়ে কেনেল কাটে, রাস্তা বানায়, বাস চলে, বিজলি জ্বালায়, বারোমাসী ধানের বীজ আনে, মেঘ আনতে পারে না? জোয়ান চাষি মদনা চিৎকার করে হাঁকে—'পাইলে যাব গ। চলো সবে, পাইলে যাই…'

সবাই কেমন ধাক্কা খায়। পায়ের-আঙুল থেকে মাথার-তালু পর্যন্ত তিরতির রক্ত ছোটে। শিরশির করে—'যাব কুথা গ?'

'শ'রে গ, লঙরখানায়…'

'বাপ্-ঠাকুদ্দার ভিটেয় পড়ি রইল বুড়োবুড়ি, ঘরের মাগ, কোলের বাচ্চা, তুরা জোয়ানমরদ চলি যাবি শ'রে। যা যা…আটকুইড্যার ব্যাটা বেইমান যা। জাতজামাই করি ধরে পুইষবে তুদের শ'রের মানুষ, যা যা, হারামি বাঞ্চোৎ…'

গোটা শরীরে চাড় দেয় মদনা, ফুঁসে ওঠে—'কইরব কি এখেনে? বাঁইচব লাই…'

কথাটা মনে ধরে। এক ঝটকায় নড়ে ওঠে বেবাক মেয়েপুরুষ।

মানিক দুলে বুড়োমানুষ, আকালের গল্প বলে। সেই অনেক অনেক সন আগে এক আকালের গল্প। ব্রতকথার মতো শোনে সবাই, ভয়ে শিউরে ওঠে। সবাই গিয়েছিল শহরে লঙরখানায়। কেউ ফেরেনি। যারা জোয়ানমরদ, চাবুক খেয়ে মরল। সোমত্ত বৌ-ঝিরা শরীর বিকোল পয়সা গুণে গুণে। বাঁচল না। বুড়োবুড়ি কাচ্চাবাচ্চা পথেই পড়ে পড়ে মরল সব—'পাড়া-গাঁয়ের মনুষ্যি আমরা, জলের মাছ, শ'রের ড্যাঙায় বাইচব লাই…'

মানিক দুলের কথায় ভয়ে কুঁকড়ে যায় মানুষগুলি। শেতলা মায়ের থানে মাথার উপরে শকুন ডানা ঝাপ্‌টায়, ভাগাড়ে শেয়াল ডাকে।

'কিন্তুক আমরা বাঁইচব কেমন কইরে? সি বিধেন দাও গ মুড়ল…'

সবগুলি দাঁত-পড়া গালে ঘন ঘন চোয়াল চোষে বুড়ো মানিক মোড়ল। বিধেন! হাড়া-বাউড়ির হাতে রক্তমাখা কুড়োলটা চোখে ভাসে। কুড়োলটা দেখতে দেখতে মায়ের হাতের খাঁড়া হয়ে ওঠে, খাঁড়ার চোখে আগুন। আর রক্তের স্রোতে মায়ের সেই রাক্কুসী নেত্য! ছানি-পড়া-চোখে জগৎ আঁধার। মানিক বাউড়ি যেন স্পষ্ট দেখতে পায়, কালীকরালীর দামাল নেত্য। স্বজনস্বজাতি একে একে সব গেল, শেয়ালশকুনে কাড়াকাড়ি। 'ই নেত্য থাইমবে না গ…'শেতলা মায়ের থানে দাঁড়িয়ে জনে-জনে শুধোয় —'মায়ের পূজো দিতি হবে গ। শ্মশেনকালী মা, তেনার হাতে-হাতে

মুণ্ডমালা, জিবে অক্ত, পায়ের গোড়ায় শ্যালের হা। সি পায়ে অক্তজবা দে পেন্নাম করো গ সবে। আমি হপন দেইখেচি…হে…ই ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া মেঘবরণ কেশ গ মায়ের, পুজো দিলি জল বইরবে মাঠে, হবে গ, ফের সব হবে। জোতজমি, গাইবলদ, কাচ্চাবাচ্চা, ঘরদোর সব হবে…'

বুড়ো মোড়লের চোখে সত্যি স্বপ্ন কথা বলে।

হপন! পিঠেপেটে-এক ক্ষুধার্ত মানুষগুলি হা করে, অবাক হয়ে শোনে। বাঁচার নেশা ধরায়।

হপন! জোয়ানমরদ বাউড়িরা বিশ্বাস করে না। মদন, বিশে, কানু, নন্দ, ভোলা জোট বাঁধে, ঝাঁকড়া মাথায় গাজনের নাচ খেলিয়ে বুক চিতিয়ে দাঁড়ায়—'উ বুড়া মুড়লের হপন না বুজ্‌রুকি। মাইনব নি, যাব…'

'যাবি কুথা…,'

'শ'রে লঙরখানায়…,'

'শ'রের লেশায় মইরবি না মদনা, শ'র শত্তুর…'

'বুড়া মুড়লের বাকিয় অগ্‌গেহ্যি করিস নে শুয়ার, মইরে নি…'

অসহায় মানুষগুলি হতবিহ্বল। আকাশ আর মাঠ-ভরা আঁধার দেখে আর ভাবে—কার বাকিয় সতিয? আঁধার রাতে মাঠ জুড়ে শ্মশানকালীর আঁধার! শেয়াল-শকুনের মোচ্ছব! না ওই হপন? বুড়ো-মোড়লের স্বপ্নটা চোখে চোখে সংক্রামিত হয়। ভয়ে বুক ধড়াস্‌ ধড়াস্‌ কাঁপে।

খিদের জ্বালায় পাগল হয়ে বুনো জানোয়ারের মতো আঁধার রাতে টেঁপিকে জাপটে ধরে মদন। কাঁটানটে, শেয়ালকাঁটা, ঝোপের ধারে টেনে নিয়ে আছড়ে ফেলে ঝাঁপিয়ে পড়ে। পুরুষমানুষের বুকের তলায় চিৎ-করা কাছিমের মতো বেকায়দায় হাত পা ছোঁড়ে মেয়েটা—'আকালের দিনে শ্যালশকুন হোস নে মদনা। তুরে সব দিব। দশজনের কতা ভেইবে দ্যাখ্‌। মুড়লের কতা শোন, মাগ্যি জন…'

আঁধার রাতে বাঘের মতো বুকের উপর খাব্‌লা মারে বিশে।

টেঁপি হাসে—'মেয়েমানুষ নে শুতি চাস্‌! তুর লাজ লাই বিশে? তুই মোর খুড়ির পেটের ভাই। তুর বাপ মোর বাপ সোদর ভাই ছেল রে! তুকে জন্মাতে দেখলাম সিদিন। কোলে নে ঘুরেচি কত। দিব রে, তুকেও দিব। শরীল দিব। দেশস্বজাতি বাঁচা, কতা শোন…তুর বাপ, আমার বাপ্‌ সোনাডাঙার মাঠের ভাগাড়ে, শ্যালশকুনে হাড় চিবুচ্চে তেমাদের।

মরদ না তুই? দেশের লোককে মেইরে পাইলে যেত্তি চাস্। থুঃ, ঝ্যাটা মারি তুর মুকে…’

চুক্‌চুক্‌ করে ভোলা আসে রাতের আঁধারে। ঘাড়ের মাংস কামড়ে ধরে পিছন থেকে। জোয়ানমদ্দার বুকের মধ্যে লেপটে গিয়ে আদরে লাট খায় টেঁপি—‘তুর বাজা-বৌ যা পারেনি আমি তুকে দিব। কত্তার পুঃরে দেশ-গাঁ-এর দশজনকে বাঁচা ভোলা, বাঁচা…’

জনে জনে ভোলায় টেঁপি। শরীর বাঁধা রাখে। আকালের দিনে পাপপুণ্যি নেই। মাঠে-মাঠে ঢেউ খেলিয়ে সোনার ধান নাচুক, শেয়ালশকুন ভাগাড়ে যাক, গোয়ালঘরে গাইবলদ আসুক। রাতে উঠে পোয়াল দেব, ডাবায় ভরে খোল দেব। নতুন খড়ে ঘর ছাইব, ঝিলপুকুরে সাঁতার দেব, পোলো ফেলে মাছ ধরব। সেদিন…টেঁপি ভাবে…যদি কথা রাখতে হয়, তবে নিজেকে ছিঁড়েখুঁড়ে দেব। ছেনাল মেয়েকে দুষবে মানুষ! দুষুক। কিন্তু…

টেঁপি খুশির মৌজে স্বপ্ন দেখে—সোনার দিন এলে মদনা বিশে ভোলা শেয়ালশকুন থাকবে না আর, ফের সব মানুষ হয়ে যাবে। তার আগে এ-আঁধার তাড়াতে হবে—‘ই অঁাধার শত্তুর’।

সারা গাঁ-এর মানুষের চোখে মোড়লের স্বপ্নটা লেপ্‌টে যায়। শহরের বাবুরা মাঠ পেরিয়ে আসে না অ্যাদ্দুর, জোতদার-মহাজনরা পাকা-ধানের-অঁাটি গোনার মনিব। মোড়ল! মোড়ল ছাড়া পথ নেই। কিন্তক্‌…

আবার মুষড়ে পড়ে। ট্যাকা? সবশুদ্ধু ছ’মাসের খোরাকির চাল থাকে না ঘরে, গরিবের উঠোনে ধানের-মরাই বাজা-বৌ-এর পেট, খড়ের পালুই থুরথুরে কুঁজো-বুড়ির চুলের গুছি। এর উপর আকালের টানে সব গেছে—ঘটিবাটি, গাইবলদ হাললাঙল সব। তবু মায়ের-জিবে রক্তের তেষ্টা। পুজো চাই। বুড়ো-মোড়লের হপন! দেশ-গাঁ-এর এত এত স্বজাতির মরণ দেখেও বেঁচে ছিল বুড়ো। এখন খিদেয়-তেষ্টায় মাটি অঁাচড়াচ্ছে অঁাধার-ঘরে। গাছের ডগায় শুকনো খেজুরপাতার মতো পড়ি-পড়ি করে ঝুলছে পরানটা। মরণের আগে মায়ের পায়ের রক্তজবা ছুঁইয়ে দিতে হবে বুড়ো-মোড়লের কপালে।

টেঁপি লাফিয়ে লাফিয়ে ঘরে-ঘরে ছোটে—‘দাও গ, দাও। যা আচে সব দাও। ফের দাদন দাও গ তুমরা, টেপসই দাও মা’জনের

·কাগজে। রক্ষেকালী মা-ঠাকরুন মোদের জন্মে জন্মে মা'জন··দেশগাঁ বাঁচাও···'

কলাগাছের গায়ে বাঁশের শক্ত ঠেকনা দিয়ে চাঙা রাখে মদনা বিশে ভোলাকে, যৌবনকে—'নাউসেন-বীর না তুরা? বুড়া-ঢ্যামনা মুরদ দেখা। তা নইলে মেয়েছেইল্যার নাথি তুদের কপালে। অ···'

দল বাঁধে টেঁপি। বিশে ভোলা মদনাকে নিয়ে জোয়ানমরদের দল। মরামানুষের দেশে জাগ্রত শ্মশানকালীর পুজো! জন্মো-ভিখিরির ঘরে চাল নেই খুদ নেই। ভিক্ষে মাগতে হবে বড়ো গাঁ-এ বামুনকায়েত জোতদার মহাজনদের দোরে। ভিক্ষে না জোটে তো রাতের অাঁধারে পুকুরের-মাছ কি কলার-কাঁদি চুরি করতে হবে। আকালমড়কের চিমৃসে পেটে উপোসী থেকে ভোগ সাজাতে হবে মা-এর থানে। মায়ের থান। ঢ্যাম কুড়কুড় বাদ্যি বাজিয়ে ঠাকুর আনতে হবে ভিনগাঁয়ের কুমোরপাড়া থেকে, পুরুতঠাকুর আনতে হবে সাধ্যিসাধনার পায়ে ধরে। চারদিকের ন্যাড়া গাছপালা, লতাপাতা এখন হা-ভাতে মানুষের পেটে। তবু বাহারে সাজাতে হবে মায়ের থান। দেশ-গাঁ স্বজাতি বাঁচাতে হবে গ। বাঁচাতে হবে। যার যা আছে, সব দাও। যে যা পারো, করো। ধরে ধরে দিকে দিকে উন্মাদিনীর মতো ছোটে টেঁপি··মা-এর চরণের রক্তসিঁদুর মাথায় মেখে নাও গ তুমরা। মা ভয়ঙ্করী।

আজ সেই পুজোর রাত। ঘোর অমাবস্যে।

রাত দু-পহর পেরিয়ে তিন-পহরে পুজোর জোগাড় শেষ হয়। ঝোপ-জঙ্গলের জোনাকি আর আকাশের লাখো লাখো তারাকে অন্ধ করে অমাবস্যের রাতে হ্যাজাকের বাতি জ্বলে বাউড়িদের গাঁ-এ। পেট-মোটা ঢোলের গায়ে মোহন-ঢুলির হাতের-কাঠি তিড়বিড়িয়ে নাচে ড্যা-ড্যা-ড্যাং, ড্যাং-ড্যাং-ড্যাং···কাঁসি ধরেছে মোহনের বেটা। তালে তালে বাজে। ঝিঁ-ঝিঁ পোকা বোবা বনে গেছে, মাঠে-বাদাড়ে শেয়ালের রা নেই। বোকাহাবা, ভয়ার্ত মানুষগুলি জটলা পাকিয়ে চুপটি করে থাকে। খালি গায়ে শীত শীত করে। নড়ে না। ধোঁয়ার বাস নাকে লাগে, চোখ জ্বলে। তবু একপলকে তাকিয়ে থাকে মায়ের থানে। শ্মশেন-চিতায় ধোঁয়া পাক খেয়ে-খেয়ে ছড়াচ্ছে চারদিকে। উঠতে উঠতে চাপিয়ে যাচ্ছে মাঠে

মাঠে, বড়ো-বড়ো মাঠের ওপারে আরও দশটা গাঁ-এ। যেখানে যাবে সেখানেই জমাট ধোঁয়া মেঘ হয়ে ভাসবে, আকাশ মরবে ধোঁয়ার আড়ালে। ধোঁয়ার মেঘে মা-কে খোঁজে সবাই, মায়ের রক্তমাখা চরণ।

আঁধার ঠেলে কোথেকে টেঁপি এসে আলোর মধ্যে পড়ল। দৌড়ে এসেছে। হাঁপাতে থাকে। গরম লোহার ছ্যাঁকা লাগল গায়ে। নড়ে উঠল মানুষগুলি—মায়ের থানে কুলটা মাগী তুই। ভাতার-খেকো, রাক্কুশি··· কিন্তু মুখ ফুটে বলতে পারে না কিছু। তাকিয়ে থাকে শুধু। এই আকালের দিনে নিজের হাতে পায়খানাপেচ্ছাব কেচেছে মানুষের। কিন্তু গতর রেখেছে ঠিক। তাই সন্দ হয়, রাক্কুশির পেটে পেটে···

অমাবস্তের আঁধার গায়ে মেখে দাঁড়ায় মেয়েটা। লাল ডুরি কাটা শাড়িতে সুপুষ্ট বুক পাছা ঢাকা পড়ে না। গোল-গোল সুডোল হাত-পা, পিদিমের মতো মুখ-চোখ, জট-বাঁধা এলোচুল পিঠ ছাপিয়ে কাঁধে-বুকে এসে পড়ে। টেঁপি নিজেও বোঝে, ঘৃণার চাবুক লাগছে গায়ে। পালিয়ে যায় না, দাঁড়িয়ে থেকে মায়ের-থানে ধোঁয়ার পাক দেখে। ধোঁয়ার বাস নাকে লাগে, চোখ জ্বলে! শরীর জুড়োয় সুখে।

'কই গ, পুজোর জোগান কই সব···' যেন মেঘ গর্জায় নিঝুম রাতের বিনিমেঘের আকাশে। মানুষগুলি চমকে ওঠে। মিনমিন করে কাঠির নাচন থেমে যায় মোহন-ঢুলির হাতে, কাঁসিও থামে। সবাই তাকিয়ে দেখে। ধোঁয়ার আড়াল থেকে বেরিয়ে আসছেন কাপালিক ঠাকুর। মাথায় আর গাল ভরে বটের ঝুরির মতো জটা, সিঁদুরমাখা কপাল। যেন মেঘের ভিতর থেকে উঠে এলেন সগ্‌গের সন্ন্যেসী ঠাকুর।

'এ পুজো হবে নি।'

হবে নাই! চিমসে পেটে খিঁচুনি ধরে, বুকের পাঁজরায় মোচড় লাগে—'হবে নাই কেনে গ ঠাকুর।'

মানুষগুলির আর্তনাদ। কাপালিক ঠাকুর বিড়ি ধরালেন। চোখ পড়ে টেঁপির উপর। গোলাগোলা চোখের আগুন। টেঁপি ঝিম্ মেরে দাঁড়িয়ে থাকে। পোড়ে না।

'পঞ্চমুণ্ডের আসন কোথা তোদের? পাঁচটা মাথার-খুলি, সেইখেনে মায়ের কারণবারি থাকবে। নইলে পুজো হবে নি···'

'সি তো সব আপুনি আইনবেন গ ঠাকুর। কতা ছেল···'

'চোপ্ বাঞ্চোৎ...' কাপালিক ঠাকুরের চোখের আগুন টেঁপির শরীর চাটে। টেঁপি কথা কয় না। খিঁচিয়ে উঠলেন মানুষগুলির দিকে তাকিয়ে —'সব আনব ? কেনে ? কতা ছেল না, পাঁচটা মাথার খুলি ঠিক রাখবি। আমি আনব নি। তোদের মোড়ল কোথা ? ডাক্...'

মাগীমদ্দা এতগুলি মানুষের আর্তনাদের মধ্যে সিধু বাউড়ি ডাক পেড়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল ঠাকুরের পায়ে—'পরিবমানষের সব্বোন্নি দে' পূজোর জোগাড় গ ঠাকুর। বাঁচাও, বাঁচাও...'

সাষ্টাঙ্গে পড়ে পায়ের দিকে হাত বাড়াতেই লাফ মেরে পিছু হটলেন ঠাকুর -'আরে ছ্যা ছ্যা, এই সব সব হারামজাদা, শুদ্দুর চণ্ডাল, ছুঁস্ নে, ছুঁস নে...'

এবার সব মানুষ টেঁপির দিকে চায়। ঝোপের আড়ালের শেয়ালগুলির মতো পা টিপেটিপে, সেয়ানা চোখ মেলে উঠে আসে সামনে—'তুই, তুই, মায়ের থানে তুই কেনে এলি রাক্কুশি আবাগী মাগী, সব্বোনেশী...'

শেয়ালগুলি চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে। কুত্কুতে চোখে অবিশ্বাসের বিষ। জলবিছুটির জ্বালা। চোখ বুজে ঝিম্ মেরে দাঁড়িয়ে থাকে টেঁপি। মানুষের মাংস মানুষ খায়। দেশে আকাল। 'তুই কেন এলি এখেনে। সব্বোনেশী। তুই এলি আর বাদ সাইধলেন ঠাকুর।' উত্তেজনা বাড়ে। স্বজাতির অবিশ্বেস। জ্যান্ত যদি পুঁতে দেয় মাটিতে, যদি ছুঁড়ে মারে শেয়ালশকুনের মুখে। উপায় নেই বাঁচবার। এলোচুলে হাত পড়ে, কার শক্ত হাতের থাবা। মুড়ি-ভাজার গরম বালি চিড়বিড় করে বুকের ভিতর। ঝামটা মেরে তাকায় টেঁপি। টান পড়ে চুলে। কাপালিক-ঠাকুর। একমাথা জটা আর দাঁড়ির জটার ফাঁকে বেহ্মদত্যির হাসি। চোখ দুটো কপালের সিঁদুরের মতো লাল। ভুরভুর নেশার বাস।

'এটা কে বটে ?'

'সদা বাউড়ির কইন্যে গ ঠাকুর। সোয়ামী খে বাপের ঘরে এল, ই আকালে মাকে খেল, বাপকে খেল...'

'অ...' ঠাকুরের দাঁতে বেহ্মদত্যি মুখ খিঁচোয়।

অসহায়ভাবে চারদিকে মানুষ খোঁজে টেঁপি। আপন মানুষ। চারদিকে স্বজাতির চোখ। আরেকটা থাবা পড়ে বুকের উপর। শরীরটা টানে। যন্ত্রণায় চিৎকার করে ওঠে টেঁপি—'পাঁচ-মাথার খুলি দিব গ ঠাকুর। ই পূজো হবে গ, হবে...'

'লাগ্‌বে নি...' বেহ্মদত্যির বুকের তলায় টেঁপির শরীর কাঁপে।

'লাইগবে...'

'না...আ...'

একটা হ্যাঁচকা-টানে ছিটকে গিয়ে আঁধারে লাফ মারে টেঁপি। শাড়ির আঁচলে টান। পিঠ বাঁকিয়ে ঝুঁকে পড়ে, উদোম-বুক চুলে ঢেকে শাড়িটা নিজের গায়েই লেপটে রাখতে চায়। বেহ্মদত্যি হাসে। স্বজনস্বজাতিরা পিছিয়ে যায় ভয়ে। ড্যাবডেবে চোখে অবাক হয়ে দেখে—দেবতা মানুষের লড়াই। ই কোন আকালের শাপ গ। আকালের-মেয়ে দাঁত মুখ খিঁচে প্রাণপণ শক্তিতে নিজের কাপড় টানে। পারে না। দম ফুরিয়ে আসে। হাতের-পাতায় জ্বালা, শরীর নেতিয়ে পড়ে। গুটিগুটি পায়ে এগিয়ে আসে বেহ্মদত্যি। সর্বাঙ্গে চিড়বিড় করে জ্বলুনি, মাথায় রক্ত ছোটে। আস্তে আস্তে টেঁপি আঁধারের দিকে পিছোয়। মায়ের কারণপানে টালটামাল বেহ্মদত্যির রক্তজবা-চোখে আর জিবের লালায় হা হা করে লোভ। টেঁপি চিৎকার করে ওঠে। আকাশবাতাস কাঁপে—'মায়ের থানে শরীলের ওপর তুমার নোভ কেনে গ ঠাকুর! সি ত আকালমড়কের নোভ...' বেহ্মদত্যি হাসে। দেবতা আর রাক্কুশির টান। দ্রৌপদীর লজ্জা টানে দুর্যোধন। স্বজনস্বজাতি ঘরের-মানুষগুলি শিউরে শিউরে পিছিয়ে যায়। দেবতার লীলা! ভয়াল সেই দেবতার দিকে তাকিয়ে রক্তে রক্তে ঘেন্নায়, টানে টানে পাকে পাকে আঁধারে ঘুরতে ঘুরতে টেঁপি নিজেকে ছাড়তে থাকে। কালো কালো রোমশ দু-হাতে পুকুরের বেড়াজাল টানে দুর্যোধন। শাড়িটা উঠে আসে আঁধার থেকে। উঠে আসে, উঠতে থাকে...একসময় মেয়েটা হাতের নাগালে পৌঁছোতেই শাড়ির সবটা হাতে এসে যায়। মানুষগুলি দম আটকে মরে, জটলা বেঁধে সিটিয়ে যায় ভয়ে—'ই আঁধারে গেল কুথা মেয়ে? খেয়োগোখরো, তেঁতুলগোখরো, চাঁদবোড়া, কেউটে ঝোপে ঝোপে শেয়াল, গাছে গাছে শকুন...'

উত্তরের-মাঠের ধারে বুড়ো-অশ্বত্থের তলায় শুকনো কাঠ আর পাতা জ্বেলে সন্ধে থেকে পচাই গিলে বেহুঁস হয়ে পড়ে ছিল সব। লাজ-নেই-মেয়েটা একেবারে মাঝখানে এসে লাফিয়ে পড়ল। মাটির উপরে দগ্‌দগে পোড়া ঘা-এর মতো জ্বলছিল নিভন্ত আগুন। নেশার ঘোরে ভিরমি খেয়ে আঁৎকে উঠল জোয়ানমরদ মানুষগুলি। ঘুটঘুটে আঁধারে শ্মশানকালীর

নেত্য। জ্বলচে আগুনে ক্যাথটো মায়ের ভয়াল মূর্তি।

নেশায় টলমল শরীর। ভয়ে কোমর ছেঁচড়ে পিছোতেও হুড়মুড় টলে পড়ল জোয়ানমরদরা।

'গাঁ-এর নোকে ই আকালে বিশ্বেস কইরে ট্যাকা দেল তুদের হাতে, সি ট্যাকায় তুদের মাল এইনেচিস্ মুখপোড়া বেজম্মা। ই পিচ্ছাব গিলচিস্ নুইকে নুইকে...গু-খা, মুত খা, মেয়েছেইল্যার নাথি তুদের মুখে...'

ওরা চমকায়। মানুষের ভাষায় কথা বলে সগ্গের মা। বিশ্বেস হয় না দেখে। চোখ রগড়ে ভালো করে তাকায়—আঁধার। আঁধারে মায়ের মূর্তি। গায়ে গা ঘেঁসে গলায় গলা জড়িয়ে দলা পাকায় আঁধারে।

'চ' মদনা, যাই...'

'কুথা ?'

'সুনাড্যাঙার ভাগাড়...'

'ডর নাগে গ। আঁধার...'

'ডর। নাউসেন মুরদ না তুরা? মাঠে নাঙল চইষে আবাদ কর্‌বি, খাল কেইটে জল আইন্‌বি, মাঠ কেইটে আস্তা গইড়বি, ঘরের মাগের পেটে ছেইলে দিবি, কিসের মুরদ তুরা ?'

'শ্যাল শকুনের ডর গ, আঁধার রেতের ডর...'

'ই আকালে তুর বাপ্ মইরেচে মদনা, তুদের মা মইরেচে বিশে, আমার মা-বাপের মাস সব শকুনে চেইবেচে, শ্যালে হাড় চুইষচে। চ ভোলা যাই...'

'কুথা ?'

'ভাগাড়ে...'

'কেনে ?'

'বাপের মাথার খুলি আইনব। পুজো হবে।'

'কার পুজো গ ?'

'আঁধার-রেতের মার...'

অমাবস্যের নিঝুম রাতে সোনাডাঙার মাঠ জুড়ে লাখো লাখো শেয়াল ডেকে ওঠে, মাথার উপর গাছের ডালে-ডালে শকুনেরা ডানা ঝাপটায়। গনগণে আঁচে দপ্ করে হঠাৎ জ্বলে উঠল আগুন। আঁধার রাতের মশাল। লাল আগুনের ছোঁয়াচ লাগল শরীরে। চোখের নেশায় ঘোর কাটে, রক্তের নেশায় মাতন লাগে। আঁধার, আঁধার...জগৎ জুড়ে আঁধার ঘিরেছে

দশদিক। ঘুটঘুটে অমাবস্যের আঁধার। শেয়ালেরা স্বাদ পায়। হাড়মাংসের স্বাদ। আঁধার থেকে উঠে আসে সন্তর্পণে, পা টিপে টিপে। কালো কালো হাত—ক্ষুধা, ছুঁচোল ছুঁচোল নখ—লোভ, লালা ঝরা জিব—তৃষ্টা। হাতগুলি থাবা মারে, নখগুলি আঁচড়ায়, জিব চাটে শরীর। আঁধার আঁধার! শরীর ভরে যন্ত্রনা। শেয়ালগুলির হিংস্রতায় সারা শরীর রক্তাক্ত হবার আগেই হঠাৎ, সম্পূর্ণ অতর্কিতে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে, উত্তর থেকে উত্তরে, আরও উত্তরে, সোনাডাঙার মাঠে আঁধারের সমুদ্দুরে ঝাঁপ দিল আঁধার রাতের কন্যে। মাঠ জুড়ে লাখো লাখো শেয়ালের উল্লাস, আকাশ ভরে শকুন। শকুনেরা ডানা ঝাপটায়। ডানা-ঝাপটানির বাতাস কাঁপে থরথর করে। মাঠের পর মাঠ জুড়ে আঁধার ঘিরে উথালপাথাল তোলপাড়।

অসাড় দাঁড়িয়ে থেকে আবার পচাই-এর হাঁড়ি টেনে নেয় বাউড়ি জোয়ানরা।

দূরে নতুন করে হাতের কাঠির নাচন লাগে মোহন-ঢুলির ঢাকে। অকাল তাড়ুয়ার বাদ্যি।

আর, আঁধার রাতের কন্যে হাঁটে সোনাডাঙার মাঠে। বাপ-ঠাকুদ্দার মাথার খুলি খুঁজতে হবে তাকে।